ইতিহাসে ভারত

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ দাস

488
28.5.90

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of the Board in History for class IX vide Notification T. B. No Syll|H|IX|87|7 dated 13-11-87, (with reference to Board's letter No Syll| Misc|H|87|30 dated 16-11-87)

ইতিহাসে ভারত

(নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে নবম শ্রেণীর পাঠ্য)

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ দাস,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিক্ষাবিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা, গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, হুগলী মহসীন কলেজ, দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, টাকী গভর্ণমেণ্ট কলেজ এবং নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া
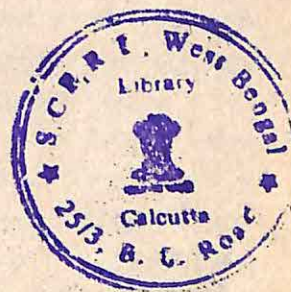
জে. মল্লিক এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

৫৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নবম শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী (New Revised Syllabi of History for class IX, 1986) অনুযায়ী স্বল্প-পরিসরে, নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাঙ্কের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুপ্রাচীন যুগে সভ্যতার উন্মেষকাল হইতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত আলোচনা করা অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রাচীন যুগে হিন্দু রাজবংশ-গুলির উত্থান-পতন, সাম্রাজ্যিক ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা, গ্রীক, পারসিক, শক, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির আক্রমণ, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিস্তার রূপান্তর অনধিক আশি-নব্বই পৃষ্ঠাঙ্কের মধ্যে আলোচনা করার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে মধ্য যুগের সুলতানী আমল এবং মুঘল যুগের জন্য (১৫২৬ খ্রীঃ হইতে ১৭০৭ খ্রীঃ)ও সমসংখ্যক পৃষ্ঠাঙ্ক বরাদ্দ করা হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান সংঘাত ও সমন্বয় মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়া সুলতানী আমলের অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং ধর্মান্দোলন ও আঞ্চলিক শক্তিগুলির প্রাধান্য স্থাপন। মুঘল যুগে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সার্থকতা লাভ করে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, যাহার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় সর্বভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং ছলে-বলে-কৌশলে রাজ্যগ্রাস নীতি, অর্থনৈতিক শোষণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব আধুনিক যুগের ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করিয়াছে। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করিয়া বিষয়টির পঠন-পাঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহার দ্বারা উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে। পাঠ্যক্রম বাস্তবায়িত করার জন্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে তাহা যথাসম্ভব মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু সীমিত পৃষ্ঠাঙ্ক এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী পৃষ্ঠাঙ্ক নির্ধারণ না হওয়ার জন্য যথাযথ আলোচনা করিতে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছি। বস্তুতঃ, অনেক সময় "বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের" মত শুধুমাত্র উল্লেখ করিয়া আলোচনার ইতি টানিতে হইয়াছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার উপযোগী অনুশীলনী সংযোজন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়মুখী এবং আলোচনা-মূলক উত্তর রচনার উৎসাহ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বস্তুতঃ, ছাত্র-ছাত্রীদের সুসংবদ্ধ (Systematic) ও ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রতি অনুসন্ধিৎসা এবং

স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাসের ধারার প্রতি মুক্ত মনন সৃষ্টির ভিত্তিভূমি মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তক রচনায় সেই লক্ষ্যের প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি দিয়াছি পাঠ্যসূচীর গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়াও। পুস্তকটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে সহায়ক হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তক রচনায় পরোক্ষে আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা এবং প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশক মেসার্স জে মল্লিক অ্যান্ড ব্রাদার্স, এবং তাঁহাদের বিপনীর অংশীদার ও কর্মচারীবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা মাত্র দেড়মাসের মধ্যে পুস্তকটির প্রকাশনা সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের আমার ধন্যবাদ জানাই।

নিবেদনান্তে—

শ্রীবিষ্ণুপদ দাস

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, Park Street, Calcutta-16

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

Boards Circuler Nos.—syll/81/2. Dt. 30. 4. 81 syll/81/4, Dt. 29 7. 81 and syll/82/5 Dt. 21. 9. 82 [and the Revised Brochure on Curiculam] and Syllabuses under the recognised Pattern of Secodary Education for Madhyamik Pariksha (Secondary Examination) Published in 1984.

Chapter I : Geography & History : 5

(a) Chief physical features of the Indian subcontinent and its main ethnic elements.

(b) Influence of Geography on History.

(c) The Fundamental unity.

(d) Source of ancient Indian History.

Chapter II : Dawn of Indian Civilisation : 5

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures.

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic) chief features—its antiquity (with special reference to its. extent, urban character, town planning, and social, economic and religious life), relations with outside world. 9

Chapter III : The Vedic Age :

(a) The 'Aryans'—their original homeland ; Their first literary work in India—The Rig-Veds ;

(b) Vedic literature ; Later **samhitas, Brahmans, Aranyakas, Upanishadas** and **Sutras** ;

(c) Life of the people as reflected in the Vedic literature—

(i) Social, economic and religious life and political and administrative activities of the people as known from the Rig-Veds ;

(ii) Later developments ;

(d) Expansion of Vedic culture in the subcontinent ;

(e) Beginning of the Iron Age.

Chapter IV : **Protest Movement :** 10

(a) Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical culture ;

(b) Jainism and Buddhism ;

(c) Lives and teachings of the Buddha and Mahavir ;

Chapter V : **The Age of Imperialism and Political Unification**

(a) Reference to sixteen Mahajanapadas

(b) A bare outline of the history of the growth of the power of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas ; 2

(c) History of the Maurya empire—with special reference to the periods of Chandragupta (his achievements, administration of the age at known from the account of Megasthenes and the Arthasastra of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoke (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his own Dharma, his humanitarian work, his contacts with outside world and his place in world history) 6

(d) Invasions of India by foreigners—

(i) Reference only to the extension of the Achaemenid empire to parts of the Indian subcontinent Alexandar's invasion and its effects.

(ii) after the fall of the Mauryas—reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas ; 2

(iii) Social and economic condition—with reference to agriculture, trade and industry—foreign elements in the population—contacts with the outside world—Mauryan Art. 5

(e) History of the Kushana empire with special reference to the reign of Kaniskha (his probable date, his conquests, limit of his empire, his patronage of Buddhism and Indian art and culture) and to India's contact with the outside world in the Kushana age ; cultural importance of the Kushana period in Indian History ;

(f) The Satavahana empire—

(i) its extent,

(ii) the achievements of its greatest ruler—Goutomiputra Satakarni ; 2

(g) History of the Gupta empire—with special reference to—

(i) the periods of Samudragupta (his conquests and achievements, war against the Saka Kshatrapas ; (his other achievements) Chandragupta II a legendary figure. Evidence of Fa-Hien ; Kumargupta I and Skandhagupta (his success against the Hunas)

(ii) Causes of the cownfall of the Gupta Empire. Distinctive features of the Gupta culture.

Chapter VI : **Struggle for Domination :**

(a) North India—

(i) Reference to the Hunas—Yasodharman

(ii) Rise of Gauda under Sasanka, his relations with Bhaskarvarman of Kamarupa and Harshavardhana of Thaneswar and Kanauj ;

(iii) Conquests of Harshavardhana, limits of his kingdom,—acccunt off Huan-tsang

(iv) Rise of the Pratihara and Pala empires—brief reference—to the tripartite struggle and its outcome

(v) Important Pala and Sen a rulers—Dharmapala, Devapala, Mahipala I, Ramapala, Vijayasens and Lakshmansens. 5

(b) Deccan

(i) the early Chalukyas of Badami ;

(ii) Achievements of Pulakesi II

(iii) the Rashtrakutas

(iv) Achievements of Govinda III and Krishna III. Later Chalukyas of Kalyans ; and achievements of Vikramaditya VI (c. A. D. 1076— 128) 5

(c) South India—

(i) The Pallavas of Kanchi—some notable rulers and their achievements—the Longdrawn conflict between the Pallavas and Chalukyas

(ii) The Cholas of Tanjore

(iii) Achievements of Rajaraja I and Rajendra I with special reference to their overseas campaigns 5

Chapter VII: (a) Social, economic and cultural life from the 7th Century to the 12th Century A.D. under the Palas, the Senas, the Chalukyas, the Rashtrakutas, the Chandellas, the greater Gangas of Orissa and the Pallavas and the Cholas of the far South ;

(b) Commercial and cultural contacts with outside world. 15

Medieval India 80 pages till 1707.

1. Why should we call it 'Medieval India' rather than Muslim India ?

2. A brief note on the types of sources ; the Sultanate period 2

3. Advent of Islam in India : the Arab conquest of Sind—its impact negligible. 1

4. Beginning of Muslim rule : condition of Northern and Western India on the eve of the Muslim invasion—Sultan Mahmud —Results of his invasions—Al-Biruni on Indian culture and civilisation. 2

5 From Invasion to Empire-building ; Foundation of the Delhi Sultanate by Qutbuddin—Iltutmish and Balban : nature of the external and internal threats—consolidation of the Sultanate. 4

6. Khalji Imperialism : growth of the empire under Alauddin (no detailed account of his campaigns) his attempts at consolidating the authority of the Central Government—his economic measures and their results. 4

7. A short assessment of Muhammad bin Tughluq's rule— Nature of the changes during Firuz Shah's rule : some of his beneficient measures. 4

8. Invasion of Timur—effects—disintegration of the Sultanate : the Sayyids and Lodis (only a brief outline). 2

9. Rise of some regional powers : 10

(a) Bengal under Ilias-Sahi rulers : Hussain Shah and Nasarat Shah ; cultural developments.

(b) The Bahmani Kingdom (no detail)—split up into five kingdoms.

(c) The nature of the Bahamani—Vijayanagar conflict (details of the wars to be omitted).

(d) Vijaynagar empire—Dev Rai and Krishna Rai—special emphasis on the administrative system—and the social, cultural and a economic life.

10 Impact of Islam on India during this period—with particular stress on the impact on the cultural life—the initial orthodox reaction ; gradual synthesis of cultures—the Bhakti cult—Sufism—Religious reference—their message. Art and architecture—development of vernacular literature and regional art and culture—patronage of literature etc, by the ruling groups—growth of Urdu. 12

THE MUGHAL AGE : 1526-1707

1. A brief note of the types of sources. 1

2. Origins of the Mughals : foundation of the Padshahi, by Babar—Panipath, Khanua and Ghogra—(detail of the wars to be omitted) Babar's memoirs. 3

(a) Mughal—Afghan contest—its nature—a brief narrative of the building up of an empire by Sher Shah—special stress on the administrative and revenue systems.

Sher Shah's contributions—a brief reference to the re-establishment of the Mughal power. 3

(b) Widening of the empire and its consolidation by Akbar : Stress on the methods by which Akbar achieved it : (detail of the wars to be omitted)—foundation of a new administrative system—Jagirdari system—revenue system—cultural life ; Din-i-Ilahi—Akbar's Court—His building activities. 7

(c) Jahangir and Shahjahan : Assessment as rulers : particular stress on their patronage of art and architecture—Their policy towards European traders. 4

(d) Aurangzeb : a short note on the wars of succession—stress on two developments in the political sphere : further widening of the empire on the one hand, and the emergence on the other of certain conditions which tended to weaken the imperial authority : Roots and nature of his troubles in Northern and North-western

India ; the Deccan policy—Shivaji and the first phase of the Mughal—Maratha conflict—organisation of the civil and military administration by Shivaji—assessment of Shivaji as a ruler—the far-reaching consequences of Aurangazeb s Deccan wars—organisation by Aurangazeb of the civil and military administration—His religious policy—his character and personality—a brief estimate as a ruler. 10

(e) Activities of the European Trading Companies (a brief outline). 3

3. India under the Mughals : Political unification of a large part of India—measures in connection with the assertion of the Central Authority—the Mughal rulers and Jagirdars—land revenue system—the ruler society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—special emphasis on the cultural life : art, architecture, paintings, literature—history writing—music—some reference to some distinctive regional cultures. 7

HISTORY OF INDIA : 1707-1947

1. Decline and disintegration of the Mughal Empire—beginning of the process during Aurangzeb's time—threats to the Mughal Empire from different quarters—drain on the imperial finances due to wars—implications of the fast increasing jagirs, while the revenue income did not increase—increased factionalism in the Mughal Court—different parties and factions—Weakness of the successors of Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. further consolidated their powers—Central control over the different Subas and regions gradually disappeared,—effects of the invasion of Nadir Shah. 7

2. Growth of regional powers (emphasis on those, whose encounters with the British affected the later political scene).

(i) The regions to be particularly studied Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs up to Guru Govind— 8

(ii) Growth and decline of the Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha Power—Third battle of Panipath(1761)—its impact.

3. Growth of European Commerce and conflict among European trading Companies—Anglo French conflict—Carnatic : the first area of conflict—Effects of the Anglo—French rivalry in Europe and elsewhere—War of Austrian succession and Saven Years' War—Reaction of Carnatic rulers to the growing conflict—Result of the wars—causes of French failure. 6

4. Growth of English East India Company's Commerce and political power in Bengal till 1765—Growth of English trade in Bengal in the first half of 18th Century—Farman of 1717—frictions with the Nawabs—conflict between the English and Siraj from 1756 to Plassey—its results—conflict with Mir Qasim : Buxer (1764)—Dewani (1765). 8

5. 1767—1857

British Imperial Expansion : 15

(The war operations to be described as briefly as possible. The main stress should be given on (a). The British Motives, (b). The decisive factors in the British victory)—

(a) Marathas (one long narrative)

(b) Mysore (—do—)

Subsidiary Alliance (1798) as an instrument of British political control.

(c) Other conquests, (excluding relationship with the Sikhs—Anglo-Sikh relations till the death of Ranajit Singh.

(d) Annexation of the Punjab.

(e) Dalhousie and British imperial expansion—Novel features.

6. **Administrative Foundations**

(i) Nature of the growth of British political power till 1765 (two short paragraphs)—Implications of Diwani of 1765—end of Diarchy in 1772.

(ii) Growth of centralisation : (Hastings to Cornwallis)

(iii) Organisation of a new and judicial and police system

(iv) Need for an increased income from land-revenue—Tepus of arrangements in this connection—their broad effects.

7. **Industry and Trade**

Expansion of India's foreign trade and decline of some Indian Industries (To stress, cotton goods during the period 1765—1857).

8. **The Cultural Scene**

(i) Brief note on the old educational system. The changes English education—Decline of vernacular education. Contact with Western culture.

(ii) A history of Social and Cultural Movements with special reference to Bengal and Maharashtra.

9. Peasant unrest and uprisings

(a) Peasant Rebelliance—Ferazi—Wahabi Movement.

(b) Tribal Movements—Kols—Santhals.

10. The Revolt of 1857—Causes—

Extent of populer participation—leadership—Nature of the Revolt.

সূচীপত্র

ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও জনগোষ্ঠী

মধ্য যুগ

মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ)

আধুনিক যুগ (১৭০৭-১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

ইতিহাসে ভারত

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও জনগোষ্ঠী

(ক-১) ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে ভারতবর্ষ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ উপমহাদেশ। ভারতের উত্তরে তুষারমৌলী গিরিরাজ হিমালয় প্রায় ১,৫০০ মাইল ব্যাপিয়া অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় বিস্তৃত এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও পূর্ব-পশ্চিমে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর ইহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।[১] তিনদিকে সমুদ্র থাকার জন্য ভারতবর্ষকে একটি উপদ্বীপ বলা হয়। ভারতের অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত অনুযায়ী মরুভূমি, অরণ্য প্রভৃতির সৃষ্টির ফলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(১) উত্তরে হিমালয়-সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতলভূমি, (৩) মধ্য ভারতের মালভূমি, (৪) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি এবং (৫) উপকূলভাগ ও সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ সমতলভূমি বা তামিলভূমি।

(১) উত্তরে হিমালয়-সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল ঃ এই অঞ্চল হিমালয় ও তৎসংলগ্ন পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। কাশ্মীর হইতে শুরু করিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এবং নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। এই তুষারমৌলী পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে ভারতকে রাশিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, অপর দিকে তিব্বত, চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।

(২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতলভূমি ঃ এই অঞ্চল পূর্বে বাংলাদেশ হইতে পশ্চিমে রাজস্থান ও কচ্ছের মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। সিন্ধু-উপত্যকা এখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। গাঙ্গেয় উপত্যকা ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও শস্যসমৃদ্ধ জনবহুল অঞ্চল। ইহা পলিমাটি সমৃদ্ধ উর্বরাভূমি।

(৩) মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চল ঃ ইহা উত্তরাঞ্চলের দক্ষিণাংশ এবং বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরাংশ লইয়া গঠিত। পূর্বদিকে ছোটনাগপুরের মালভূমি এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালার অংশবিশেষ ইহার অন্তর্গত। প্রাচীনকালে ইহা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বিন্ধ্য পর্বত এই অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। চম্বল উপত্যকা ও দণ্ডকারণ্য ইহার অন্তর্গত।

(৪) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ঃ ইহা বিন্ধ্য পর্বত হইতে শুরু করিয়া সুদূর দক্ষিণের সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের মাটি অনুর্বর এবং কৃষ্ণ বর্ণের। এই অঞ্চল উত্তরাপথের সম্পদ ও প্রাচুর্য হইতে বঞ্চিত এবং দুই দিক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

---

(১) বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে যে, "উত্তরম যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্‌:
বর্ষম্‌ তদ্‌ ভারতম নাম ভারতী যত্র সন্ততি।"—২।৩।১

করা হইত। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্ (যথা, ডক্টর বি. এস. গুহ) ভারতীয়দের ছয়টি বিভাগে পুনর্বিন্যাস করিয়াছেন। এই মতানুসারে (১) নিগ্রিটো, (২) প্রোটো-অস্ট্রলয়েড, (৩) মোঙ্গলয়েড, (৪) মেডিটারেনিয়ান (ভূমধ্যসাগরীয়), (৫) ওয়েস্টার্ণ ব্রাকিসিফেলাস এবং (৬) নর্ডিক বা আর্য জাতির লোকেরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে।

জাতিগত ছয়টি বিভাগ

একমাত্র আসামের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন অংশে নিগ্রিটো শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী আর্য-অনার্য সংমিশ্রণজাত। মোঙ্গলয়েড শ্রেণীর লোকেদের প্রধানতঃ চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল (বাংলাদেশ), সিকিম, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। মেডিটারেনিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন লোকেদের দেখিতে পাওয়া যায় সিন্ধু, গঙ্গা-উপত্যকা, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে। ব্রাকিসিফেলাস জাতীয় লোকের বাস উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, গঙ্গা-উপত্যকা, অন্ধ্র, তামিল প্রভৃতি অঞ্চলে। নর্ডিক বা আর্য জাতির বংশধরগণকে ভারতের উত্তরাঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী ও উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট।

(খ) জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গঠনে ভৌগোলিক প্রভাব : প্রত্যেক দেশের নদী, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ সেই দেশের অধিবাসীদের চরিত্র-গঠনে এবং ঐতিহাসিক বিকাশে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। নদী, পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সীমারেখা নির্ধারিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সীমান্তরক্ষার অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করে। ভারতবর্ষের সু-উচ্চ হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত উহার উত্তর সীমান্ত চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মধ্যস্থিত বিন্ধ্য পর্বত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য নামে দুইটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছে।

পর্বতের প্রভাব

হিমালয় হইতে উদ্ভূত সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী ও উহাদের উপনদীগুলি আর্যাবর্তকে এক উর্বর, শস্য-শ্যামল অঞ্চলরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। নদ-নদীগুলির উপকূলে জনবহুল বসতি বিস্তার এবং সভ্যতার উত্থান-পতন ও ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে—যথা, সিন্ধু-সভ্যতা ও গাঙ্গেয় আর্য সভ্যতা।

নদ-নদীর প্রভাব

আবার, দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রতীর এবং পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা, সর্ব-দক্ষিণের ভারত মহাসাগর ও পক প্রণালী এবং ত্রিভুজাকৃতি অবস্থান দাক্ষিণাত্যকে একটি উপদ্বীপে পরিণত করিয়াছে। এই সুরক্ষিত উপদ্বীপের নর্মদা, তাপ্তী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীগুলি খরস্রোতা এবং নৌ-বাহনের অযোগ্য। এখানকার মাটি রুক্ষ ও অনুর্বর, কৃষি-সম্পদ অপ্রচুর। কালো মাটি তুলাচাষের অনুকূল বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের

সমুদ্রের প্রভাব

(৫) **উপকূলভাগ ও সুদূর দক্ষিণের সমতলভূমি বা তামিলভূমি ঃ** এই অঞ্চল কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলভাগে বন্দরের অবস্থান হেতু এই অঞ্চলের সামুদ্রিক বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য। তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ), কেরল, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্য ইহার অন্তর্গত।
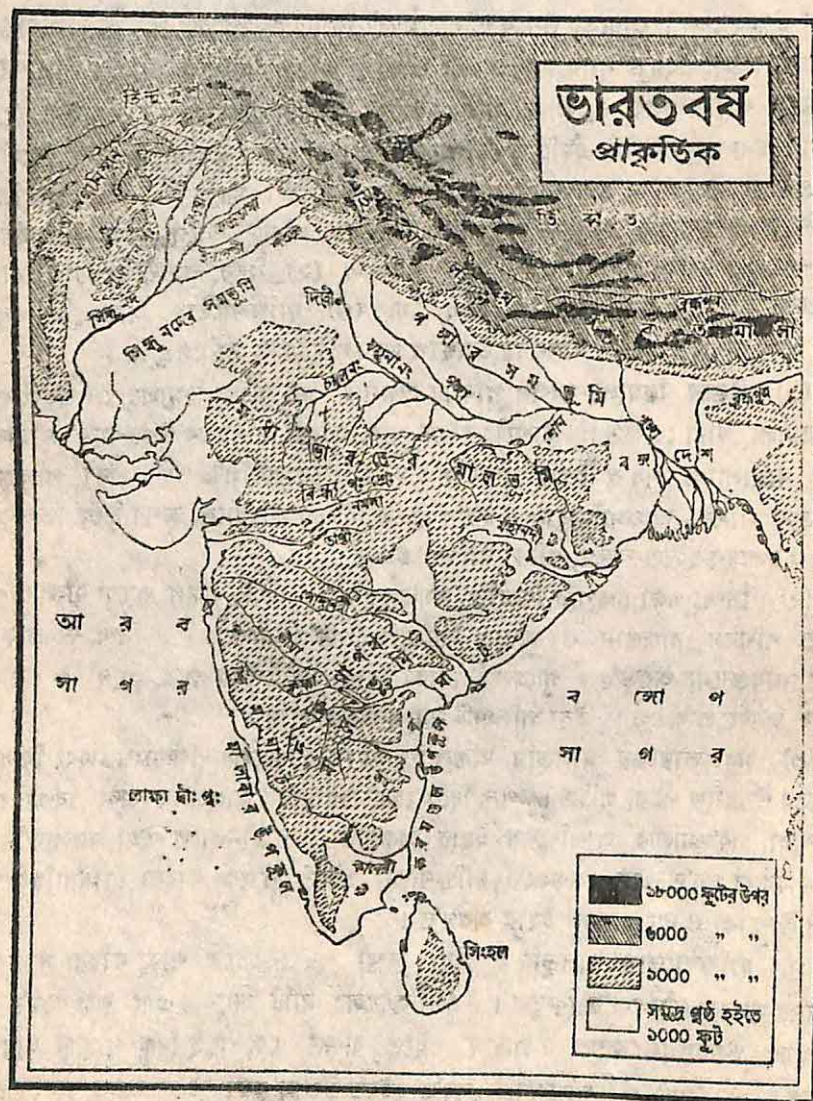
(ক-২) ভারতের জনগোষ্ঠী ঃ জাতিগত বিচারে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতীয়দের ছয়টি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয়দের প্রধানতঃ আটটি ভাগে ভাগ

প্রসার ঘটিয়াছে। আবার কৃষি-পণ্যের অপ্রতুলতা হেতু এখানকার অধিবাসীরা জীবিকার উপায় হিসাবে সমুদ্রযাত্রা, নাবিকবৃত্তি ও বহির্বাণিজ্যে উৎসাহী।

একই কারণে বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর-তীরবর্তী বন্দরগুলি হইতেও বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়াছিল। পূর্বদিক হইতে শ্যাম, চীন ও মালয় প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিতে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পশ্চিম দিক হইতে আরব, ইরাণ, পূর্ব-আফ্রিকার উপকূল এবং ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইউরোপে ভূমধ্যসাগরের তীরে ইতালীর অবস্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এশিয়ায় তিনদিকে সাগর-ঘেরা ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার

(গ) **বিভেদের মধ্যে ঐক্য ঃ** ইতিহাস হইতেছে ঘটনা প্রবাহের সমষ্টি। ভারতবর্ষের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা-স্রোতের, উত্থান-পতনের, 'হিন্দু, মুসলমান, শক-হুণদল-পাঠান-মোঘলের একদেহেলীন' হওয়ার এক বিচিত্র কাহিনী। 'প্রভেদের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা করিয়া, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাইকে একত্ববোধে অনুপ্রাণিত করিয়া ভারতের ইতিহাস চিরদিন 'বিভেদের মধ্যে ঐক্য' স্থাপনের (Unity in diversity) এক মহতী চেষ্টা করিয়াছে।' স্মরণাতীতকাল হইতে হিন্দু দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ ভারতবাসীর মনে এক অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ভাষার সার্বজনীন প্রভাব ও আধুনিককালে প্রচলিত ভারতীয় ভাষাগুলির জননী হিসাবে উহার অবদান ঐক্যমূলক। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের পিছনে সব যুগেই একটি রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা ও প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থরাজি চিরদিন ভারতীয় জনগণের মধ্যে একতাবোধের সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক এবং হিন্দুধর্মীয় ঐক্য এক **অখণ্ড বন্ধনে** উভয় অংশকে আবদ্ধ করিয়াছে। প্রাচীন কালে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের প্রচারিত রাজচক্রবর্তী, সম্রাট, একরাট, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি এবং রাজসূয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান সাম্রাজ্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছে। মধ্য যুগে (আলাউদ্দীন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযানের পর হইতে দিল্লীর মুসলমান শাসকদের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস এবং সুলতান ও বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করার ফলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতের সর্বত্র একই আইনকানুন প্রচলিত হওয়ায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায়, ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার ঘটায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য আরও দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী

ভাষাগত ও ধর্মশাস্ত্রীয় প্রভাব

কিছু ব্যক্তি জাতীয় অখণ্ডতা বিনষ্ট করিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করিতেছেন (যথা, পাঞ্জাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এ)।

(ঘ) **প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান ঃ** প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার প্রামাণ্য উপাদান পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। ইতিহাস রচনায় প্রাচীন ভারতীয়েরা ছিলেন উদাসীন। হয়ত সেইজন্যই প্রাচীন গ্রীসের হেরোদোতাস বা থুসীদিদিসের মত ঐতিহাসিকের আবির্ভাব এদেশে সম্ভব হয় নাই। সেই কারণে প্রাচীনকালের ধারাবাহিক, বিজ্ঞানসম্মত, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদানের যথেষ্ট অভাব আছে। তবে সেই অভাব কিছুটা পূরণ হইয়াছে রাজাদের অনুগ্রহপুষ্ট সভাকবিদের রাজ-প্রশস্তি হইতে, কিছুটা জনশ্রুতি হইতে, কিছুটা লিপিমালা হইতে, কিছুটা প্রাচীন মুদ্রাসমূহ হইতে, আবার কিছুটা স্থাপত্য হইতে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সমকালীন সাহিত্য হইতে। আধুনিককালে পুরাতত্ত্ব বিভাগ মৃত্তিকা খনন করিয়া বিভিন্ন জায়গায় প্রাচীন ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

এইসব উপাদানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। যথা—(১) সাহিত্যমূলক উপাদান ও (২) সাহিত্য-বহির্ভূত উপাদান। প্রথমটিকে আবার দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) প্রাচীন দেশীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য ও (২) প্রাচীন বৈদেশিক ঐতিহাসিক সাহিত্য।

সাহিত্যমূলক উপাদান

১। (ক) **প্রাচীন দেশীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য ঃ** প্রাচীনকালের হিন্দু রাজাদের অনুগ্রহপুষ্ট সভাকবিরা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের কীর্তি-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। প্রশস্তিগুলির মধ্যে উপমা ও অলংকারের আধিক্য এত বেশী এবং অতিরঞ্জনদোষ এত প্রকট যে তাহাদের ভিতর হইতে ঐতিহাসিক উপাদান উদ্ধার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। রাজাদের বৃত্তিভোগী কবিরা সাধারণতঃ পৃষ্ঠপোষক রাজাদের গুণগানই করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের রচনা হইতে রাজাদের কীর্তি-কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা সহজ নয়। ইঁহাদের কোন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। তথাপি দুই-একটি গ্রন্থে কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে কল্হন-প্রণীত 'রাজতরঙ্গিণী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থটিতে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবন্ধ হইয়াছে।

সভাকবিদের প্রশস্তি

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে সভাকবিদের প্রশস্তি অপেক্ষা চরিত-সাহিত্যের মূল্যই বরং বেশী। এই প্রসঙ্গে বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিত', বিহলনের 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রাম-চরিত', পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্ক-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট রাজাদের জীবন-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। কালিদাসের অনেক নাটকে গুপ্তবংশীয় রাজাদের কীর্তি-কাহিনীর কথা বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে অনেকেও প্রাচীন ভারতের বহু রাজার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

চরিত-সাহিত্য

সাহিত্য ছাড়া দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি বা সমাজনীতির উপর লিখিত পুস্তক হইতেও আমরা প্রাচীনকালের ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল চাণক্যের (কৌটিল্যের) 'অর্থশাস্ত্র'। মনুর সংহিতা, উপনিষদ্‌, বেদাঙ্গ, বেদান্ত প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য, পরবর্তীকালে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও পুরাণ গ্রন্থাবলীতেও প্রাচীন ভারতের সামাজিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য অতুলনীয়। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবেও ইহাদের গুরুত্ব অনেকখানি। বৈদিক সাহিত্য হইতে বৈদিক যুগের সামাজিক প্রথা (যেমন চতুরাশ্রম) প্রভৃতি সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণিত রাম-রাবণের যুদ্ধ আর্য-অনার্যদের মধ্যে যুদ্ধ বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন।[১]

বৈদিক সাহিত্য

বৌদ্ধ জাতকমালা, সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবংস', 'দীপবংস', অশ্বঘোষ ও নাগার্জুন-রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রভৃতি হইতেও সেই সময়কার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্য

খ) **প্রাচীন বৈদেশিক ঐতিহাসিক সাহিত্য ঃ** প্রাচীনকালে আগত বৈদেশিক পর্যটকগণ তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনীতে সেই সময়কার রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। মৌর্যবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আগত গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিস-রচিত 'ইণ্ডিকা' (Indica) নামক পুস্তকে তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ও সমাজ-জীবনের অনেক তথ্যবহুল বর্ণনা পাওয়া যায়। 'Periplus of the Erythrean Sea' নামক গ্রন্থে কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে বহু বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। চতুর্থ শতাব্দীতে আগত চীনদেশীয় পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** তাঁহার বিবরণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আগত চীন-দেশীয় পর্যটক **হিউএন-সাঙ্‌** সমকালীন সবরকম অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে এইগুলি খুবই মূল্যবান।

পর্যটকদের বর্ণনা

২। (ক) **প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ঃ** মাটির উপরে দণ্ডায়মান প্রাচীন মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং মাটির নীচের ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাচীনকালের বহু নগর, সৌধ, দেবদেবীর মূর্তি, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, সীলমোহর, মুদ্রা, স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। এইগুলি নিঃসন্দেহে প্রাচীনকালের ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো এবং পাঞ্জাবের হরপ্পায় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে সিন্ধু-সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আবার নালন্দা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানের

মাটি খুঁড়িয়া ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার

(১) রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রামায়ণ-মহাভারতকে কেবল মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও নহে,.........চিরকালের ইতিহাস"।

বৌদ্ধ-বিহারগুলির ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাচীনকালের বৌদ্ধ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃত্তিকার উপরে আবিষ্কৃত নানাপ্রকার সৌধ, মন্দির, স্তূপ, গুহা প্রভৃতিও প্রাচীনকালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তিরই নিদর্শন। মহাবলীপুরমের পহ্লবরাজাদের অপূর্ব স্থাপত্য, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলরাজাদের খজুরাহো মন্দিরসমূহ, দাক্ষিণাত্যে চোলরাজাদের গগনস্পর্শী গোপুরম, উত্তর-ভারতে সাঁচীস্তূপ সারনাথের স্তূপ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব কীর্তির প্রমাণ দেয়।

(খ) **মুদ্রা:** প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার আর একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান হইল প্রাচীন মুদ্রা। প্রাচীনকালীন মুদ্রায় যে সকল রাজার নাম ও তারিখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের রাজত্বকাল নির্ণয়, সময়পঞ্জী নির্ধারণ, মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হইতে রাজাদের রাজ্যবিস্তার এবং অন্যান্য দেশের সহিত তাঁহাদের অর্থনৈতিক যোগসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মুদ্রাঙ্কিত চিত্র হইতে ঐতিহাসিক নানা ঘটনার বিবরণ জানিতে পারা যায়। যেমন, মুদ্রায় অঙ্কিত সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি হইতে তাঁহার সঙ্গীত-চর্চার কথাটি জানিতে পারা যায়। দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত রোমক মুদ্রা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে সেই সময়ে রোম সাম্রাজ্যের সহিত দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক আদান-প্রদান ছিল। কুষাণ রাজাদের স্বর্ণমুদ্রা, দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজাদের নানারকম রৌপ্যমুদ্রা, গ্রীক, শক, পহ্লব প্রভৃতি রাজাদের আমলের প্রাপ্ত মুদ্রা হইতে সেই সমস্ত দেশী-বিদেশী রাজাদের নাম, উপাধি, রাজত্বকাল প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। একদেশের মুদ্রা অপর দেশে আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হয় যে, ঐ দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

(গ) **লিপিমালা:** প্রাচীনকালের ইতিহাস রচনার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল লিপিমালা। প্রাচীন ভারতের রাজারা নিজেদের কীর্তি-কাহিনী, ধর্মীয় অনুশাসন পাহাড়ের গাত্রে বা পাথরের তৈয়ারী স্তম্ভে খোদাই করিয়া রাখিতেন। এই সমস্ত সরকারী শিলালিপি ছাড়া আধা-সরকারী বা ব্যক্তিগত শিলালিপি রচনার প্রচলনও ছিল। কেহ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে বা তদ্রূপ কোন কিছু দান বা উৎসর্গ করিলে লিপিমালায় তাহা খোদাই করিয়া রাখিতেন।

মৌর্য যুগে এই রীতির ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল। সম্রাট অশোকের লিপিমালা ভারত-ইতিহাসের মূল্যবান মৌলিক উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এইগুলিতে অশোক তাঁহার ধর্মমত, ধর্মীয় অনুশাসন, রাজ্যসীমা, জনহিতকর কার্য প্রভৃতি বহুবিষয়ক বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। সভাকবিদের রচিত প্রশস্তিগুলিও স্তম্ভে বা পাথরের গায়ে খোদাই করিয়া রাখা হইত। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেন-রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', রবিসেন-রচিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর 'আইহোল প্রশস্তি', কিংবা সাতবাহনরাজ 'সাতকর্ণীর প্রশস্তি' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অশোকের অনুশাসন

খোদিত কবি-প্রশস্তি

রাজাদের দান-ধর্ম ও কীর্তি-কাহিনীমূলক শিলালিপির মধ্যে কলিঙ্গরাজ খারবেলের কাহিনী, সৌরাষ্ট্রের শক-ক্ষত্রপ-রুদ্রদামনের কাহিনী, অন্ধ্রবংশীয় রাজা-রাণীদের দানশীলতার কাহিনী ইত্যাদি যথাক্রমে হাতিগুম্ফা, জুনাগড়, নানাঘাট, কারলি প্রভৃতি জায়গায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বহির্ভারতেও ভারত সম্পর্কীয় শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বোঘাজকোই শিলালিপি এবং বাহিস্তান ও নকসী রুস্তম শিলালিপি হইতে মধ্য এশিয়ার আসিরিয়া, ব্যাবিলন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সম্পর্কের পরিচায়ক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সিংহল (শ্রীলঙ্কা), নেপাল, আফগানিস্থান, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে ঐ সমস্ত দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাব, রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বহির্ভারতে প্রাপ্ত শিলালিপি

অনুশীলনী

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) ভারতের উত্তর সীমান্তে কোন্ পর্বতমালা রহিয়াছে? (খ) কোন্ পর্বত ভারতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে? (গ) ভারতের তিনদিকের সমুদ্রের নাম কি কি? (ঘ) পুরাণ কয়টি? (ঙ) খারবেলের শিলালিপির নাম কি? (চ) এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে কোন্ রাজার প্রশস্তি আছে? (ছ) বোঘাজকোই শিলালিপি কোন্ সময়ে রচিত? (জ) 'ইণ্ডিকা' কাহার দ্বারা রচিত? (ঝ) কল্হনের রচনার নাম কি? (ঞ) 'হর্ষ-চরিতের' রচয়িতা কে?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ কি কি? (খ) ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব আলোচনা কর। (গ) ভারতীয়দের চরিত্র গঠনে ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সমুদ্র কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? (ঘ) ভারতের প্রধান জনগোষ্ঠীর বিবরণ দাও। (ঙ) ভারতের জাতীয় ঐক্য গঠনের মূল সূত্রগুলি কি কি? (চ) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কাহাকে বলে? (ছ) ইতিহাসের উপাদান হিসাবে শিলালিপির গুরুত্ব কি? (জ) প্রাচীন মুদ্রা কিভাবে ইতিহাস রচনা করিতে সাহায্য করে? (ঝ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য দেশীয় সাহিত্যিক উপাদান কি কি? (ঞ) প্রাচীন ভারতে আগত কয়েকজন বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণ দাও।

৩। নাতিদীর্ঘ বর্ণনামূলক উত্তর লিখ:

(ক) ভারতীয় ইতিহাসে মূলগত ঐক্যের কারণ কি? (মাঃ ১৯৮৫) (খ) "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"—ভারতের ইতিহাসে এই উক্তির যথার্থ প্রয়োগ কিভাবে ঘটিয়াছে যুক্তিসহ আলোচনা কর। (গ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার যে-কোন তিনটিউপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর। (মাঃ ১৯৮৪) (ঘ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুদ্রা, শিলালিপি এবং বৈদেশিক বিবরণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে সভ্যতার উন্মেষ

(ক) প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন : ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম দেশগুলির অন্যতম। অতি প্রাচীনকালেই এখানে মানব-সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। সেই প্রাচীনকালের মানুষদের বলা হইত **পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ।** ইহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র কোয়ার্জ নামক প্রস্তর হইতে নির্মিত। ইহারা ধাতু-নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার জানিতনা। ইহাদের প্রস্তর-নির্মিত হাতিয়ার দক্ষিণ ভারতে এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ইহারা ছিল শিকারী এবং নিগ্রিটো জাতির পূর্বপুরুষ।[১] তবে ইহাদের সম্বন্ধে এখনো সঠিকভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। এই যুগের পরবর্তী যুগ **নব্য প্রস্তর যুগ** নামে অভিহিত হয়। এই যুগের অধিবাসীরা তাহাদের পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা উন্নততর জীবন যাপন করিত। ইহারা সূক্ষ্ম ও মসৃণ প্রস্তরের হাতিয়ার ব্যবহার করিত। ইহার পরবর্তী যুগ **তাম্রযুগ** এবং তাহার পরবর্তী যুগ **লৌহযুগ** নামে অভিহিত হয়। শেষোক্ত দুই যুগের অধিবাসীরা যে ধাতুর দ্বারা নির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার জানিত তাহা এই দুই যুগের নামকরণ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০০ হইতে ১৫০০ অব্দের মধ্যে ধাতু যুগের শুরু হয়।
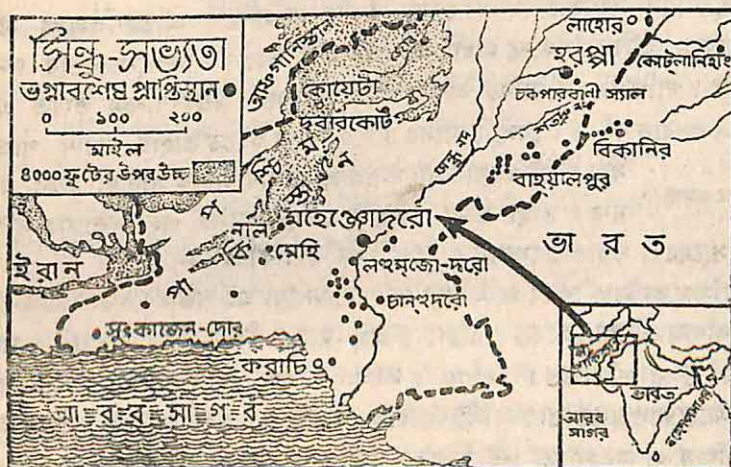
(খ) হরপ্পা-সভ্যতা বা সিন্ধু-সভ্যতা : ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, সিন্ধু-সভ্যতা তাম্রযুগের অবসানে এক যুগসন্ধিক্ষণে সিন্ধু ও তাহার উপনদী-বিধৌত অঞ্চলে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে এবং পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পাতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগীয় খননের ফলে এই সভ্যতার সুস্পষ্ট

---

(১) প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়ার মতে, দক্ষিণ ভারতের পূর্ব-উপকূলে হিমযুগের শেষে ভারতে আদি মানবের উদ্ভব হয়। Vide—History and Culture of the Indian People. (The Vedic Age), vol. I, Bharatiya Vidyabhavan, 1965. (Pre-historic Age, p. 134)

নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পূর্বে ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল আর্যদের আগমনের পর হইতেই এদেশে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হইয়াছে। তদনুযায়ী অনেক ঐতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সভ্যতা তৎকালীন মিশরীয় অথবা সুমেরীয় সভ্যতা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।

সিন্ধু-সভ্যতার ঐতিহাসিকতা

অনেকে মনে করেন যে, সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা কোন একটি বিচ্ছিন্ন সভ্যতা ছিল না। ইহার সহিত পশ্চিম এশিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই যোগসূত্রের নিদর্শন হিসাবে বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেইগুলির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বিভাগের অধ্যক্ষ জন মার্শাল বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এই বিলুপ্ত সভ্যতার আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে মার্টিমার হুইলার (Mortimer Wheeler), পিগট (Pigot), দয়ারাম সাহানী, ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের চেষ্টায় এই সভ্যতার উপর আরও নানা দিক হইতে আলোকসম্পাত হইয়াছে, আরও অনেক তথ্য জানা গিয়াছে।

সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার

এই সুপ্রাচীন সভ্যতার জনক কোন্ জাতি সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন—সিন্ধু-সভ্যতার জনক দ্রাবিড় জাতি। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় অধিবাসীরা এককালে উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বেলুচিস্তানে বসবাস করিত। বেলুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাহা ছাড়া, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের এই সভ্যতার সহিত সমকালীন সুমেরীয় সভ্যতার যোগসূত্র অনেকে স্বীকার করিয়াছেন।

সিন্ধু-সভ্যতার জনক

ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, এই সভ্যতা ভারতে আমদানি হইয়াছিল পশ্চিম এশিয়া হইতে। তাঁহাদের এই মতের ভিত্তি মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহরের উপর প্রতিষ্ঠিত। এলাম (Elam) এবং মেসোপটেমিয়ার আবিষ্কৃত সীলমোহর মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহরেরই অনুরূপ। ইহা হইতেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, পশ্চিম এশিয়া হইতেই এই সভ্যতা ভারতে প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদও অনুমানভিত্তিক, নিশ্চিত কোন প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

সুতরাং একথা এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না এই সভ্যতার জনক কে? তবে সিন্ধু-সভ্যতার সহিত পশ্চিম এশিয়ার পূর্বতন অথবা সমকালীন (ঐতিহাসিকদের মতভেদ অনুসারে) ব্যাবিলনের সভ্যতার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। পোড়ামাটির ব্যবহার, ইটের ইমারত, কুমোরের চাকা, সীলমোহর, কৃষি ও সেচ-পদ্ধতি প্রভৃতির সাদৃশ্য হইতে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই দুই সভ্যতার মধ্যে একটি যোগসূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছেন। মাতৃকাদেবীর উপাসনা, মৃন্ময় শস্যাধার, চিত্রধর্মী সাংস্কৃতিক লিপির ব্যবহার ইত্যাদি

বিভিন্ন মতবাদের মূল্যায়ন

হইতে ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে যে মিনোয়ান বা ঈজিয়ান সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কেবল কয়েকটি নিদর্শনের মিল বা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই একথা বলা চলে না, সিন্ধু-সভ্যতা মেসোপটেমীয় সভ্যতা বা ক্রীটান সভ্যতা হইতেই উদ্ভূত। বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে এক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত অন্য এক দেশের সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া এবং একের বিকাশে অপরের প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলিয়া একটি অপরটির জনক এই সিদ্ধান্ত করা চলে না। কোন সভ্যতাই আকস্মিকভাবে একদিনে গড়িয়া উঠে না। সিন্ধু-সভ্যতাও একদিনের সৃষ্টি নয়। কোন সভ্যতারই একটিমাত্র উৎস নয়, সিন্ধু-সভ্যতাই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? সুতরাং এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে হইবে যে নানা ধরনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা সভ্যতার প্রভাবের ফলে এই উন্নত ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল।

সিদ্ধান্ত

এইরূপ একটি উন্নত সভ্যতা অনেকখানি স্থান বিস্তার করিয়া থাকিবে ইহাই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই বিস্তৃতির সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। তবে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলায় আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই সভ্যতা অন্ততপক্ষে পাঞ্জাব হইতে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত সিন্ধু নদের অববাহিকায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। আমরি, ঝাঙর, চানহুদরো প্রভৃতি অঞ্চলেও যে এই সভ্যতা বিরাজমান ছিল তাহার নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি গুজরাট, রাজস্থান, এমনকি গাঙ্গেয় উপত্যকায়ও এই সভ্যতার পরিচায়ক নানা ধ্বংসচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার প্রকৃত বিস্তৃতি কতদূর পর্যন্ত ছিল তাহা নিশ্চিতভাবে এখনও বলা যায় না। ভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিক একদিন ইহার সন্ধান দিবেন।

সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তার

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে কতকগুলি স্তর-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই সভ্যতা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে ইহার বিনাশ ঘটে। এই স্তর-বিভাগ হইতে সভ্যতা বিকাশের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে প্রথম আবিষ্কৃত স্তর খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর পূর্বেকার। মধ্যস্তরের বয়স খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের কাছাকাছি। আর সবচেয়ে নীচের স্তরের অস্তিত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরেরও অধিক। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে, সিন্ধু-সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-২০০০ অব্দের মধ্যে সৃষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি কার্বন-১৪ নামক পরীক্ষার দ্বারা সিন্ধু-সভ্যতার কাল নির্ণয় করা হইয়াছে।

সিন্ধু-সভ্যতার স্তরভেদ ও কাল নির্ণয়

প্রাপ্ত ভগ্নাবশেষ হইতে সিন্ধু-সভ্যতার বিবরণ : মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ যে-সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। ইহার নগর গঠন-প্রণালী ছিল অতি উন্নত ধরনের। প্রধানতঃ তিন

শ্রেণীর ইষ্টক-নির্মিত অট্টালিকা এখানে পাওয়া গিয়াছে—(১) বড় বড় ইমারত, (২) বাসের জন্য মাঝারি বাড়ী এবং (৩) স্নানাগার ইত্যাদি। ইহার রাজপথগুলি ছিল প্রশস্ত এবং সোজাসুজি বিস্তৃত। পথের দুই পাশে ছিল পাকা নর্দমা। জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী, স্নানাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখিয়া সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়, উন্নত নাগরিক জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ইহাতে ছিল। বাসগৃহ এবং স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ হইতে স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপজীবিকা ও খাদ্য

অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল গম, তুলা ইত্যাদি। জনসাধারণের প্রধান খাদ্য ছিল গম, যব, ফল ও দুধ। মাছ এবং মাংসও তাহারা খাইত।

গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, হাতী, উট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খুব সম্ভবতঃ এই যুগে অশ্বের ব্যবহার ছিল না।

বহির্বাণিজ্য ও শিল্প

কৃষির সহিত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ফলে ভারতের বাহিরেও এই যুগের বণিকদের বাণিজ্য চলিত। এই যুগের শিল্পী-সম্প্রদায়ের মধ্যে কুম্ভকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, চর্মকার প্রভৃতি শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধাতু-নির্মিত দ্রব্য

মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার অধিবাসীদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু-নির্মিত দ্রব্যের ব্যবহার ছিল। লৌহের ব্যবহার তাহাদের জানা ছিল না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ঐ অঞ্চলে সোনা মিলিত না। তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্রের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাথর দিয়াও যে অস্ত্র তৈয়ারী হইত, সেই নিদর্শনও আছে।

পোশাক ও অলংকার

অধিবাসীরা সাধারণতঃ তুলার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিত। শীতবস্ত্র হিসাবে পশমের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অলংকার ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোকেরা সোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতের গহনা ব্যবহার করিত। গহনার মধ্যে আংটি, কানের দুল, নাকছাবি, মল, হার ও বাজুবন্ধের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। দামী পাথরের গহনারও প্রচলন ছিল।

ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প

সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন পাত্র, সীলমোহর প্রভৃতি হইতে সেই সময়কার শিল্পীদের ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল পাত্রের গায়ে অঙ্কিত নানা জীবজন্তুর আলেখ্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্র উচ্চ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। প্রাপ্ত সীলমোহরের উপর গরু, মহিষ, মানুষের মূর্তি, লতা-পাতা এবং পশুপতি শিবের ছবি আঁকা দেখা যায়। এই সমস্ত শিল্পকার্যে সুন্দর কলাসম্মত রঙের ব্যবহার লক্ষণীয়। সীলমোহরে কিছু কিছু লিপিও লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এ যুগে লিপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল, লোকেরা লিখিতে জানিত। এই সমস্ত লিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই।

মহেঞ্জোদড়োতে গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্রও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আছে নানা রকমের মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জের তৈয়ারী কুঠার, পোড়ামাটির খেলনা এবং আরও নানা প্রকারের গৃহস্থালীর জিনিস।

সিন্ধু-সভ্যতা যে খুবই উন্নত স্তরের একটি সভ্যতা ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুগের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। তবে আবিষ্কৃত সীলমোহরাদিতে প্রতিকৃতি অথবা মৃত্তিকা বা ধাতুর নির্মিত কতকগুলি ক্ষুদ্র মূর্তি হইতে অনুমিত হয় যে ইহারা কোন মাতৃদেবীর পূজা করিত, অতএব শক্তি-উপাসক ছিল। আবার, পশুপতিরূপী এক দেবতার ছবি অংকিত সীলমোহর দেখিয়া এই অনুমানও করা যায় যে ইহারা শৈব বা শিবের উপাসক ছিল। তবে মাতৃকাপূজাই প্রধান উপাস্য ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকদের অনুমান।

ধর্মমত

মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা হিসাবে কবর দেওয়া এবং দাহ করা দুই প্রকার প্রথাই প্রচলিত ছিল। মাটির নীচে সমাহিত অনেক কংকাল পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, এই নগরীর খননকালে মাটির নীচে একসঙ্গে রাশি রাশি শায়িত কংকাল পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, হয়ত নগরটি বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নষ্ট হইয়াছিল। আবার অনেকে মনে করেন সিন্ধু নদের বন্যা বা জলপ্লাবনের ফলেই নগরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

মৃতের সংকার

সিন্ধু-সভ্যতা ও আর্য-সভ্যতার তুলনা ঃ সিন্ধু-সভ্যতার সহিত পরবর্তী আর্য-সভ্যতার অনেক বিষয়েই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

(১) সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক ; বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক।

(২) সিন্ধু-সভ্যতার লোকেরা লৌহের ব্যবহার জানিত না, বৈদিক আর্যরা লৌহের ব্যবহার জানিত।

(৩) বৈদিক আর্যরা অশ্বের ব্যবহার জানিত। সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীদের নিকট অশ্বের ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল।

(৪) বৈদিক আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না ; সিন্ধু-সভ্যতার যুগের অধিবাসীদের মধ্যে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল।

(৫) বৈদিক আর্যদের উপাস্য দেবতা বহু এবং তাহাদের অধিকাংশই পুরুষ দেবতা। সিন্ধু-সভ্যতার উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে মাতৃকাপূজাই প্রধান।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর্য-সভ্যতাকে যদি প্রথম ঐতিহাসিক যুগ ধরা হয়, সিন্ধু-সভ্যতাকে তাহা হইলে সেই যুগেরই উপক্রমণিকা বলিতে হইবে।

অনুশীলনী

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ কাহাকে বলা হয় ? (খ) নব্য প্রস্তর যুগ কথাটির অর্থ কি ? (গ) হরপ্পা-সভ্যতার প্রথম আবিষ্কর্তা কে ? (ঘ) মাটির নীচে সিন্ধু-সভ্যতার কয়টি স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে ? (ঙ) সিন্ধু-সভ্যতার উদ্ভব কাল কি ? (চ) সিন্ধু-সভ্যতার জনক কে ? (ছ) সিন্ধু-সভ্যতার সমকালীন দুইটি সভ্যতার নাম কর।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) প্রস্তর যুগ বলিতে কি বুঝায় ? প্রাচীন ও নব্য প্রস্তর যুগের মধ্যে পার্থক্য কি ? (খ) সিন্ধু-সভ্যতার বিনাশ কিভাবে ঘটিয়াছিল ? (গ) সিন্ধু-সভ্যতার নগর-জীবন সম্বন্ধে কি জান ? (মাঃ ১৯৭৯) (ঘ) সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ দাও। (ঙ) সিন্ধু অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক ও জীবিকা কি ছিল ? (চ) সিন্ধু-সভ্যতার বিস্তৃতি সম্বন্ধে কি জান ? (ছ) বহির্বিশ্বের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার যোগাযোগ সম্বন্ধে কি জান ?

৩। বিশদ বিবরণ দাও ঃ

(ক) সিন্ধু-সভ্যতার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত যে-সমস্ত নিদর্শন খনন কার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ দাও।

(খ) সিন্ধু-সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার কি সম্পর্ক ছিল ? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে ভারতে স্থাপিত হইয়াছিল ?

———

তৃতীয় অধ্যায়
বৈদিক যুগ
(The Vedic Age)

(ক) 'আর্য' বলিতে কি বুঝায় ? ঃ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ইউরোপ ও এশিয়ার মানবগোষ্ঠী মূলত এক। গ্রীক, ল্যাটিন, পারসিক ও সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলি একই মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। একই বা সমভাষাভাষী লোকেরা একই জাতিভুক্ত এইরূপ অনুমান করা হয়। এই মূলভাষার নাম ছিল আর্য ভাষা। এই ভাষায় যাহারা কথা বলিত তাহারাই আর্য জাতি নামে পরিচিত। ভারতীয় আর্যগণের প্রথম ও প্রধান ধর্মগ্রন্থের তথা সাহিত্যের নাম বেদ। বেদের নাম অনুসারে আর্য সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতাও বলা হয়। বেদ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভারতীয় আর্য জাতির আদি নিবাস কোথায় ছিল সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদ বিশেষভাবে আলোচিত হয়। প্রথম মতবাদ হইল এই যে আর্যরা দেশজ অর্থাৎ ভারতের অধিবাসী। গঙ্গানাথ ঝা প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত মনে করেন যে, আর্যগণ আদিতে ভারতের মুলতান অঞ্চলে বসবাস করিত। এই স্থান হইতে তাহারা ক্রমে পারস্যে ও ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ডঃ এ. সি. দাস মনে করেন যে সপ্তসিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চলে[১] আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল। ডঃ পুসলকারও ভারতবর্ষকে আর্যদের আদি বাসভূমিরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। এই মতের বিপক্ষে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতদের যুক্তিপূর্ণ মতবাদ হইল এই যে আর্যরা বহিরাগত। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার, অধ্যাপক ম্যাকডোনাল ও অধ্যাপক গিলস এবং ভারতীয় ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতদের মতে দক্ষিণ রাশিয়া, মধ্য এশিয়া অথবা উত্তর মেরু অঞ্চলে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল। মধ্য এশিয়ার পারস্য অঞ্চল আর্যদের আদি বাসভূমি। মতবাদটি যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণীয়। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২000 হইতে ১৫00 বৎসর আগে মধ্য এবং দক্ষিণ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি হইতে আর্যরা খাদ্য এবং বাসস্থানের সন্ধানে দেশ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের একটি শাখা পারস্যে প্রাচীন ইরাণী সভ্যতার পত্তন করে, অপর একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং পাঞ্জাবের নিকটবর্তী সপ্তসিন্ধু নদী-উপত্যকায় বসবাস করিতে শুরু করে। প্রাচীন ইরাণী ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবার ল্যাটিন ও জার্মান ভাষার সহিতও সংস্কৃতের মিল আছে—যথা পিতৃ, মাতৃ ইত্যাদি। শুধু তাহাই নয়, আর্য ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এবং পারসিক ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ-আবেস্তা'র মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। আর্য

আর্যদের পরিচয়

আর্যদের আদি বসতি

---

(১) সিন্ধু নদের পাঁচটি উপনদী (শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, ঝিলাম ও চন্দ্রভাগা) এবং সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীবাহিত অঞ্চলকে সপ্তসিন্ধু অঞ্চল বলে।

জাতির অন্যান্য শাখা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারাই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান এবং বর্তমান টিউটনিক ও ল্যাটিন জাতির পূর্বপুরুষ বলিয়া কথিত হয়।

আর্যরা ঠিক কোন্ সময়ে ভারতে প্রথম বসবাস শুরু করে তাহা এখনও সঠিক ভাবে নির্ণীত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে ঋগ্বেদে বর্ণিত কোন কোন ঘটনার সূত্র হইতে অনুমান করা হয় যে আর্যরা খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরেরও আগে ভারতে আগমন করে। পশ্চিম এশিয়ার বোঘাজকোই নামক স্থানে আবিষ্কৃত লিপি হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের আগে আর্যরা মধ্য এশিয়া হইতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভারতে আগমন করে। উক্ত লিপি খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্বে রচিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। বৈদিক আর্যদের দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, অশ্বিনী প্রভৃতির নাম এই লিপিতে উল্লেখ আছে।

আর্যদের ভারতে আগমন কাল

ঋগ্বেদ আর্যদের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ তথা সাহিত্য কীর্তি। ঋগ্বেদে বর্ণিত গাছপালা ও প্রাণীর নাম দেখিয়া গিলস (Giles) প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে আর্যরা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বল্কান অঞ্চলে অথবা ভিশ্চুলা নদীর তীরে বসবাস করিত। বেদে বর্ণিত প্রাণী ও গাছপালার সঙ্গে এই সকল অঞ্চলের প্রাণী ও গাছপালার সাদৃশ্য আছে। ঋগ্বেদের যুগের আর্যদের সহিত উপরি-উক্ত অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের যে গাযোগ থাকিলেও পরবর্তীকালে যোগসূত্র ছিল ক্ষীণ এবং ক্রমে তাহা বিলীন হইয়া যায়। ঋগ্বেদে আর্যদের আদি যুগের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতির বীজ নিহিত আছে।

(খ) বৈদিক সাহিত্য (Vedic literature): আর্যরা যেখান হইতে এবং যখনই ভারতে আসিয়া থাকুক, তাহাদের মনীষার ও সাহিত্য রচনার প্রথম সার্থক ও সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য রচনায়। বেদ চারিটি—ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব প্রাচীন। এই গ্রন্থটি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। বেশীর ভাগ পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ হইতে ১০০০ অব্দ। কেহ কেহ আরও পূর্বে বলিয়া মনে করেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ মনীষী ম্যাক্সমূলারের মতে, ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১২০০ হইতে ১০০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত যুগের মধ্যবর্তী কোন সময়ে। অপর তিনটির বয়স অপেক্ষাকৃত কম। হিন্দুদের মতে বেদ মানুষের রচনা নয়, ইহা ঈশ্বরের বাণী। তাই হিন্দুরা বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিয়া মনে করেন। বৈদিক সাহিত্যকে 'শ্রুতি' বলা হয়। কারণ ইহা শুনিয়া শুনিয়া বংশ-পরম্পরায় আবৃত্তির মাধ্যমে চলিয়া আসে। আদিতে বেদ লিখিত ছিল না। পরবর্তীকালে লিখিত হয়। ঋগ্বেদে ১,০২৮টি স্তোত্র আছে।[১] সামবেদে ঋগ্বেদের

(১) মতান্তরে ১,০১৭টি।

স্তোত্রগুলি ছন্দাকারে রচনা করা হয়। যজ্ঞের সময় সামবেদের স্তোত্রগুলি গানের মত আবৃত্তি করা হয়। ইহাকে সামগান বলে। যজুর্বেদে স্থান পাইয়াছে যজ্ঞের ক্রিয়া-কলাপের উপযোগী মন্ত্রাদি। বৈদিক যুগের একেবারে শেষভাগে রচিত হয় অথর্ববেদ। ইহাতে আছে চিকিৎসাশাস্ত্র, শত্রুদমন, বশীকরণ, সৃষ্টিরহস্য বিষয়ক মন্ত্রাদি।

বেদের দুইটি প্রধান অঙ্গ বা অংশ। বেদের যে অংশটি পদ্যে বা ছন্দে রচিত তাহার নাম **সংহিতা**। গদ্যাংশটির নাম **ব্রাহ্মণ**। ইহাতে স্তব-স্তুতি ও মন্ত্রাদি রহিয়াছে। সংহিতার অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রগুলি অধিকাংশই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীগণের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রবিশেষ। যজ্ঞানুষ্ঠানের ও ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী মন্ত্রের সমষ্টি লইয়া সংকলিত হইয়াছে **যজুর্বেদ** সংহিতা। অথর্ববেদ সংহিতায় অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তবস্তুতি এবং বিঘ্ননাশক বহুবিধ মন্ত্রের সমাবেশ হইয়াছে।

সংহিতা

বেদের গদ্যাংশ 'ব্রাহ্মণ'। বেদের এই গদ্যাংশে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞে আচরণীয় ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন সংহিতার সহিত বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সংশ্লিষ্ট। ঋগ্বেদ সংহিতার সহিত সংশ্লিষ্ট 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ', যজুর্বেদ সংহিতার সহিত সংশ্লিষ্ট 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং অথর্ববেদ সংহিতার সহিত সংশ্লিষ্ট 'গোপথ ব্রাহ্মণ'।

ব্রাহ্মণ

বেদের অপর দুইটি অংশ হইল আরণ্যক ও উপনিষদ। আরণ্যকে বানপ্রস্থ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উপনিষদে আত্মা, ব্রহ্ম, জীবাত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু উচ্চাঙ্গের দার্শনিক আলোচনা আছে। উপনিষদ্ অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদের মতে উপনিষদ্গুলি **বৌদ্ধপূর্ববর্তী** কালের রচনা। অরণ্যে-পর্বতে তপস্যারত মুনি-ঋষিদের উপলব্ধ সত্যজ্ঞান উপনিষদে স্থান পাইয়াছে। এইগুলি গদ্যে রচিত।

উপনিষদ্

প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ বংশ-পরম্পরায় যে-সকল রীতিনীতি স্মরণ করিয়া রাখিতেন, তাহাদের বলা হইত **স্মৃতি**। স্মৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বেদাঙ্গ সাহিত্য। বেদকে কেন্দ্র করিয়া এইগুলি রচিত। শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প এই ছয় বেদাঙ্গ বেদপাঠের জন্য একান্তই প্রয়োজন।

বেদাঙ্গ

প্রাচীন আর্যগণের দর্শন প্রধানতঃ ছয়টি শাখায় বিভক্ত ছিল। কপিল-রচিত 'সাংখ্যদর্শন', পাতঞ্জলি-রচিত 'যোগদর্শন', গৌতম-রচিত 'ন্যায় দর্শন', জৈমিনি-রচিত 'পূর্বমীমাংসা' এবং ব্যাস-রচিত 'উত্তরমীমাংসা'কে **ষড়্দর্শন** বা ষড়্-বেদান্ত বলা হয়। বেদাঙ্গ ও বেদান্ত বেদকেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ। উহাদের ধর্মসূত্র বা সূত্র সাহিত্য নামে অভিহিত করা হয়।

দর্শন

(গ-১) **বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত আর্যদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ব্যবস্থা :** (১) **সমাজ-ব্যবস্থা :** বৈদিক আর্যগণের সামাজিক জীবনযাপন প্রণালী ছিল সুসংবদ্ধ। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরুষগণ সাধারণতঃ একদার পরিগ্রহ করিত। স্ত্রীলোকেরাও একাধিক পতি গ্রহণ করিতে পারিত না। সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি মর্যাদাপূর্ণ। গার্হস্থ্য ব্যাপারে স্ত্রীলোকই ছিল সর্বময়ী কর্ত্রী। অনেক নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন। ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা প্রমুখ বিদুষী নারীরা বেদ-সংহিতার কোন কোন স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা ব্রহ্মবাদিনী নামে আখ্যাত হইতেন।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার-প্রথা

ঋগ্বেদীয় যুগের প্রথম দিকে কোন সুনির্দিষ্ট জাতিভেদ ছিল না। বৃত্তি অনুসারে জাতি নির্ধারিত হইত। বৃত্তি পরিবর্তন করিলে **জাতি** পরিবর্তিত হইত। একটি মন্ত্রে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের উল্লেখ আছে। এই জাতিভেদ প্রথাও বৃত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। ইহাদের প্রথম তিন জাতির মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। এই যুগে অসবর্ণ বিবাহের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

জাতিভেদ প্রথা

বৈদিক আর্যগণের সামাজিক জীবনের ভিত্তি ছিল **পরিবার**। পরিবারের সদস্যরা একজন 'গৃহপতির' অধীনে যৌথভাবে বসবাস করিত। এইরূপ কয়েকটি পরিবার লইয়া গঠিত হইত **গ্রাম**। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে বলা হইত 'গ্রামণী'। কয়েকটি গ্রাম লইয়া '**জন**' বা '**বিশ**' গঠিত হইত। তাহার অধিপতিকে বলা হইত 'রাজন' বা বিশপতি'।

পরিবার→গ্রাম→জন

সেই সময়কার আর্যরা সাধারণতঃ তুলা, পশম বা পশুচর্মের পোশাক পরিধান করিত। এই পোশাকের তিনটি নাম ছিল—নিবি, পরিধান এবং অধিবাস। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলংকার ব্যবহার করিত।

পোশাক

প্রাচীন বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান আহার্য ছিল গম ও যব। মাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল না। গো-মাংস ভক্ষণের প্রথাও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে এই প্রথা সমাজে নিন্দনীয় হইতে থাকে। সামাজিক উৎসবাদিতে সোমরস নামে একপ্রকার সুরাপান প্রচলিত ছিল।

খাদ্য

প্রাচীন আর্যগণ অশ্বচালনা, মৃগয়া প্রভৃতি ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করিতেন। প্রাচীন যুগে মৃগয়া আভিজাত্যেরই পরিচয় দিত। নৃত্যগীতেও তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন। নৃত্যগীত সামাজিক জীবনের একটি অঙ্গরূপেই পরিগণিত হইত। ইহা সংস্কৃতিরও পরিচায়ক।

ক্রীড়া

(২) **অর্থনৈতিক জীবন :** বৈদিক সভ্যতা ছিল মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক। গ্রাম ছিল এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের চারিদিকে ছিল কৃষির উপযোগী বিস্তীর্ণ জমি। কৃষিকার্যই ছিল গ্রামের লোকেদের প্রধান উপজীবিকা। জমিতে জলসেচ এবং সারপ্রয়োগ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। বলদের

কৃষি

সাহায্যে লাঙ্গল চালনা করা হইত। গৃহপালিত পশু হিসাবে ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রতিপালন করা হইত।

আর্যগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। এই যুগে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ বিনিময়ের সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। নির্দিষ্ট মুদ্রামান তখনও প্রচলিত হয় নাই। অবশ্য বৈদিক সাহিত্যে 'নিষ্ক' নামে স্বর্ণালংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্ত্র ও চর্মই ছিল প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। স্থলপথে প্রধান যানবাহন ছিল অশ্ব এবং গোযান। জলপথেও বাণিজ্য চলিত। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও যানবাহন

শিল্প হিসাবে বস্ত্রবয়নের খুব প্রচলন ছিল। তাহা ছাড়া সূত্রধর, স্বর্ণকার, চর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পী গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদ্যগণ ভেষজ অর্থাৎ বিভিন্ন লতা-গুল্ম সাহায্যে রোগের চিকিৎসা করিতেন বলিয়াও উল্লেখ আছে। বৈশ্য শ্রেণীর মধ্যে শিল্প নিগম বা শিল্প-কুল গঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি ক্রমশঃ বংশানুক্রমিক হইয়া উঠে।

শিল্প

(৩) **রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা:** গ্রামের কর্তা 'গ্রামণী' নামে অভিহিত হইতেন। 'বিশ' বা জনের কর্তাকে বলা হইত 'বিশপতি' বা 'রাজন'। সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক ভাবেই রাজারা রাজত্ব করিতেন। কোথাও কোথাও রাজা নির্বাচিত হইতেন বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজক্ষমতা একেবারে নিরংকুশ ছিল না। জনসাধারণের নির্বাচিত **সভা** ও **সমিতি** নামে দুইটি প্রতিনিধি সভার দ্বারা রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হইত। বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় এই দুই সভায় আলোচিত হইত।

সভা সমিতি

কোন কোন অঞ্চলে গণতন্ত্রের প্রচলনও ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। গণতন্ত্র-শাসিত এইসব রাষ্ট্রের অধিপতিকে **'গণজ্যেষ্ঠ'** বলা হইত।

বৈদিক আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি ছিল, প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। রথ ও অশ্ববাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ চলিত। সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার একজন দায়িত্বশীল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। তিনি 'সেনানী' নামে অভিহিত হইতেন।

(৪) **ধর্মনৈতিক জীবন:** বৈদিক আর্যগণ বহু দেব-দেবীর উপাসনা করিতেন। তাঁহারা প্রকৃতির বিভিন্ন বিভূতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। ঋগ্বেদে ধাতৃ, বিধাতৃ, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, দ্যৌঃ, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি পৃথিবীর স্রষ্টা, বৃষ্টি-বজ্রের দেবতা, বায়ুর দেবতা ইত্যাদি রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ঊষা বা প্রথম প্রভাতের সুন্দর গম্ভীর স্তব, অগ্নিদেব ও বরুণের মহিমা বর্ণনা ইত্যাদি এই সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দেব-দেবীর উপাসনা

বহু দেব-দেবীর উপাসক হইলেও আর্যগণ 'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়', দেব-দেবীগণ ঐশী শক্তিরই বিভিন্ন প্রতীক—এই সত্যে বিশ্বাস করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রধান বৈদিক সাহিত্যে সর্বশক্তিমান এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, একেশ্বরবাদ ঋগ্বেদ-প্রচারিত ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ঋগ্বেদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না।

একেশ্বরবাদ

যাগ-যজ্ঞ এই যুগের ধর্মানুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দেবতাদের তুষ্টিবিধান করিবার জন্য এইসব যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং যাগ-যজ্ঞাদির মন্ত্র ছিল দেবতাদেরই স্তুতি বা স্তব-মন্ত্র। এই সমস্ত স্তব বা স্তুতি মন্ত্র একই সময়ে বা একক প্রচেষ্টায় রচিত হয় নাই। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন লোকের চেষ্টায় নানা দেবতার উদ্দেশ্যে নানা মন্ত্র রচিত হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞে অন্ততঃ তিনজন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইত। (১) 'হোতা' ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে আবাহন করিতেন। (২) 'অধ্বর্যু' যজুঃ প্রণালীর সাহায্যে যজ্ঞের প্রণালী নির্ণয় করিয়া সামগান করিতেন (৩) 'ঋত্বিক' যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিতেন। যাঁহার কল্যাণে এই যজ্ঞানুষ্ঠান হইত তাঁহাকে বলা হইত 'যজমান'।

যাগ-যজ্ঞ

(গ-২) **পরবর্তী পরিবর্তন :** ঋগ্বেদের পরবর্তী যুগে বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মধ্যে বৃত্তি অনুযায়ী নানা নিম্নজাতির উদ্ভব হয়। এই যুগে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাগ-যজ্ঞের খুঁটিনাটি ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অব্রাহ্মণগণ যাগ-যজ্ঞ, পূজা পাঠ ও বেদ অধ্যয়ন হইতে বঞ্চিত হয়। ক্ষত্রিয়গণ দেশরক্ষার কার্যে তথা শাসনকার্যে ব্যাপৃত থাকে। বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং শূদ্ররা উপরি-উক্ত তিনবর্ণের সেবায় নিয়োজিত হয়। জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটে। নারীদের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়।

চতুরাশ্রম : সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাচীন আর্যদের প্রথম তিনটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রত্যেকের ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রমের মাধ্যমে জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইত। প্রথম পর্যায়ে ছাত্রকে গুরুগৃহে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতে হইত। অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিলে আরম্ভ হইত **গার্হস্থ্য আশ্রম**। এই সময়ে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হইত। আদর্শ গৃহীর ন্যায় সুষ্ঠু সংসারজীবন যাপন করাই এই সময়ে তাহার পবিত্র কর্তব্য ছিল। সাধারণতঃ পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত গার্হস্থ্য ধর্ম পালনীয় ছিল। ইহার পর আরম্ভ হইত তৃতীয় আশ্রম—**বানপ্রস্থ**। বানপ্রস্থ বলিতে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ ও বনে গমন করিয়া তপস্যা করা বুঝাইত। ঈশ্বরচিন্তার ইহা প্রথম সোপান ছিল। চতুর্থ ও শেষ আশ্রমের নাম ছিল **সন্ন্যাস** বা **যতি**। এই সময় হইতে জীবনের অবশিষ্ট কাল একমাত্র ঈশ্বর চিন্তা ও মুক্তি-চিন্তায় অতিবাহিত হইত।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস

প্রাচীন আর্যদের সমাজ-জীবনে এই চতুরাশ্রম প্রথা ছিল অবশ্য পালনীয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন আর্যরা শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ জীবন যাপন করিত।

পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বৈদিকোত্তর যুগকে বলা হয় **মহাকাব্যের যুগ**। রামায়ণ ও মহাভারত হইল ভারতের দুই মহাকাব্য। যথাক্রমে মহাকবি বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাস এই দুইটি মহাকাব্যের রচনা করেন। বৈদিকোত্তর যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এই দুইটি মহাকাব্য হইতে জানা যায়। এই যুগে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পরিবর্তে এই সময়ে বৃহত্তর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে বর্ণিত কুরু ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের জন্য যুদ্ধ এবং অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির নাম ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার কথা জানা যায়। সমাজে ব্রাহ্মণের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা আরও বাড়িয়া যায়।

বৈদিক যুগের বর্ণাশ্রম প্রথার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য : বৈদিক যুগে গুণ ও কর্ম অনুসারে সামাজিক শ্রেণীবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল—একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অনুমান করেন যে, গৌরবর্ণ আর্য এবং প্রতিপক্ষ কৃষ্ণবর্ণ অনার্যদের গাত্রবর্ণের পার্থক্য হইতেই আর্য সমাজে বিভিন্ন বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সমগোত্রীয় দেব-দেবীদের উপাসকেরা একই সংস্কারের আওতায় পরিপুষ্ট হইয়া এক একটি বর্ণ বা শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন মতের মধ্যে 'একই উপজীবিকা অনুসরণকারী জনসমষ্টি দলবদ্ধ হওয়ার ফলে বর্ণাশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে' —এই মতবাদটিই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়।

এই বর্ণাশ্রম প্রথার কোন্ সময়ে উৎপত্তি হয় সঠিক জানা যায় না। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে চতুর্বর্ণ বিভাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগেই বর্ণাশ্রম প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। তবে বর্তমান যুগে বর্ণাশ্রম বিভাগ যেভাবে প্রচলিত আছে, প্রাচীন বৈদিক যুগের বর্ণাশ্রম বিভাগ ঠিক সেইভাবে প্রচলিত ছিল না। বংশ ও জন্মের ভিত্তিতে তখন বর্ণ বা জাতি নির্ধারিত হইত না। অব্রাহ্মণও যোগ্যতা অর্জন করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার মন্তব্য করিয়াছেন, চারিবর্ণে প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে ভাগ করা ভ্রমাত্মক।[১]

(ঘ) **ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তার :** আর্যরা ভারতে আসিয়া প্রথমে কাবুল হইতে সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই উপত্যকা

(১) "The common notion that there were four original castes, Brahman, Kshatriya, Vaisya and Sudra, is false."—V. A. Smith : The Oxford History of India.

S.C.E.R.T., West Bengal
Date.....................
S.C.E.R.T., West Bengal Library

অঞ্চলটিকে বলা হইত 'সপ্তসিন্ধু'। ইহারই অপভ্রংশ উচ্চারণ ছিল 'হপ্তহিন্দু'। ইহা হইতেই 'হিন্দু' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। উত্তর-ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তার করিতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে আর্যরা পূর্ব ও মধ্য অঞ্চল অধিকার করিয়া কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, কোশল, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি পূর্ব-দেশীয় রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। অঙ্গ (পূর্ব বিহার), বঙ্গ, মগধ প্রভৃতিপ্রদেশে আর্যদের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল আরও অনেক পরে মনুসংহিতার একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এবং সৌরাষ্ট্রে আর্যগণ তীর্থযাত্রা ব্যতীত আগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের বসতি গঙ্গা, যমুনা এবং সম্ভবতঃ সরযূ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ক্রমে ক্রমে তাহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে আর্যরা অনেক পরে পূর্ব-ভারতে আসিয়াছে। সম্ভবতঃ মহাভারতীয় যুগে তথা বৈদিকোত্তর কালে—'পাণ্ডব বর্জিত' কথার অর্থ হইল আর্য বংশ-সম্ভূত পাণ্ডবরা যেখানে আসে নাই।

আর্যদের বসতি বিস্তার

আর্যদের এই বসতি বিস্তার সহজে ও নির্বিঘ্নে সম্ভব হয় নাই। ভারতের আদিম অনার্য অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রবল বাধা আসিয়াছিল। অবশেষে অনার্যরা পরাজিত হয় এবং পলায়ন করে। ঋগ্বেদে এই সকল আদিম অধিবাসীদের দাস, দস্যু, কৃষ্ণত্বক, যজ্ঞ-বিঘ্নকারী, ধর্মদ্বেষী, রূঢ়-স্বভাব, অনুন্নতনাসা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত ও নিন্দিত করা হইয়াছে। পরাজিত হইয়া ইহাদের অনেকে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে, অনেকে দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া যায়, আবার অনেকে বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য সমাজের মধ্যেই মিশিয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে আর্য-বসতি অনেক পরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেখানে প্রাচীন অধিবাসী অনার্যদের প্রাধান্যই অনেক দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। রামায়ণের যুগে আর্যপুত্র রামের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণের যুদ্ধ আর্য-অনার্য সংঘর্ষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অনার্য প্রতিরোধ

(ঙ) **লৌহ যুগের সূচনা :** মহাকাব্যের যুগে লৌহের ব্যবহার ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। লৌহের ব্যবহার ঐতিহাসিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র লৌহ-নির্মিত ছিল। লৌহের ব্যবহার সভ্যতা বিকাশের সহায়ক হইয়াছিল। পরবর্তীকালে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের চরম উৎকর্ষতার মূলে লৌহের ব্যবহারজনিত অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লৌহের ব্যবহারের ফলে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জনবসতি এবং কৃষির প্রসার ঘটান হয়। কৃষিতে লৌহের লাঙ্গল ব্যবহার করার ফলে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) আর্যভাষা গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকটি ভাষার নাম কর। (খ) আর্যদের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থের নাম কি? (গ) আর্যগণ কোন্ সময়ে ভারতে আসেন? (মাঃ ১৯৭৮) (ঘ) বেদ কয়টি? (ঙ) বেদের কয়টি অংশ? (চ) বেদের শেষভাগের নাম কি? (ছ) বৈদিক দর্শন কয়টি? (জ) ধর্মসূত্র বলিতে কি বুঝায়? (ঝ) উপনিষদ্ কয়টি ও কি কি? (ঞ) 'সভা' ও 'সমিতি' কি ছিল? (ট) 'চতুরাশ্রম' কি কি? (ঠ) মহাকাব্যের যুগ বলিতে কি বুঝ? (ড) প্রধান মহাকাব্য দুইটির নাম কর। (ঢ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) আর্যদের আদিনিবাস সম্পর্কে কি জান? প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যে দুইটি উল্লেখ কর।

(খ) বৈদিক যুগে নারীর কি স্থান ছিল?

(গ) বৈদিক সভ্যতার যুগে রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থা কিরকম ছিল?

(ঘ) জাতিভেদ প্রথা কখন এবং কিভাবে হিন্দু সমাজে প্রবর্তিত হয়?

(ঙ) বর্ণাশ্রয়ী সমাজ-ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

(চ) পূর্ব-ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে কি জান?

৩। বিশদ আলোচনা কর :

(ক) আর্যদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা কর। (মাঃ ১৯৮৬)

(খ) সিন্ধু-সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার মধ্যে কি কি মৌলিক পার্থক্য ছিল? (মাঃ ১৯৮৫)

(গ) আদি বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল আলোচনা কর।

(ঘ) বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(ঙ) আর্য সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলন
(Religious Protest Movements)

প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলনের ধর্মনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ : বৈদিক ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্য-শাসিত হিন্দু ধর্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে প্রতিবাদী ধর্মান্দোলন শুরু হয়। যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি জটিল আচার-অনুষ্ঠানে আদি বৈদিক ধর্মকে পুরোহিত তন্ত্রের কুক্ষিগত করিয়া ফেলে। জাতিভেদ প্রথার জন্য ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। নিম্নবর্ণের লোকেরা অপাঙ্ক্তেয় ও অবহেলিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ আসে ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে। পরে বৈশ্য সমাজেওপ্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ক্ষত্রিয় উপজাতি বংশোদ্ভব যুবরাজ গৌতম বুদ্ধ এবং বৈশ্য বংশোদ্ভব (মতান্তরে ক্ষত্রিয়) তীর্থংকর মহাবীর যথাক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তন করিয়া প্রতিবাদী ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্যানুসারী ধর্ম হইলেও ভক্তিবাদ, অহিংসা প্রভৃতি ইহার মূলমন্ত্র ছিল। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম আর একটি প্রতিবাদী ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, যেমন ঊনবিংশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে, রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে বর্তমানকালে ঘটিয়াছে। ইউরোপে ষোড়শ শতকে প্রতিবাদী (Protestant) আন্দোলন ঘটিয়াছিল ; কিন্তু ভারতে বারংবার প্রতিবাদী সংস্কার আন্দোলন ঘটিয়াছে। ইহা ধর্মান্দোলনের বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

বৈদিক যুগের শেষদিকে ক্রিয়াকাণ্ড এবং আনুষ্ঠানিক যাগ-যজ্ঞাদির এমন বাড়াবাড়ি দেখা দেয় যে ধর্মসাধনা, পূজা, ব্রত ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই হিন্দু ধর্ম সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। যাগ-যজ্ঞাদিতে পশুবলি ইত্যাদি হিংসাশ্রয়ী রীতিনীতি প্রবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ভগবানের প্রতি ভক্তের আন্তরিক ভক্তির পরিবর্তে ব্যয়বহুল পূজা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। ধর্মের মূলতত্ত্ব, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, অধ্যাত্ম-চর্চা প্রভৃতির স্থান গ্রহণ করে অন্ধ-বিশ্বাস, অজ্ঞানতা এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষী পুরোহিত শ্রেণীর শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা। শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন অর্থাৎ ব্রত উপবাস প্রভৃতি ধর্মের একটি অঙ্গ বা অনুশাসনরূপে প্রচারিত হইয়া লোকের মনকে এমনই অধিকার করিয়া বসে যে, এইসব আচার-অনুষ্ঠানই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া লোকে মনে করিতে থাকে।

হিন্দু ধর্মের যাগ-যজ্ঞ ও জটিলতা, পশুবলি ইত্যাদি

সামাজিক ক্ষেত্রে আদি বৈদিক পেশা তথা গুণগত জাতিভেদ প্রথা কুলগত হইয়া সমাজের স্কন্ধে রন্ধ্রগত শনির মত চাপিয়া বসে। যাগ-যজ্ঞ, পূজা, ব্রত ইত্যাদি একরূপ নিত্যকর্ম ছিল বলিয়া সমাজে ব্রাহ্মণদের এক অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে এমন এক আত্ম-

সামাজিক কারণ : (ক) জাতিভেদ প্রথা

সচেতনতা দেখা দেয় যে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা হইয়া উঠে তাঁহাদের চোখে নিতান্তই অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্র। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিরূপে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে দেখা দেয় এক বিক্ষোভ তরঙ্গ। শ্রেষ্ঠত্বের দাবি লইয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ইতিহাসের ইহা এক যুগসন্ধিক্ষণ বলা যায়। এই যুগসন্ধিক্ষণে ব্রাহ্মণেতর শ্রেণী হইতে প্রতিবাদী ধর্ম সংস্কারকরূপে আবির্ভাব ঘটে দুই মহামানবের। ইঁহাদের একজনের নাম মহাবীর ও অপরজনের নাম বুদ্ধদেব। মহাবীর জৈন ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে এবং বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম দুই-ই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদরূপে ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রতিবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব-ভারতের মিথিলা তথা উত্তর বিহার যেখানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বেশী ছিল। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে সেখানে ক্ষত্রিয়রা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহ ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্মের বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি অনিবার্য পর্যায় বলা যায়। ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় আধিপত্য, ক্ষমতার অপব্যবহার, ত্যাগ তিতিক্ষার পরিবর্তে বিলাসী জীবনযাপন অব্রাহ্মণদের মনে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গৌতম বুদ্ধই প্রথম সার্থক প্রতিবাদ করেন এবং ভারতবাসীর জীবনে ধ্যান ও ধারণার এক নূতন পথের সন্ধান দেন।

(খ) ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

বৌদ্ধ গ্রন্থাদি ও সমকালীন সাহিত্য হইতে জানা যায় যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব সেই যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। রাজন্য-বর্গ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ছিলেন। ব্রাহ্মণদের তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাহা ছাড়া, লৌহ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের ফলে ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ প্রণালী এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনুরূপভাবে বৈশ্য শ্রেণীও ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ-সম্পদে বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদিক যুগের কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সভ্যতার পরিবর্তে নগর সভ্যতায় অর্থবান বৈশ্যগণ সামাজিক সম্মান দাবি করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাদের কোন সম্মানজনক স্থান ছিল না। ফলে তাহারাও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইতে প্রস্তুত হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীর আত্ম-সচেতনতা বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

(গ) নগর সভ্যতার উদ্ভব

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাবীর ও বুদ্ধের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই পরিবর্তন আসিয়াছিল। কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে লোহের লাঙলের ব্যবহার এবং উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে কৃষক শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আর্যদের বসতি বিস্তারের সঙ্গে কৃষিজমির আয়তনও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বাড়ে এবং কৃষকের বাড়তি উৎপাদন নূতন

অর্থ নৈতিক কারণ

প্রতিষ্ঠিত নগরের প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য করে। নগরের বণিকদের মত কৃষক সম্প্রদায়ও আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মসচেতন হইয়া উঠে। তাহারা সমাজে উপযুক্ত মর্যাদার স্থান অধিকার করিতে প্রয়াসী হয়।

প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বিস্তারের অন্যতম কারণ হইল নূতন নূতন পথের সৃষ্টি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে পথের তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এই দুই অংশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হয়। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হয়। নূতন বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি নগরে পরিণত হয়। নগরে বণিক ও শিল্পীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাহারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে সঙ্ঘ (Guild) বা সংস্থা গড়িয়া তুলে। এই সকল সংস্থা শ্রেণীস্বার্থ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে তৎপর হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। মুদ্রার প্রচলন পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মীয় পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ প্রসঙ্গে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ মন্তব্য করেন যে উত্তর-বিহারে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হইবার কারণ হইল এই যে এই অঞ্চলের শাসকগণ আর্য ছিলেন না। তাঁহারা মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন এবং বৈদিক ধর্ম সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই কারণে উপজাতীয় শাক্য বংশীয় (ক্ষত্রিয় ? দলনেতার পুত্র সিদ্ধার্থ বিকল্প ধর্ম ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হন।

(খ —১) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম

জৈন ধর্মের উৎপত্তি

জৈন ধর্ম—পার্শ্বনাথ : জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মতানুসারে বহু প্রাচীনকাল হইতে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের ক্রম-আবির্ভাবের ফলে জৈন ধর্ম প্রসার লাভ করে। এই চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের প্রথম তীর্থঙ্করের নাম **ঋষভ** এবং শেষ দুই জনের নাম যথাক্রমে **পার্শ্বনাথ** ও মহাবীর। ইঁহাদের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পার্শ্বনাথ সম্বন্ধেও সামান্যই জানা যায়। পার্শ্বনাথ ছিলেন কাশীর জনৈক রাজার পুত্র। জন্মের পর ত্রিশ বৎসরকাল রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসের মধ্যেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। অতঃপর তাঁহার মধ্যে পরামর্শ-চিন্তার উদয় হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তিনমাস ব্যাপী একাগ্র সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞানের মর্মবাণী 'চতুর্যাম' নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্যাম বলিতে চারিটি জিনিস বুঝায়—সত্য, অহিংসা, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে পার্শ্বনাথের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

মহাবীর ঃ সর্বশেষ অর্থাৎ চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের জন্ম হয় পার্শ্বনাথের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে। বৈশালীর নিকটবর্তী কুণ্ডগ্রামের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ত্রিশলা। যৌবনে যশোদানাম্নী এক বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর হইতে তিনি 'জিন' অর্থাৎ বিজয়ী বা মহাবীর নামে খ্যাত হন। এই 'জিন' কথা হইতেই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম **জৈন ধর্ম** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ধর্মপ্রচার করেন। বাহাত্তর বৎসর বয়সে পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা নগরীতে তাঁহার জীবলীলার অবসান ঘটে।

বর্ধমান মহাবীরের জন্ম এবং মৃত্যুকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জৈন ঐতিহাসিক হেমচন্দ্রের মতে মহাবীরের পরিনির্বাণ এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন লাভের মধ্যে ১৫৫ বৎসর ব্যবধান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ কাল ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ ধরা হয়। সুতরাং মহাবীরের পরিনির্বাণ কাল ৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ (মতান্তরে ৪৬৮ —খ্রীঃ পূঃ)।

পার্শ্বনাথ-প্রচারিত চতুর্যাম বা চারি ব্রতের সহিত মহাবীর আর একটি পঞ্চম ব্রত যুক্ত করেন। এই পঞ্চম ব্রত হইল—ব্রহ্মচর্য। ধর্মীয় নির্দেশানুযায়ী পার্শ্বনাথের শিষ্যেরা শ্বেতাম্বর (শ্বেতবস্ত্র) পরিধান করিতেন। মহাবীর তাঁহার শিষ্যদের বস্ত্রের মায়া ত্যাগ করিয়া একেবারে দিগম্বর অর্থাৎ বস্ত্রহীন থাকিবার নির্দেশ দেন।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়

জৈন ধর্ম একরূপ নাস্তিক্যবাদী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর জৈন ধর্মমতে ইহা স্বীকৃত নয়। জৈনরা আত্মায় বিশ্বাসী। আত্মার পূর্ণ বিকাশ করিয়া কৈবল্য অবস্থা লাভই চরম প্রাপ্তি বলিয়া এই ধর্মে স্বীকৃত হইয়াছে। জৈন ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। কর্মবন্ধনই জন্মান্তরের কারণ। কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিই মোক্ষ। এই মোক্ষলাভের উপায় তিনটি – **সম্যক্ বিশ্বাস, সম্যক্ জ্ঞান ও সদাচার পালন**। এই তিন নীতির নাম ত্রিরত্ন। মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে জৈনরা আত্মনিগ্রহ ও কঠোর তপস্যায় বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতে শুধু পশুপক্ষী, জীবজন্তু নয়, সমগ্র জড় প্রকৃতিই চেতনাসম্পন্ন। সুতরাং তাঁহাদের ধর্মে অহিংসা নীতি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অবশ্য পালনীয়। জৈনদের ছয়খানি ধর্মগ্রন্থের নাম—অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণক, ছেদসূত্র, সূত্র ও মূলসূত্র। এইগুলি অর্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত।

জৈন ধর্মের সারমর্ম

ভারতের সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, রাজনীতি, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে জৈনদের অবদান কম নয়। রাজপুতানার বিখ্যাত আবু পর্বতের উপর অবস্থিত জৈনমন্দির ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। জৈন ধর্ম ভারতের বাহিরে বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতের

জৈনদের অবদান

গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই আজও জৈন ধর্মাবলম্বী। ভারতে এই ধর্ম আজও টিঁকিয়া থাকার একটি কারণ এই ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল এবং বড় রকমের কোন সংঘর্ষ ঘটে নাই। সংখ্যায় অল্প বলিয়া সব সময় জৈনরা নিজেদের শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে। ভারতের ধনী বণিক সম্প্রদায়ের অনেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত (যথা—মারোয়ারীগণ)।

জৈন ধর্মের প্রসার

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে জৈনরা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বরগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে এবং দিগম্বরগণ মহাবীরের অনুকরণে বস্ত্রহীন থাকে। দিগম্বরগণ নগ্ন থাকার পক্ষপাতী। শ্বেতাম্বরগণ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের তপশ্চরণের দ্বারা মোক্ষলাভের অধিকার আছে মনে করে। কিন্তু দিগম্বরগণের মতে কেবল পুরুষরাই মোক্ষলাভের অধিকারী।

জৈন ধর্মগ্রন্থ ঃ খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে পাটলিপুত্রে আহূত জৈন ধর্ম সম্মেলনে মহাবীরের উপদেশসমূহকে দ্বাদশটি অঙ্গ বা খণ্ডে সংকলিত করা হয়। ইহা দ্বাদশ অঙ্গ সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। পুনরায় গ্রন্থগুলির সংকলন করা হয় গুজরাটের, বল্লভীতে আহূত এক সভায়। এই সভায় জৈন ধর্ম নীতিকে অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র —এই চারিভাগে ভাগ করা হয়। জৈন গ্রন্থ অর্ধ-মাগধী বা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। ফলে সকলে সহজে ইহা পড়িতে পারিত। জৈন দার্শনিকদের মধ্যে ভদ্রবাহু সিদ্ধসেন, হেমচন্দ্র ও হরিভদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

(খ—২) বৌদ্ধ ধর্ম

বুদ্ধদেব ঃ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ। নেপালের তরাই অঞ্চলের অন্তর্গত কপিলাবস্তু নগরের এক ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্য নামক ক্ষত্রিয় জাতির দলপতি বা নায়ক। ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব হইলেও রাজপুত্র গৌতমের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য-বীর্যাদি অপেক্ষা দয়া-মায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিরই সবিশেষ বিকাশ দেখা গিয়াছিল। গৌতম ছিলেন জন্ম হইতেই মাতৃহীন। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মাতা মায়াদেবী দেহত্যাগ করেন। বিমাতা এবং মাতৃস্বসা গৌতমীর কোলে তিনি মানুষ হন। পিতা শুদ্ধোদন বাল্যকাল হইতেই পুত্রের মধ্যে একটি সংসার-বিরাগী ভাব লক্ষ্য করিয়া উদ্বেগ বোধ করেন। পুত্রকে সংসারে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি অচিরে গোপানাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সাময়িকভাবে সংসারে তিনি আকৃষ্ট হইয়াও পড়েন। কিন্তু ঐহিক ভোগবিলাস তাঁহার চিত্তকে বেশীদিন সংসারের মায়ায় আবদ্ধ রাখিতে পারিল না।

জন্ম ও বাল্যজীবন

জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু ঃ মনুষ্য জীবনের এই তিন অবশ্যম্ভাবী প[illegible]র কথা

চিন্তা করিয়া তিনি বেদনায় আকুল হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া মানবজাতিকে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করা যায় এই চিন্তা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। মনের এইরূপ চঞ্চল অবস্থায় সৌম্যমূর্তি এক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়া তিনি সংসার-বন্ধনমুক্ত এই সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। মানবজাতির মুক্তিপথের সন্ধানে রাজপুত্র গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। বুদ্ধের এই গৃহত্যাগ 'মহানিষ্ক্রমণ' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

মুক্তিপথের সন্ধানে গৃহত্যাগ

গৃহত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি বৈশালী ও রাজগৃহ নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে অনড় কলাম ও রুদ্রক নামে দুই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট পরম নিষ্ঠার সহিত তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। শাস্ত্র হইতে সত্যের সন্ধান না মিলায় তিনি আত্মপীড়ন বা কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হন। তাহাতেও বাঞ্ছিত বস্তু মিলিল না। তীর্থ-পরিক্রমায় সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে মনে করিয়া তিনি অতঃপর তীর্থ পর্যটনে মন দিলেন। কিন্তু তাহাতেও শান্তি ও মুক্তিপথের সন্ধান পাইলেন না। এইভাবে দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি গয়ার নিকট নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হন। নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া তীরবর্তী একটি বটবৃক্ষের তলায় তিনি আসনে উপবিষ্ট হন এবং জীবন-পণ সাধনায় নিমগ্ন হন। এইখানেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি জ্ঞানী বা বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। সিদ্ধি বা দিব্যজ্ঞান লাভের এই স্থানটি পরে 'বোধগয়া' বা 'বুদ্ধগয়া' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া তিনি সাধনা ও দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা 'বোধিদ্রুম' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

দিব্যজ্ঞান লাভ

কাশীর নিকট সারনাথে মৃগদাব উদ্যানে সর্বপ্রথম পঞ্চ শিষ্যের নিকট তিনি তাঁহার সাধনালব্ধ দিব্যজ্ঞান প্রচার করেন। এই ঘটনাকে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলা হয়। পবিত্র সারনাথে পরে একটি স্তূপ নির্মিত হয়। মৃগদাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাঁহার এই পাঁচজন শিষ্যের মধ্যে সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলানই প্রধান। ইহার পর ৪৫ বৎসর কাল মগধ কোশল প্রভৃতি রাজ্যে তিনি ধর্ম প্রচার করেন। ৪৮৬ খৃীঃ পূঃ বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধরা ইহাকে 'মহাপরিনির্বাণ' বলে। বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের মধ্যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং মগধের রাজা বিম্বিসারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভগবান বুদ্ধদেব জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই তাঁহার সত্য ও অহিংসার ধর্মে দীক্ষা দান করেন।

ধর্ম প্রচার

বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ 'উপাসক' ও 'ভিক্ষু'—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও যাহারা সংসারধর্ম পালন করিত তাহাদের বলা হইত উপাসক, আর সংসারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিত তাহাদের বলা হইত ভিক্ষু। সমসাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, যথা—নৃপতি বিম্বিসার। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়।

উপাসক ও ভিক্ষু

বৌদ্ধ সংঘ গঠন তাঁহার প্রচারিত ধর্মের আর এক অঙ্গ। বৌদ্ধ সংঘ (Buddhist Council) একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ধর্মমতের সাংগঠনিক রূপ দানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। ইহা গণতান্ত্রিক সংগঠন ছিল। প্রথম দিকে স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। পরে 'ভিক্ষুণী' রূপে তাঁহারা সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি পান। সাধারণ লোক যাহাতে এই ধর্মমত ভালভাবে বুঝিতে এবং উপলব্ধি করিতে পারে সেইজন্য বুদ্ধদেবের ধর্মমত সাধারণের চলিত ভাষা 'পালিতে' প্রচার করা হইত। বুদ্ধদেব নিজে কোন উপদেশগ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণীগুলিকে একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থটি তিনভাগে বিভক্ত—সূত্রপিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক। তিনটি পিটক অর্থাৎ পেটি বা খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া উহা 'ত্রিপিটক' নামে অভিহিত হয়। সূত্রপিটক আবার 'নিকায়' নামে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। কিন্তু ত্রিপিটক ছাড়াও বৌদ্ধদের আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে।

বৌদ্ধ সজ্ঘ গঠন

ত্রিপিটক

বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বৌদ্ধগণ মহাযান ও হীনযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। বৌদ্ধ দর্শনে বিশ্বাসীরা হীনযান এবং বুদ্ধের মূর্তি পূজায় বিশ্বাসীরা মহাযান নামে পরিচিত। বিভিন্ন মার্গ অনুসরণকারী দার্শনিক পণ্ডিতগণ নানারকম টীকা ও ভাষ্য, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি রচনা করেন। এইভাবে বৌদ্ধ ধর্মের উপর এক বিরাট তত্ত্বদর্শন ও সাহিত্যচক্র গড়িয়া উঠে।

মহাযান ও হীনযান

(গ) বুদ্ধদেবের ধর্মমত ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। তথাকথিত জাতিভেদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন উদাসীন। ধর্মীয় অঙ্গ হিসাবে দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনের তিনি কোন সার্থকতা দেখিতে পান নাই। মানুষ নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করে ও জন্ম-জন্মান্তরের জীবন-আবর্তে পতিত হয়। সর্বপ্রকার কামনা বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই মানুষ নির্বাণ লাভ করে। এই নির্বাণই মহামুক্তি। বৌদ্ধ ধর্মে ইহাই পরম ও চরম প্রাপ্তি। নির্বাণ লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই নির্বাণ লাভের উপায় হিসাবে তিনি আটটি পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। যথা—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সৎকর্ম, (৩) সৎবাক্য, (৪) সৎসঙ্কল্প, (৫) সৎচেষ্টা, (৬) সৎজীবন, (৭) সৎ স্মৃতি ও (৮) সম্যক্ সমাধি। এই আটটি পন্থা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত হয়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই নির্বাণ বা মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হয়। অহিংসাই হইল বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। পর্যাপ্ত ভোগ-বিলাস বা অসীম কৃচ্ছ্রসাধন—জীবনাদর্শ হিসাবে দুই-এর কোনটিই তিনি গ্রহণীয় মনে করেন নাই। তাই তিনি মাঝপথ বা মধ্যপথ বা 'মঝ্ঝিম পন্থা' অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার আর একটি নির্দেশ পঞ্চশীল। পঞ্চশীল বলিতে পঞ্চনীতি বুঝায়। যথা—মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না, জীবহিংসা করিবে না, অন্যায় আচরণ করিবে না ইত্যাদি।

ধর্মমত

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও জাতিভেদ প্রথায় তিনি আস্থাহীন ছিলেন। এইদিক হইতে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম পরস্পর-বিরোধী হইলেও বৌদ্ধ ধর্ম মূলতঃ হিন্দু ধর্ম হইতেই উদ্ভূত একটি শাখা, অথচ স্ব-মহিমায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব হিন্দুদের কাছেও ভগবানের দশাবতারের এক অবতার হিসাবে পূজিত হন।

বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করিতেন না। সমাজের অবহেলিত শ্রেণীও তাঁহার আশীর্বাদ পাইত এবং সমমর্যাদায় সঙ্ঘে স্থান পাইত।

বুদ্ধদেবের (বোধিসত্ত্বের) পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত 'জাতক' নামে কথিত হয়। এইসব বৌদ্ধজাতক হইতে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্মমতের বিশেষ সামাজিক মূল্য আছে। সকল মানুষের সমানাধিকারের বাণী জাতি-বর্ণ-জন্মগত বিশেষ অধিকার বিলোপ সাধন এবং দেব বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছিল। বৈশ্য, বণিক, শূদ্র, কৃষক এবং ক্ষত্রিয় রাজন্য সকলে তাঁহার ধম মতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বুদ্ধ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহার ধর্মমত ব্যাপক প্রসারলাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব

বিশ্ববাসী বুদ্ধ-প্রচারিত অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রী বাণী হইতে প্রেরণা লাভ করিতেছে। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি আজ পঞ্চশীল নীতিতে বিশ্বাসী। এইদিক হইতে এই ধর্মের অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। (১) বৌদ্ধ ধর্ম ধর্ম-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত নূতন কোন ধর্ম নয়, লোকাচার-জীর্ণ বৈদিক ধর্মের এক বিরাট ধ্বংস স্তূপের উপর সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির বাণী লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা। হিন্দু ধর্মেরই ইহা এক নব্য সংস্কার। (২) বৌদ্ধ ধর্ম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহির্ভারতে ব্রহ্মদেশ, চীন, শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশে এবং ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়াছে। (৩) বিখ্যাত পণ্ডিত রিস ডেভিস তাঁহার 'বৌদ্ধভারত' গ্রন্থে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়কে 'বৌদ্ধ যুগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বৌদ্ধ যুগ নামে কোন বিশেষ একটা যুগকে চিহ্নিত করিবার পিছনে যুক্তি খুঁজিয়া পান নাই। (৪) বৌদ্ধোত্তর যুগে বৌদ্ধশিল্পের উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম উহার সকল সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য আর্য সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক : জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই আছে। হিন্দুদের মতই জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদে জৈন ও বৌদ্ধ

সম্প্রদায় উভয়েই বিশ্বাসী। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও বেদের অভ্রান্ততায় জৈন ও বৌদ্ধরা আস্থাহীন। জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দুদের মত জাতিভেদ প্রথ ও সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। জৈনরা বৌদ্ধদের মতই নিষ্ঠা ও সদাচারে বিশ্বাসী কিন্তু অহিংসা-ধর্মের সম্বন্ধে জৈনরা আরও চরমপন্থী। বৌদ্ধরা মধ্য পন্থায় বিশ্বাসী। বাহ্যিক কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও জৈন দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনের অনেক তফাত আছে। হিন্দুদের উপনিষদে অহিংসার উল্লেখ আছে। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মত অহিংসাই হিন্দু ধর্মের মূলমন্ত্র নয়।

বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ ঃ বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতভূমিতে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম অবলুপ্ত-প্রায়। ইহার পিছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। (১) রাজন্যবর্গ ও পৃষ্ঠপোষকদের সক্রিয় সহযোগিতার অভাব। (২) বৌদ্ধরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া বৌদ্ধরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে। (৩) মুসলমান আক্রমণের ফলে বৌদ্ধ বিহার বা মঠগুলির বিনাশই বৌদ্ধ ভারতের বাহিরেই এই ধর্মের যাহা কিছু প্রসার ঘটিয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরও এই ধর্মের প্রত্যক্ষ কোন ফলাফল পরিলক্ষিত হয় না। শাক্যবংশ রাজতন্ত্রীয় ছিল না এবং বৌদ্ধসঙ্ঘগুলিতেও সাধারণ-তন্ত্রী গণমতেরই প্রাধান্য ছিল। অথচ এই ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মগধে সাম্রাজ্যবাদ বা রাজতন্ত্র কেমন করিয়া শিকড় গাড়িয়া বসিল এইটিও ভাবিবার বিষয়। এইসব দিক হইতে বিবেচনা ধর্মের অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নাই। (৪) যদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মা-বলম্বীদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন তবুও পরবর্তী শুঙ্গ ও গুপ্তবংশীয় রাজারা এই ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কোন বাধা দেন নাই। তবে ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধবিদ্বেষ এবং পরবর্তীকালে বিখ্যাত হিন্দু-সংস্কারক শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সন্তানদের সংগঠনমূলক চেষ্টায়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার বন্ধ হইয়া যায়। (৫) হিন্দু ধর্মের গ্রহিষ্ণু শক্তি ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে হিন্দুদের মত মূর্তি পূজা প্রথা হিন্দু তন্ত্রসাধনার (যথা ব্রজযোনী) সহিত মিশিয়া যায়। তবে নৈতিক আদর্শের অবনতিই বৌদ্ধ ধর্মের পতনের মূল কারণ। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম আজ সংখ্যালঘু তবুও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভারতের নিজস্ব গৌরব।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম অবলুপ্তির কারণ

অনুশীলনী

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) জৈন ধর্মের প্রবর্তক কে ? (মাঃ ১৯৭৮) (খ) চতুর্যাম কাহাকে বলে ? (গ) ঋষভ ও পার্শ্বনাথ কে ছিলেন? (ঘ) জৈন নামের অর্থ কি ? (ঙ) ত্রিরত্ন কি কি ? (চ) শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর কাদের বলা হয় ? (ছ) জৈন ধর্ম গ্রন্থের নাম কি ? (জ) দুই জন জৈন দার্শনিকের নাম কর। (ঝ) বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কোথায় ? তিনি কোন্ বংশোদ্ভূত ? (ঞ) 'অষ্টমার্গ' কি কি ? (ট) পঞ্চশীল কাহাকে বলে ? (ঠ) 'মহাপরিনির্বাণ' কি ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের কারণ কি কি ?

(খ) বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান নীতিগুলি আলোচনা কর।

(গ) 'ত্রিপিটক' বলিতে কি বুঝায় ? 'মঝঝিম' পন্থা কি ?

(ঘ) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে মিল ও অমিল কি কি ?

(ঙ) বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে প্রতিবাদী ধর্ম বলার কারণ কি ?

(চ) ভারতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক যথাক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুগামী ?

(ছ) বৌদ্ধ ধর্ম, সংঘ, বিহার, ভিক্ষু প্রভৃতি ব্যবস্থার ব্যাখ্যা কর। এইগুলির কি প্রয়োজনীয়তা ছিল ?

৩। বিবরণমূলক উত্তর দাও ঃ

(ক) বর্ধমান মহাবীরের জীবনী আলোচনা কর। তাঁহার ধর্মমতের মূলকথা কি ?

(খ) জৈন ধর্মের মূলনীতিগুলি আলোচনা কর।

(গ) বৌদ্ধ ধর্মের উত্থানের মূলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি পটভূমি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল ? বৌদ্ধ ধর্ম এই উদ্দেশ্য কতটা সফল করিয়াছিল ? এই সাফল্যের কারণ কি ?

(ঘ) গৌতম বুদ্ধের জীবনী এবং বাণী আলোচনা কর। বৌদ্ধ ধর্ম কি কোন নূতন ধর্ম না হিন্দু ধর্মের সংস্কারমূলক রূপ ?

(ঙ) বৌদ্ধ ধর্মের নীতি, সংগঠন ও ধর্মসাহিত্য আলোচনা কর।

(চ) ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণ কি কি ? বর্তমান বিশ্বে বুদ্ধের বাণীর সার্থকতা কি ?

পঞ্চম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক ঐক্যকরণের যুগ

খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার স্থলে পরবর্তী শতকগুলিতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এই যুগের ইতিহাস নিম্নোক্ত ভাগে আলোচনা করা হয়ঃ

(ক) ষোড়শ মহাজনপদ, (খ) মগধ সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার, (গ) মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস. (ঘ) বৈদেশিক আক্রমণ যথা—১) গ্রীক আক্রমণ, (২) শক ও পহ্লব। ঙ) মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বিবরণ হইতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। (চ) কুষাণ. (ছ) সাতবাহন এবং (জ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ঐক্যকরণ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ মৌর্য যুগের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য ঃ—

খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়কার রচিত জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি হইতে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। 'অঙ্গুতরণিকায়' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তর-ভারতে ষোলটি মহাজনপদ বা বৃহৎ রাজ্য এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিতে ছিল বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র, কতকগুলিতে ছিল গণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন। ষোলটি রাজ্যে বিভক্ত হওয়ার ফলে উত্তর-ভারতে কোন ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাদের মধ্যে মগধ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ই উত্তর-ভারতে প্রথম জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পথ সুগম করে।

ষোড়শ মহাজনপদ

ষোড়শ মহাজনপদগুলির নাম যথাক্রমে (১) কাশী, (২) কোশল, (৩) অঙ্গ, (৪) মগধ, (৫) বৃজি, (৬) মল্ল, (৭) চেদি, (৮) বৎস, (৯) কুরু, (১০) পাঞ্চাল, (১১) মৎস্য, (১২) শৌরসেনা বা শূরসেন, (১৩) অশ্মক. (১৪) অবন্তী, (১৫) গান্ধার এবং (১৬) কম্বোজ। সবকয়টি রাষ্ট্রই রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল না। বৃজি এবং মল্ল রাষ্ট্র দুইটি ছিল গণতান্ত্রিক। জ্ঞাতৃক এবং লিচ্ছবী এই দুই জাতির সমন্বয়ে বৃজি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ইহার রাজধানী ছিল প্রসিদ্ধ বৈশালী নগরে। মল্ল রাষ্ট্রটিতে গোড়ার দিকে রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা থাকিলেও পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কুশীনারা এবং পাবা ছিল এই রাষ্ট্রের দুইটি প্রধান নগর।

রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। শক্তিশালী রাজারা দুর্বল রাজাদের পরাস্ত করিয়া রাজ্যজয়ের দ্বারা নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াইতেন। এইভাবে

ষোলটি রাজ্যের মধ্যে চারিটি শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ইহাদের নাম (১) অবন্তী, (২) বৎস, (৩) কোশল এবং (৪) মগধ। উত্তর-ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ইহাদের মধ্যে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘদিন ধরিয়া বর্তমান ছিল।
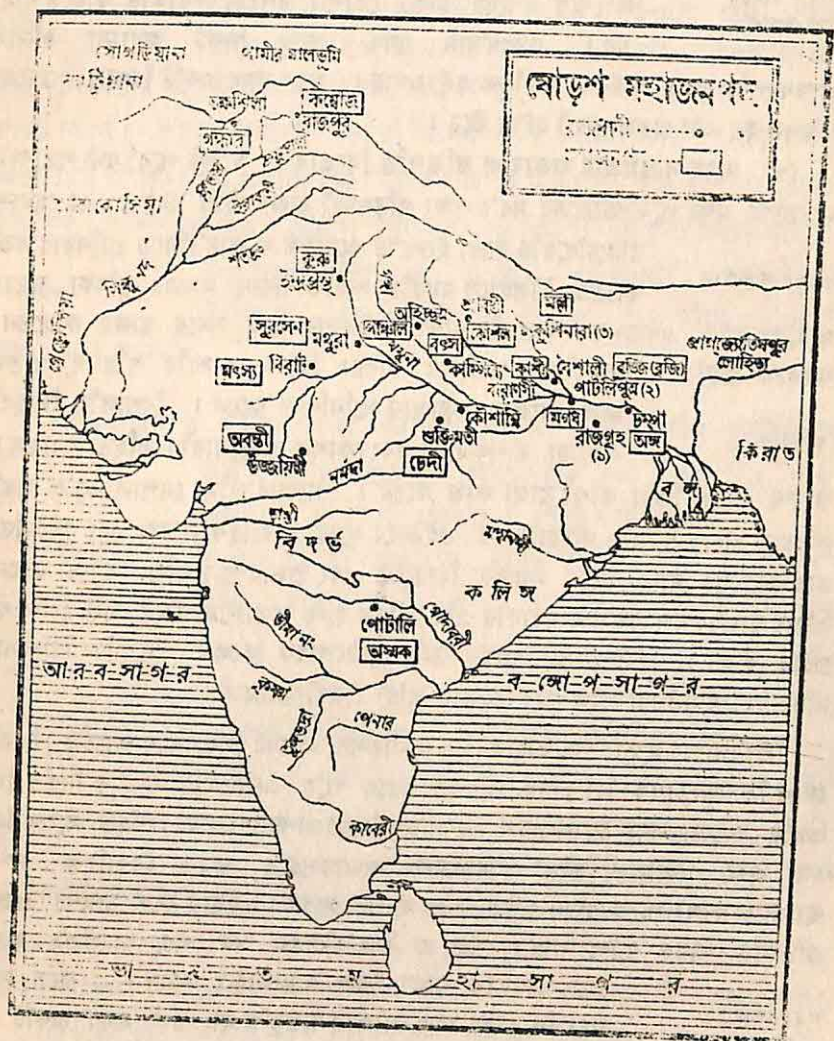
খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই চারিটি রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন যথাক্রমে প্রসেনজিৎ, প্রদ্যোৎ, উদয়ন এবং বিম্বিসার। অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ বৎসরাজ উদয়নকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। অবন্তী রাজকুমারী বাসবদত্তার সহিত উদয়নের বিবাহ হয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভ্যাস 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নামে বিখ্যাত নাটক রচনা করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধরাজ

চারিটি রাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

বিম্বিসারের সহিত প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই দুই রাষ্ট্র বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। কিন্তু বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকালে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আবার সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। অবশেষে মগধের নিকট কোশল বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ক্রমবর্ধমান মগধ রাজ্যের নিকট অন্যান্য রাজ্যও আত্মসমর্পণ করে ও উহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ফলে মগধ একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং প্রতাপশালী হইয়া উঠে।

চারিটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক

(খ) **মগধ সাম্রাজ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার :** খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধ পূর্ব-ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য হইয়া উঠে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, ইংলণ্ডে ওয়েসেক্স ও জার্মানিতে প্রাশিয়ার মতই ভারতের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় সংহতি-সাধনে মগধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে হর্যঙ্কবংশীয় রাজা বিম্বিসার সেই সময়ে রাজত্ব করিতেন। অঙ্গরাজ প্রভৃতি প্রতিবেশীদের পরাজিত করিয়া বিম্বিসার স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি তথা মগধ রাজ্যের অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত করেন। বৈশালীর লিচ্ছবী-বংশীয়া রাজকুমারী এবং কোশল রাজকুমারীর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি কাশী রাজ্য লাভ করেন। রাজ্যের সীমা নেপাল পর্যন্ত বর্ধিত করিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইভাবে যুদ্ধ, বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং কূটনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা তিনি মগধের বিস্তৃতি এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ যথাক্রমে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। বিম্বিসার বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—"নৃপতি বিম্বিসার, নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পাদ-নখ-কণা তাঁর" (রবীন্দ্রনাথ)।

মগধের অভ্যুত্থান

বিম্বিসার

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জনশ্রুতি অনুসারে বিম্বিসার পরিণত বয়সে পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন। ভগ্নীর বৈধব্যের জন্য কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পিতৃহন্তা ভাগিনেয়ের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং পরাজিত হইয়া মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন ও কাশী পুনঃ প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। ইহার ফলে মগধের প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। মল্ল ও লিচ্ছবীদেরও অজাতশত্রু পরাজিত করেন এবং তাঁহাদের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ফলে সমগ্র গঙ্গা-উপত্যকা মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মগধ একটি বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পাটলিগ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে এই পাটলীগ্রাম মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে পরিণত হয়। ইতঃপূর্বে মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ বা রাজগীর। ইহার প্রাচীন নাম ছিল গিরিব্রজ।

অজাতশত্রু : যুদ্ধবিজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার

ভিন্‌সেণ্ট এ. স্মিথ প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিতের মতে অজাতশত্রু ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত।

উদয়ী

অজাতশত্রুর পর মগধের রাজা হন উদয়ী। তিনি সুরক্ষিত পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদয়ীর পরে মগধের সিংহাসনে কে কে আরোহণ করেন সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বৌদ্ধ লেখকদের মতে উদয়ীর মৃত্যুর পর যথাক্রমে অনুরুদ্ধ মুণ্ড এবং নাগদাসক মগধে রাজত্ব করেন। ইঁহারা সকলেই পিতৃহন্তা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। নাগদাসকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রজারা রাজ্য হইতে তাঁহাকে নির্বাসিত করে এবং শিশুনাগকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে—এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। ঐতিহাসিকদের মতে এই শিশুনাগই শৈশুনাগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম গিরিব্রজে পরে পাটলিপুত্র হইতে বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

শিশুনাগ

কালাশোক

শিশুনাগের পরে মগধের রাজা হন কালাশোক। নন্দবংশোদ্ভব মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক পরবর্তী রাজারা সিংহাসনচ্যুত এবং নিহত হন বলিয়া সমকালীন গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায়।

মহাপদ্মনন্দ

নন্দবংশ ঃ সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতে মহাপদ্মনন্দ নামে এক শূদ্রবীর স্বীয় বাহুবলে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং নিজ নামানুসারে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে মহাপরাক্রমশালী সম্রাট ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুরাণে তাঁহাকে 'একরাট' একচ্ছত্র সম্রাট্ ও 'সর্বক্ষত্রান্তক' অর্থাৎ সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহাপদ্মনন্দের রাজ্যসীমা

মহাপদ্মনন্দের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপি হইতে অনুমিত হয় যে,কলিঙ্গ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। পশ্চিমে কোশল এবং দক্ষিণেও কোন কোন অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। মহাপদ্মনন্দ ভারতবর্ষের এক সুবিশাল অংশকে এক রাজচ্ছত্রতলে আনয়ন করিয়া ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁহাকে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

ধনানন্দ

মহাপদ্মনন্দের পর একে একে আটজন রাজা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি হইলেন ধনানন্দ। গ্রীক লেখকরা তাঁহাকে 'আগ্রামেস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি এবং সামরিক শক্তির তাঁহারা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। মগধের সৈন্যবাহিনীতে

প্রাসিই (Prasii) এবং গঙ্গারাটী বা গেঙ্গারিডি (Gangridai) নামে এমন দুর্ধর্ষ সৈন্য ছিল যে আলেকজাণ্ডার তাহাদের সম্মুখীন হইতে সাহসী হন নাই। কিন্তু ধনানন্দ সৎ-চরিত্রের লোক ছিলেন না। সেইজন্য প্রজাদের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সুযোগে চতুর ব্রাহ্মণ রাজনীতিজ্ঞ চাণক্যের (কৌটিল্যের) সহায়তায় মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ধনানন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের সিংহাসন দখল করেন।

(গ) মৌর্য সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও মহামতি অশোকের রাজত্বকাল

সমকালীন ঐতিহাসিক উপাদান

গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকগণের রচনা, কৌটিলের অর্থশাস্ত্র, মেগাস্থিনিসের বিবরণ, অশোকের শিলালিপি সমকালীন বৌদ্ধগ্রন্থ ও সংস্কৃত সাহিত্য মৌর্য যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রীঃ পূঃ ৩২২-২৯৮): মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছেন। হিন্দু কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন নন্দবংশীয় জনৈক রাজার মুরা নামে এক দাসীর পুত্র। আবার বৌদ্ধ মতানুসারে চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মোরিয় বা মৌর্যকুলোদ্ভব একজন ক্ষত্রিয় বীর। নেপালের তরাই অঞ্চলের অন্তর্গত পিপ্পলীবনে ছিল মোরিয় বা মৌর্যদের বাস। মৌর্যগণ খুব সম্ভব মগধ সাম্রাজ্যে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন এই মৌর্যকুলের অধিনায়ক। অনেকে মনে করেন অধিনায়ক বলিয়া তিনি সিংহাসন লাভ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত এবং নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায় তিনি ব্যাধ, পশুপালক ও পক্ষী-শিকারীদের মধ্যে লালিত-পালিত হন। নন্দবংশের শেষ রাজা ধনানন্দ অত্যন্ত অত্যাচারী হইলে তরুণ চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে মৌর্যরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গ্রীক লেখক প্লুটার্কের মতে চন্দ্রগুপ্ত আন্দ্রোকোটাস (Androcotus Chandra Gupta !) তরুণ বয়সে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সহিত পাঞ্জাবে দেখা করেন এবং তাঁহাকে মগধ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রলুব্ধ করেন। সাক্ষাৎকালে গ্রীকসম্রাট তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কোন প্রকারে প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন।

বাল্যজীবন

চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে ও পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের বিনাশসাধন করেন এবং মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মীয়েরা অত্যাচারী নন্দরাজের হাতে নিহত হন। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের মিলিত শক্তিতেই যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, এই মত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের পুরাণ, সাহিত্য এবং জনশ্রুতি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

চাণক্যের সহযোগিতা

আলেকজাণ্ডার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে বিজিত সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দিয়া যান। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি সেলুকাস ভারতীয় ম্যাসিডন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধি করেন। সন্ধির সর্তানুসারে ভারতীয় গ্রীক রাজ্যগুলির শাসনভার চন্দ্রগুপ্তের উপর অর্পিত হয়। কাবুল, কান্দাহার এবং হিরাট ও বেলুচিস্তানের কিছু অংশও চন্দ্রগুপ্তকে তিনি ছাড়িয়া দেন। গ্রীক এবং ল্যাটিন ঐতিহাসিকগণ সেলুকাসের কন্যার সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহের যৌতুক বিনিময় স্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পাঁচশত হস্তী উপঢৌকন পাঠান। সেলুকাস গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় **মেগাস্থিনিস** নামে এক গ্রীক দূত প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস তাঁহার 'ইণ্ডিকা' (Indica) নামক গ্রন্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

সেলুকাস

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা : শকরাজ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপি হইতে জানা যায় যে পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র হইতে মগধের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমের কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি রাজ্যও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণের মহীশূর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া জ্যাস্টিন প্লুটার্ক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ২৪ বৎসর রাজত্ব করার পর চন্দ্রগুপ্ত শ্রবণবেলগোলা নামক জায়গায় শেষজীবন অতিবাহিত করেন বলিয়া জৈনগ্রন্থে উল্লেখ আছে।

শেষ জীবন

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন পদ্ধতি : প্রধানতঃ মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারি। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী মৌর্য সাম্রাজ্যের ঊর্ধ্বতম সরকারী কর্মচারীদের প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ছিল—অগোরোনোমি (Agoronomi) ও অস্তিনোমি (Astynomi)। প্রথমোক্তগণ পল্লী অঞ্চলের প্রশাসন ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারিগণ রাজধানী প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। রাজধানীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন প্রতি সমিতিতে পাঁচজন করিয়া সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের উপর শিল্পোৎপাদন, বৈদেশিকদের তত্ত্বাবধান করা, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষণ বিক্রীত দ্রব্যের উপর শুল্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দপ্তরের ভার ছিল।

অপরাধীর দণ্ডবিধানে অঙ্গচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া মেগাস্থিনিসের বিবরণে উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও অনুরূপ দণ্ডদানের কথা উল্লেখ আছে।

সামরিক শাসন : মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী এক শ্রেণীর কর্মচারীর উপর সামরিক বাহিনীর পরিচালনার ভার ছিল। অর্থশাস্ত্রে ইঁহাদের বলাধ্যক্ষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই কর্মচারিগণ ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক

সমিতিতে পাঁচজন করিয়া সভ্য ছিলেন। এক একটি সমিতির উপর এক একটি বিভাগের ভার ছিল। এই বিভাগগুলির নাম ছিল—নৌ-বিভাগ, পদাতিক সৈন্য বিভাগ, অশ্বারোহী সৈন্য বিভাগ, যুদ্ধরথ, রণহস্তী এবং সরবরাহ বিভাগ। প্লুটার্কের মতে, চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনীতে ছয়লক্ষ সৈন্য ছিল।

ইণ্ডিকা বা মেগাস্থিনিসের বিবরণী : গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বেশ কিছুকাল ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বিবরণীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ও মৌর্য আমলে সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়া ধরা যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের বিবরণের সহিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনেক ক্ষেত্রেই মিল লক্ষ্য করা যায়।

রাজধানীর বর্ণনা : মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী পাটলিপুত্র নগরী গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। এই নগরীটি দৈর্ঘ্যে নয় মাইল এবং প্রস্থে দুই মাইল বিস্তৃত ছিল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইহার চারিদিকে গভীর পরিখা ও সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ ছিল কাষ্ঠ-নির্মিত। মৌর্য রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয়। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের মতে পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদও মৌর্য রাজপ্রাসাদের মত সুদৃশ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না।

রাজসভার বর্ণনা : মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা খুব জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। সম্রাট দিবসের অধিকাংশ সময়ে রাজকার্যে ব্যস্ত থাকিতেন। অবসরকালে তিনি মৃগয়া, মল্লযুদ্ধ বা রথ চালনায় অংশগ্রহণ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। সম্রাট ছিলেন একাধারে প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি ও প্রধান পুরোহিত। প্রজারা যে কোন সময়ে রাজার কাছে তাহাদের অভিযোগ পেশ করিতে পারিত।

ভারতবাসীদের সামাজিক বিভাগ : মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদের সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন—(১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) পশুপালক, (৪) শিল্পী ও কারিগর, (৫) যোদ্ধা, (৬) পরিদর্শক, (৭) অমাত্য। অমাত্যগণ জনহিতকর বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

মেগাস্থিনিসের এই বিবরণ ভারতীয় বর্ণাশ্রম বিরোধী। সম্ভবতঃ তিনি বৃত্তি অনুসারে এই সামাজিক ভাগ করিয়াছিলেন। মৌর্য যুগে জাতিভেদ প্রথা খুব কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে নিজ জাতির বাহিরে কাহারও বিবাহ করিবার অধিকার ছিল না। স্বীয় জাতিগত বৃত্তি ছাড়া অপর বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতা কাহার ও ছিল না।

জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা

ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র : মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের চরিত্রের নানা গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে তৎকালীন ভারতবাসীরা ছিল সাহসী, সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মপ্রবণ জাতি। চৌর্য, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, কলহ প্রভৃতি সে যুগে ছিল না বলিলেই হয়। যজ্ঞের সময় ছাড়া অন্য সময়ে কেহ মদ্যপান করিত না।

চারিত্রিক গুণাবলী

অর্থনৈতিক জীবন ঃ মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন—ভারতীয়দের আর্থিক অবস্থা ছিল উন্নত। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

পৌর শাসন-ব্যবস্থা ঃ বর্তমানকালের মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায় ত্রিশজন সভ্য লইয়া গঠিত একটি পৌরসভার উপরে রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসন-ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল। এই পৌরসভা পাঁচ জন সদস্য লইয়া গঠিত ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ কে এবং কখন এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সে-সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। নন্দবংশ উচ্ছেদকারী কূটনৈতিক ব্রাহ্মণ, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্যকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়। যাহা হউক, অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল এবং রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও মৌর্য যুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির পুস্তক হিসাবে ইহার মূল্য অপরিসীম। অর্থশাস্ত্রের মতে রাজ্যের শাসনভার রাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় শাসনের সর্বময় কর্তা। সেই সময় বাহ্যত স্বৈরাচার তন্ত্র বজায় থাকিলেও রাজা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। 'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞ' অর্থাৎ প্রজার সুখেই রাজার সুখ ছিল মূলমন্ত্র। মন্ত্রি-পরিষদ রাজাকে রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। মন্ত্রিগণের অধীনে প্রত্যেক বিভাগের উপর একজন করিয়া অধ্যক্ষ থাকিতেন। যেমন, নগরাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, স্বর্ণাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ ইত্যাদি। সমগ্র সাম্রাজ্য চারিটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসালি এবং সুবর্ণগিরি। প্রত্যেক প্রদেশে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে একজন রাজবংশের কুমার থাকিতেন। তাঁহাকে বলা হইত 'কুমারামত্য'। প্রত্যেক প্রদেশ আবার এক একজন স্থানিকের অধীনে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত ছিল। গ্রামণী শাসিত গ্রামগুলি ছিল তখনকার ক্ষুদ্রতম বিভাগ। গ্রামের লোকেরা এই বিভাগের কাজকর্ম দেখাশোনা করিত। 'গোপ' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী তাহাদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিতেন।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থা

বিন্দুসার (২৯৮ খ্রীঃ পূঃ-২৭৩ খ্রীঃ পূঃ) ঃ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীক ভাষায় তাঁহার উপাধি ছিল 'অমিত্রঘাত'। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁহার সময়ে তক্ষশিলায় এক বিদ্রোহ হয় বলিয়া জানা যায়। যুবরাজ অশোক এই বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার রাজসভায় গ্রীস ও মিশরের রাজারা দূত পাঠাইয়াছিলেন।

অশোক (২৭৩ খ্রীঃ পূঃ-২৩২ খ্রীঃ পূঃ) ঃ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল 'বিক্ষুব্ধ মানব ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শান্তিপূর্ণ বিরতিকাল' বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অভিহিত করিয়াছেন। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি শান্তি ও আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, প্রজাকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবর্তন করিয়া অন্ধকার মানবসমুদ্রে আলোকবর্তিকার কাজ করিয়াছিলেন। সত্য,

দয়া, শুচিতা, নম্রতা প্রভৃতি গুণাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এক অভিনব রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ধর্মের আদর্শে রাষ্ট্র স্থাপন এবং শাসন পরিচালনা, শুধু ভারতের ইতিহাসে কেন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব ব্যবস্থা।

অশোকের সিংহাসনারোহণ ঃ কথিত আছে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ভ্রাতাদের সহিত অশোকের সংঘর্ষ হয়। ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে কলিঙ্গ যুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর অশোকের মনে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহার ফলে চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হইয়াছিলেন।

কলিঙ্গ জয় ঃ সম্রাট হইয়া অশোক রাজ্যবিস্তারে মন দেন। কলিঙ্গের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হইল এই যে, কলিঙ্গ রাজ্য নন্দ সাম্রাজ্যের পতনের কালে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মগধের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল। তাই সিংহাসনারোহণের আট বৎসর পরে অশোক কলিঙ্গ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কলিঙ্গরাজ প্রাণপণে বাধা দিয়াও যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। এই অভিযানের ফলে অগণিত লোক আহত ও নিহত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না। কলিঙ্গ যুদ্ধ হইল অশোকের জীবনের প্রথম এবং শেষ যুদ্ধ অতঃপর অস্ত্রবলের সাহায্যে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির পরিবর্তে তিনি প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা প্রভৃতি মানবধর্মী গুণ দ্বারা জনগণের হৃদয় জয় করিবার সংকল্প করিলেন। রণভেরীর পরিবর্তে ধর্মভেরীর নিনাদের দ্বারা বিজয়যাত্রা সূচিত করিবার আদর্শ গ্রহণ করিলেন।

ভারতের ইতিহাসে অশোকের কলিঙ্গ বিজয় এক নবদিগন্তের উন্মেষ করিয়াছিল। সামরিক ও সাম্রাজ্য বিস্তারের বিচারে অশোকের এই যুদ্ধে জয়লাভ বিম্বিসারের রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির পূর্ণতাদান করিয়াছিল। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হইল অশোকের জীবনের উপর ইহার প্রভাব। ইহা যেন জাদুকরের যাদু দণ্ডের স্পর্শে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার মত বিস্ময় কর ও অভাবনীয়। দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের পরিকল্পনা, সামরিক শক্তির পরিবর্তে আত্মশক্তির উপর গুরুত্ব দান প্রভৃতি পরিবর্তন মানব ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করিল।

কলিঙ্গ বিজয়ের ফলাফল

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা ঃ কলিঙ্গ যুদ্ধের স্মারক ত্রয়োদশ শিলালিপিতে অশোক তাঁহার মানসিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্বজীবে দয়া, সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ এবং প্রজাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধনের ব্রত গ্রহণ করেন। অশোক 'ধম্ম' বা আচরণীয় নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দয়া, দান, সত্য, শুচি, নম্রতা, মৈত্রী, প্রীতি প্রভৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালনীয়। জীবে দয়া সর্ব ধর্মেরই মূল কথা।' মাতাপিতাকে মান্য করা, তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করা,

দীক্ষা গ্রহণ

মিত্র-জ্ঞাতি-শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, দাস-ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি অবশ্য করণীয়। এই সমস্ত আচরণই প্রকৃত ধর্মাচরণ। পরধর্মে সহিষ্ণুতা হইল ধর্মপালনের আর একটি অঙ্গ। অশোক তাঁহার নীতিগুলি শিলালিপিতে খোদাই করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি-গুলি হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার ধর্মীয় ব্যাখ্যা এবং নীতির অনুশীলন কেবল বৌদ্ধধর্মের নীতি নয়, প্রাচীন সর্ব-ধর্ম শিক্ষারই অঙ্গ ছিল। ধর্মশিক্ষাকে প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবন হইতে স্বতন্ত্র না করিবার জন্য তিনি ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদের উপর তত গুরুত্ব দেন নাই। তিনি বাস্তব ও কার্যকরী নীতি অনুশীলন করিবার জন্য বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। চারিত্রিক উৎকর্ষ, অহিংসা ও সদাচারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য তিনি জনগণকে সর্বপ্রকারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ধর্মের ব্যাখ্যা

ধর্মীয় বাস্তবতা

ধর্মপ্রচার বা ধর্মবিজয় নীতি : অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ধর্মশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। (১) তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায়, পর্বতগাত্রে বা প্রস্তর স্তম্ভে তাঁহার ধর্মীয় নীতি ও অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (২) তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে একশ্রেণীর কর্মচারীর উপর রাজ্যের সর্বত্র ধর্মনীতির প্রচার ও শিক্ষাদান এবং ধর্মবিধি পালনের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। (৩) তিনি নিজে বিহারযাত্রার পরিবর্তে ধর্মযাত্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে রাজধর্মকে প্রজার ধর্মে পরিণত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। মৈত্রী ও প্রীতির নীতির দ্বারা ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ধর্মপ্রচারের মাধ্যম

ভারতের বাহিরে এই ধর্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি সিরিয়া, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশের রাজাদের নিকট ধর্মীয় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিংহলে যুবরাজ মহেন্দ্র এবং নেপালে কন্যা সংঘমিত্রাকে তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অশোকের সাম্রাজ্য : অশোকের শাসনাধীন মৌর্য সাম্রাজ্যের পরিধি সুনির্দিষ্ট-ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি লেখপ্রাপ্তির স্থান হইতে তাঁহার রাজ্যসীমা নির্ধারণ করা হয়। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় মানচিত্র দেখ]। উত্তর-পশ্চিমে তাঁহার সাম্রাজ্য সিরিয়ার প্রথম অ্যাণ্টিওকোসের সাম্রাজ্যসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়। আধুনিক কাবুল, আফগানিস্তান ও সিন্ধুদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কাশ্মীরও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা এবং কল্‌হনের রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্বদিকে মৌর্য সাম্রাজ্য ব্রহ্মপুত্র নদ এবং দক্ষিণ দিকে পেন্নার নদী পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

অভ্যন্তরীণ নীতি ও বৈদেশিক নীতিতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব : বৌদ্ধ ধর্ম

* 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।—বিবেকানন্দ।

গ্রহণ করিবার পর অশোকের অভ্যন্তরীণ নীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। মৌর্যবংশীয় মূল শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া তিনি এই পরিবর্তনগুলি সাধন করিয়াছিলেন। যজ্ঞের জন্য পশুবলি, জীবহিংসা, অসংযত উল্লাস প্রভৃতি

অশোভন আচরণ তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যুত, রাজুক, প্রাদেশিক ও মহামাত্র নামে রাজকর্মচারীদের উপর ধর্মের মূলনীতির প্রচার, পালন এবং তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই কর্মচারীদের প্রতি তিন বা পাঁচ বৎসর অন্তর 'ধর্মযাত্রায়' বহির্গত হইতে হইত। দণ্ডনীতির কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছিল।

বিচার ব্যবস্থারও উন্নতিসাধন করা হইয়াছিল। ধর্মনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি মানবসেবামূলক যথা চিকিৎসালয়, সরাইখানা, পথঘাট নির্মাণ, কূপ খনন প্রভৃতি কার্য করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে তিনি সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণের সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যে তিনি ধর্মপ্রচার করার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। তাহা সম্ভব হইয়াছিল একমাত্র ধর্মের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, হৃদয়ের পরিবর্তনের দ্বারা।

অশোকের মহত্ত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব : পৃথিবীর ইতিহাসে মহান্ আখ্যাধারী ঐতিহাসিক ব্যক্তির অভাব নাই সত্য ; কিন্তু অশোকের মত রাজর্ষি সম্রাট বিরল। প্রপীড়িত মানব-ইতিহাসের উজ্জ্বলতম আশা ও শান্তির জ্যোতিষ্কের মত ভারতের ভাগ্যাকাশে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যুদ্ধজয়ের পর যুদ্ধের পথ পরিহার করিয়া মৈত্রী ও শান্তি নীতির অনুসরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সামরিক শক্তির প্রাধান্যের পরিবর্তে শান্তির বাণী প্রচার করিয়া রাজ্য বিস্তার এক অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রজাদের কল্যাণকর কার্যের জন্য যে সমস্ত নরপতি ইতিহাসে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, অশোক নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করিয়াছেন। তিনি শুধু ইহলৌকিক কল্যাণের ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যও সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজাদের সন্তানবৎ জ্ঞান, তাহাদের সর্ববিধ কল্যাণ কামনায় সর্বচিন্তা ও শক্তি নিয়োগ, সমগ্র মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, পরধর্মে সহিষ্ণুতা, পশু-পক্ষী নির্বিশেষে প্রাণিজগতের কল্যাণ ইত্যাদি গুণাবলী অশোককে মানবজাতির ইতিহাসে এক অতুলনীয় ও অবিনশ্বর আসন দান করিয়াছে। ভারতের এক অংশে গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত এক নবধর্মকে সারা বিশ্বে প্রসার করা তাঁহার আর একটি মহান্ কীর্তি। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় সিংহল, নেপাল, চীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ভারত-সীমান্তের দেশগুলিতে এই ধর্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আজও সেই সমস্ত দেশে এই ধর্ম টিকিয়া আছে। দুঃখের বিষয় ভারতের ভিতর এই ধর্ম লুপ্তপ্রায়।

অশোকের ইচ্ছা ছিল আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড ধর্মরাজ্যে পরিণত করিয়া সার্বভৌম রাজশক্তির শাসনাধীনে আনয়ন করা। এক ধর্মে দীক্ষিত, মানবতার এক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি সর্বতোভাবে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্রত সফল হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহা অনুসৃত হয় নাই। ফলে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রশ্নে বিরোধ এত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে **'অশোকচক্র'** বিশ্বমৈত্রী এবং মানবপ্রীতির নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়াছে।

(ঘ-১) বৈদেশিক আক্রমণ

(১) পারসিক আক্রমণ : স্মরণাতীতকাল হইতেই উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া বহু বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পারস্যের আকেমেনিয়ান (Achaemenian) বংশীয় সম্রাট মহাবীর কুরুস (Cyrus) এবং তৃতীয় সম্রাট দারয়োস (Darius) ভারতে অভিযান করেন। তাহার ফলে গান্ধার এবং সিন্ধু-উপত্যকায় পারস্যের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ঐ সমস্ত অঞ্চলের শিলালিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেন যে, গান্ধার ইরাণীয় বা পারস্য সাম্রাজ্যের সপ্তম প্রদেশ ছিল, আর ভারত (সিন্ধু-উপত্যকা) ছিল দ্বাদশতম প্রদেশ। ইহার শাসনভার ন্যস্ত ছিল ক্ষত্রপ (Satrap) উপাধিধারী জনৈক শাসনকর্তার উপর। দারয়োসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ক্ষরস (Xerxes) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পারস্যের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে গ্রীসের বিরুদ্ধে প্রেরিত ক্ষরসের সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যও ছিল।

কুরুস (Cyrus)

দারয়োস

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারস্যের আধিপত্য কত কাল স্থায়ী হইয়াছিল সঠিকভাবে বলা যায় না। অনুমিত হয় যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালেও উত্তর-পশ্চিম ভারত পারসিক প্রভুত্বাধীন ছিল। ম্যাসিডনরাজ আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পারস্য সম্রাটের একাধিক যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী অংশগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ : পারসিক আক্রমণের পর ভারতবর্ষে যে বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে ভারত-ইতিহাসে তাহা অন্যতম প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই আক্রমণ বা অভিযানের নায়ক ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর **আলেকজাণ্ডার**। আলেকজাণ্ডার ছিলেন গ্রীসের অন্তর্গত ম্যাসিডন নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে দিগ্বিজয় বা বিশ্ব-বিজয়ের এক বিরাট পরিকল্পনা লইয়া আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডন হইতে যাত্রা করিয়া পারস্য সম্রাট দারয়োসকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দ)।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ : খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া স্বাত (Swat) এবং বাজাউর (Bajour) উপত্যকার পার্বত্য উপজাতিদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন এবং তক্ষশীলা রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে কোন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ সম্ভব হইল না। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। পুষ্করাবতীর অধিপতি সঞ্জয়ও বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার

করিয়া লন। এইভাবে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর তাঁহার করতলগত হইল। এই বিজিত ভূখণ্ডের প্রশাসনের ব্যবস্থা করিয়া এবং প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে গ্রীক বাহিনী মোতায়েন করিয়া আলেকজাণ্ডার অতঃপর পূর্বদিকে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইলেন।

এ পর্যন্ত গ্রীকবীর কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হন নাই। কিন্তু বিতস্তা নদীর তীরে তাঁহার দুর্বার গতি প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এক ভারতীয় বীর, নাম পুরু। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম বীর সৈনিক হিসাবে পুরুরাজ চিরস্মরণীয়। কিন্তু অসম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পুরুর সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত গ্রীক প্রতিপক্ষের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পরাজিত হইয়া শত্রু শিবিরে আনীত হইলে আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেন? পুরুর উত্তর 'রাজার প্রতি রাজার যেমন আচরণ।' আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্বে ও সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করেন। কথিত আছে, তিনি পুরুকে তাঁহার রাজ্যও প্রত্যর্পণ করেন।

আলেকজাণ্ডারের গতিরোধে পুরু

অতঃপর আলেকজাণ্ডার আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পথিমধ্যে যে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য পড়িল সবই তিনি জয় করেন। সাংগালা শহরটি তাঁহার অভিযানের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হইয়া গঙ্গানদী-বিধৌত প্রসিদ্ধ মগধ রাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে সে বাসনা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী একটানা অভিযানে ব্যাপৃত থাকার ফলে গ্রীক সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, গাঙ্গেয় উপত্যকার ভারতীয় সৈনিকদের সমরকুশলতার কথা তাহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। নন্দবংশীয় রাজা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী (গঙ্গারাঢ়ী) লইয়া গ্রীক বাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন জানিয়া তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া যায়। আলেকজাণ্ডার বাধ্য হইয়া মগধ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই মনস্থ করিলেন। সৈন্যদলের একাংশ সেনাপতি নিয়ারকাস (Nearchus)-এর নেতৃত্বে জলপথে এবং অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী লইয়া আলেকজাণ্ডার নিজেই স্থলপথে স্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে আলেকজাণ্ডারকে শিবি, ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি উপজাতীয়রা প্রবল বাধা দেয়। বহুকষ্টে আলেকজাণ্ডার তাহাদের পরাজিত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া দুই বৎসর পরে ৩২৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ব্যাবিলনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল: ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন—আলেকজাণ্ডারের অভিযান ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় যে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা বাহ্লীক জাতীয় গ্রীকদের মারফত এদেশে আসিয়াছিল।

নেতিবাচক ফল

ভারতীয়দের কাছে এই আক্রমণের গুরুত্ব তেমনভাবে প্রকটিত হয় নাই। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে এই আক্রমণ নানাভাবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংস্কৃতি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি আদান-প্রদানের সূচনা করে। যেমন—

প্রত্যক্ষ ফল

প্রত্যক্ষভাবে (১) এই আক্রমণের ফলে ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়। (২) এই আক্রমণের ফলে বহু লোক হতাহত হয়। জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিকের মতে একমাত্র সিন্ধুদেশেই ৮০,০০০ লোক প্রাণ হারায়।

পরোক্ষভাবে (১) এই অভিযানের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পতন ঘটে। ফলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে এই সমস্ত অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করা সহজসাধ্য হয়। ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনও ইহার ফলে সম্ভব হইয়াছিল। (২) এই আক্রমণের ফলে ভারত সীমান্তে ধীরে ধীরে কয়েকটি বৈদেশিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যাক্ট্রিয় বা বাহ্লীক নামক গ্রীক উপনিবেশের কথা উল্লেখ করা যায়। (৩) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরস্পরের উপর প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে, স্থাপত্যে ও শিল্পকলায় গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গান্ধার শিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার গ্রীক আক্রমণের ফলেই ঘটে। এই শিল্পকলা গ্রীক ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সৃষ্টি। এইজন্য ইহাকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্প বা **গান্ধার আর্ট** বলা হয়। তাহা ছাড়া, ভারতীয় মুদ্রাঙ্কনে ও নমনীয় শিল্পে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে, গ্রীকরা ভারত হইতে জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করে বলিয়া জানা যায়।

পরোক্ষ ফল

(ঘ-২) মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণ

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ লইয়া নানা বৈদেশিক জাতি ভারতের নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন করে। মগধের শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশের রাজত্বের অবসানে উত্তর-ভারতের কোন শক্তিশালী রাজশক্তি এই সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণে সফলতার সহিত বাধা দিতে পারে নাই।

এই সকল বৈদেশিক আক্রমণকারীর মধ্যে ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীক, পার্থিয়ান পহ্লব, শক,. ইউ-চি (কুষাণ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীকদের আক্রমণ ঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ব্যাক্ট্রিয়া ও সিরিয়ার শাসনভার ছিল সেনাপতি সেলুকাসের উপর। তাঁহার মৃত্যুর পর অ্যান্টিয়োকাসের আমলে ব্যাক্ট্রিয়ানগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার পর **ডিমিট্রিয়স** হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। তিনি উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সমসাময়িক কালের সাহিত্যে তাঁহাকে ভারতের রাজা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার রাজধানী ছিল সাকল (বর্তমান শিয়ালকোট)। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মৌর্য সেনাপতি ও মগধের

ডিমিট্রিয়স

শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে ডিমিট্রিয়স ভারত আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ জয়সূচক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন।

এই যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য ভারত আক্রমণকারী গ্রীক রাজা ছিলেন **মিনান্দার (Minandar)**। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে মথুরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার সাম্রাজ্য উত্তর-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত ছিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পালি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্হো'র[১] মিলিন্দকে মিনান্দার বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়াছেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পৌত্র বসুমিত্র কর্তৃক মিনান্দার পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন।

মিনান্দার

দুইশত বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদের সঙ্গে গ্রীকদের সংস্রবের ফলে ভারতীয় ধর্ম ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসিয়াছিল। বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনীমূলক অনেক মূর্তি কাবুল, আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। হেলিওডোরাস নামে এক গ্রীক দূত বিষ্ণুভক্ত হইয়া গরুড় স্তম্ভ নির্মাণ করান বলিয়া কথিত আছে।

পহ্লব বা পার্থিয়ানগণের আক্রমণ ঃ পার্থিয়ান রাজ্য কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ছিল। পহ্লব রাজাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিথ্রিডেট্স (Mithridates)। তিনি খ্রীঃ পূঃ ১৩৮ অব্দে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া তক্ষশীলা অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ভারতবর্ষের উপর তাঁহাদের আধিপত্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। পার্থিয়ান শাসকদের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস ছিলেন অত্যন্ত খ্যাতিমান। তিনি সম্ভবতঃ প্রথম খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাবুল, কান্দাহার, তক্ষশীলা, পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল।

গণ্ডোফার্নিস

গণ্ডোফার্নিসের মৃত্যুর পর কুষাণ অধিপতি প্রথম কদফিসিস্ কাবুলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে শক ও কুষাণদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে সিন্ধু-উপত্যকায় পার্থিয়ানদের আধিপত্যের বিলোপ ঘটে।

শকদের আক্রমণ ঃ পরবর্তী গ্রীক রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া শকগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাহাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। শকদের নামানুসারে আফগানিস্তান শকস্থান বা সিস্তান নামে পরিচিত ছিল। তাহার পর শক নায়কগণ 'ক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

(১) মতান্তরে মিলিন্দ পঞ্হো। এই গ্রন্থে মিনান্দার ও বৌদ্ধ ধর্মাচার্য নাগসেনের কথোপকথন ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে মিনান্দারের প্রশ্নগুলি সন্নিবিষ্ট আছে।

শক ক্ষত্রপগণ মথুরা, তক্ষশীলা, কপিশা প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহাদের শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে এবং মনুসংহিতায় শকগণকে যথাক্রমে শূদ্র ও ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভারতীয়দের সহিত শকদের বৈবাহিক সম্পর্কের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতের মথুরায় এবং পশ্চিম ভারতের নাসিকে 'মহাক্ষত্রপ' বা বৃহৎ শক রাজ্য ছিল। উজ্জয়িনীতে আর একটি শক রাজ্য ছিল। রুদ্রদামন এই রাজ্যের রাজা ছিলেন।

(ঘ-৩) **মৌর্য যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ** গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে মৌর্য যুগের এবং স্মৃতিশাস্ত্র হইতে মৌর্যোত্তর যুগের সামাজিক বর্ণনা জানিতে পারা যায়।

মৌর্য যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা সুদৃঢ় হইয়াছিল, কিন্তু বিদেশী জাতিগুলির আগমনের ফলে এই প্রথা কিছুটা শিথিল হইয়া পড়ে। ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এই যে সে সকলকে আপন করিয়া লইয়াছে। কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখে নাই। ফলে ভারতীয় বর্ণভেদ প্রথাও দুর্বল হইয়া পড়ে। শক, পহ্লব, গ্রীক প্রভৃতি জাতি ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকে। তাহারা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। কালক্রমে তাহারা ভারতীয় সমাজে বিলীন হইয়া যায়। পশ্চিম ভারতে শক ক্ষত্রপদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। গোড়ার দিকে তাঁহাদের বিদেশী নাম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণ ভারতীয় নাম গ্রহণ করেন যথা—বিশ্বসেন, রুদ্রসিংহ, বিজয়সিংহ, রুদ্রসেন ইত্যাদি। তাঁহারা বিদেশী ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি ত্যাগ করিয়া ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত) ও হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা করেন।

জাতির সংমিশ্রণ
বর্ণসঙ্কর জাতির উদ্ভব

নবাগত এই শ্রেণী হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে মিশিয়া যাওয়ার ফলে ক্ষত্রিয় রাজন্য-বর্গের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাহা ছাড়া লিচ্ছবি, শাক্য, মল্ল প্রভৃতি উপজাতীয়দের সহিত আর্যবর্ণহিন্দুদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে হিন্দু সমাজে বর্ণসংকর ঘটে এবং নূতন জাতির উদ্ভব হয়। মেগাস্থিনিস মৌর্য যুগে ভারতে সাতটি জাতির কথা বলিয়াছেন। তিনি জীবিকার ভিত্তিতে জাতি নির্ণয় করেন। সম্ভবতঃ তিনি ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতেন না। তাঁহার মতে, পূর্বোক্ত[১] সাতটি শ্রেণীর মধ্যে দার্শনিক বা ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য বা চিকিৎসকগণ সম্মানজনক স্থানাধিকারী ছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ছিল বৈশ্য ও শূদ্রদের জীবিকা। অধ্যাপনা, দেবদেবী পূজা, রাজাদের রাজকার্যে মন্ত্রণাদান, জ্যোতির্বিদ্যা-চর্চা প্রভৃতি কার্য ব্রাহ্মণেরা করিতেন। ক্ষত্রিয় শ্রেণী যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যশাসন এবং দেশরক্ষা করিতেন। বৈশ্যগণ এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক ডঃ রোমিলা থাপার মনে করেন। গ্রীক লেখকদের বিবরণ অনুসারে মৌর্য

(১) মেগাস্থিনিসের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

যুগে বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে বৃত্তিমূলক পার্থক্যের অবসান ঘটে ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস পায়। বৈশ্য ও শূদ্রজাতীয় বণিকগণ অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেন।

সমাজে নারীর স্থান

মৌর্যোত্তর যুগে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সমসাময়িক সামাজিক বিধি প্রণেতাগণ (যথা মনুস্মৃতি) নারীর সামাজিক মর্যাদা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন না। মনুর বিধানে দেখা যায় যে, নারীকে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকার কথা বলা হইয়াছে। বাল্যবিবাহের বিধানও মনুসংহিতায় দেখা যায়। এই যুগে সতীদাহ প্রথারও প্রচলন ছিল। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। তবে ক্ষেত্র-বিশেষে নারীরা স্বয়ংবর প্রথার মাধ্যমে স্বামী নির্বাচন করিতে পারিতেন। জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। মৌর্যরাজাদের নারী রক্ষীবাহিনী ছিল।

দাসপ্রথা

মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে এই ধারণা হয় যে, ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এই মত সঠিক নয়। কারণ বৈদিক যুগ হইতে ভারতে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। দাসরা অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণীভুক্ত শূদ্র। আর্য-অনার্য সংঘর্ষে পরাজিত অনার্যরাই 'দাস' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে আরও অনেক রকম দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাসদের সন্তান-সন্ততি স্বাভাবিক নিয়মে পিতার প্রভুর দাসরূপে গণ্য হইত। দাসদের বিক্রয় করা ও বন্ধক রাখিবার প্রথাও ক্রমে প্রচলিত হয়। 'শ্রুতি-সাহিত্যে' উল্লেখ আছে যে প্রচন্ড অর্থাভাবে অনেক সময় স্বাধীন ব্যক্তিও নিজের স্ত্রী-পুত্রদের দাসরূপে বিক্রয় করিত।

মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বৈদিক যুগের মত ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে প্রচলন থাকিলেও ছাত্রজীবনের মেয়াদ এবং বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের রীতি-নীতির কঠোরতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ সন্তানগণও সকল বেদ অধ্যয়ন না করিয়া একটি, দুইটি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনটি বেদ অধ্যয়ন করিত। সম্ভবতঃ দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী প্রভৃতি উপাধি এই সময় হইতে প্রচলন হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা
শিল্পী সঙ্ঘ গঠন

ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে মৌর্য যুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রচলিত ছিল বলা হইয়াছে। রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত। রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে কারিগর ও শিল্পীরা শিল্পী সংঘ (Guild) গঠন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ জীবিকা নির্বাহ করিত। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ীরা ব্যবসামূলক নিগম (trade guild) গঠন করিত। এইগুলি শক্তিশালী সংগঠন ছিল। কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, চর্ম, যন্ত্র, ধাতু, বস্ত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পগুলি ছিল প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক। মৌর্য যুগে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প উন্নত ছিল।

দেশে ও বিদেশে ভারতীয় বস্ত্রের যথেষ্ট কদর ছিল। কাশী, কোঙ্কন, বঙ্গ ও মহীশূর ছিল বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। সূতী বস্ত্রের সহিত পশম বস্ত্রেরও কদর ছিল। গান্ধার পশম বস্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকায় মসলিন বস্ত্রের অনেক কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মসলিন বস্ত্র রোমে রপ্তানি হইত। ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মূল্যবান পাথর মনিমুক্তা, মশলা, সুগন্ধী কাষ্ঠ ও সূতীবস্ত্র। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এইসকল পণ্যের খুব চাহিদা ছিল। মৌর্য শাসনকালে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশেষ সমিতি বা বোর্ড ছিল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর হইতে গ্রীস এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গভীরতর হয়।

বহির্বাণিজ্য

পূর্বোক্ত বৈদেশিক জাতিগুলি যথা ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রীক, পহ্লব বা পার্থিয়ান এবং শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারতে বসবাস এবং ভারতীয়দের সহিত সংমিশ্রণের ফলে মিশ্র জাতির উদ্ভব ঘটে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল হইতে পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে এই সকল লোকের বসতি গড়িয়া উঠে।

অনুরূপভাবে বহিরাগত জাতি গোষ্ঠীর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যথা মধ্য এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটে।

মৌর্য যুগের শিল্পকলা ঃ মৌর্য যুগের শিল্পকলার যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কাষ্ঠ, লৌহ এবং প্রস্তরশিল্পে ভারতীয়গণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। সিন্ধু-সভ্যতার শিল্পের নিদর্শন বাদ দিলে মৌর্য শিল্পরীতি হইল প্রাচীন ভারতের প্রথম এবং নিজস্ব শিল্পরীতি। চন্দ্রগুপ্তের শতস্তম্ভযুক্ত কাষ্ঠ-নির্মিত প্রাসাদ সেই সময়কার দারুশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অশোকের সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে একটি নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। এই সময়কার শিল্পের প্রধান উপাদান ছিল প্রস্তর। পাহাড়ের গাত্রে প্রস্তর খোদাই করিয়া 'চৈত্য' এবং স্তূপ নির্মিত হইত, যেমন—সারনাথ ও সাঁচীতে আবিষ্কৃত স্তূপ প্রভৃতি। ভাস্কর্য-কলার ক্ষেত্রেও এইগুলি অতুলনীয়। সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষস্থিত ত্রিসিংহ মূর্তিটির অঙ্কন পদ্ধতি অসাধারণ ছিল। অশোকের অন্যান্য স্তম্ভও অসাধারণ। এইগুলি "যেমন জীবন্ত ও ভাবব্যঞ্জক, তেমনি শক্তি ও মহিমা দ্যোতক।" এই সময়ে লিপি অঙ্কনশিল্পও চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অশোকের শিলালিপি-গুলি ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। এইগুলিকে ক্রমানুযায়ী আট ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) দুই প্রকারের ক্ষুদ্র শিলালিপি ঃ প্রথমটি অশোকের ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাস, দ্বিতীয়টি 'ধম্ম'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।

দারুশিল্প

স্থাপত্য

ভাস্কর্য

শিলালিপি

(২) ভাবরু শিলালিপি ঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত মূল্যবান উক্তির সঙ্কলন।

(৩) চতুর্দশ শিলালিপি : রাজ্যশাসন ও নীতিসংগঠনের আদর্শের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(৪) কলিঙ্গ শিলালিপি : কলিঙ্গ বিজয়ের পর নূতন রাজ্যশাসন নীতি বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) ববাবর (বিহার—গয়া জেলা) : পাহাড়ে প্রাপ্ত গুহালিপি 'আজীবিক' শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের জন্য উৎসর্গীকৃত।

(৬) তরাই অঞ্চলের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বয় : মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে।

(৭) সপ্তস্তম্ভ শিলালিপি : দিল্লী, এলাহাবাদ, চম্পারণ, নন্দনগড় প্রভৃতি জায়গায় স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের উপদেশ খোদিত।

(৮) ক্ষুদ্রলিপি চতুষ্টয় : এলাহাবাদ, সাঁচী ও কাশীর নিকট সারনাথে আবিষ্কৃত। উক্ত শিলালিপিগুলিতে স্থাপত্য শিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

(৬) **কুষাণগণের আক্রমণ :** কুষাণগণ ইউ-চি নামক একটি যাযাবর জাতির শাখা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তাহাদের পাঁচটি শাখার মধ্যে অন্যতম কুষাণগণ সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। কুজল কদফিসিস্ বা প্রথম কদফিসিস্ এই শাখার পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি অন্য চারিটি শাখা-রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত কুষাণ জাতির অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া তিনি পারস্য দেশের সীমা হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত কুষাণ-আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

প্রথম কদফিসিস্

তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা হইলেন তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বীম কদফিসিস্ বা দ্বিতীয় কদফিসিস্। তাঁহার সময়ে কুষাণ রাজ্য ভারতের অভ্যন্তরে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পূর্ব-ভারতের অনেক স্বাধীন রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া বারাণসী পর্যন্ত তিনি কুষাণ রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রায় তাঁহাকে 'মহেশ্বর' উপাধিতে ভূষিতরূপে দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি শিবের উপাসক ছিলেন।

দ্বিতীয় কদফিসিস্

কুষাণশ্রেষ্ঠ কণিষ্ক : কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সময় এবং দ্বিতীয় কদফিসিসের সহিত সম্পর্ক নিশ্চিত ভাবে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ভিনসেণ্ট এ. স্মিথের মতে দ্বিতীয় কদফিসিসের মৃত্যু হয় ১১০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১২০ খ্রীষ্টাব্দে কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যান্য ঐতিহাসিক মনে করেন কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সেই সাল হইতে একটি নূতন অব্দের প্রচলন করেন। ইহা শকাব্দ নামে পরিচিত। স্বাধীন ভারত সরকার শকাব্দকে ভারতের সরকারী সম্বৎ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। কণিষ্ক বীম কদফিসিস্ বা দ্বিতীয় কদফিসিসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কণিষ্কের সময় কুষাণ সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খোরাসান, কাবুল, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। কাশ্মীরও কুষাণ শাসনাধীনে ছিল বলিয়া 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সিন্ধু-উপত্যকায় এবং পাঞ্জাবেও কুষাণ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুরুষপুর বা পেশোয়ার ছিল কণিষ্কের রাজধানী। পূর্বদিকে মগধ ও বারাণসী পর্যন্ত কুষাণ রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া বৌদ্ধ ও চীনা গ্রন্থ হইতে জানা যায়। সুতরাং কুষাণ সাম্রাজ্য যে পূর্বে ও পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাজ্যসীমা

কণিষ্কের সামরিক দক্ষতা ও সাফল্যের কথা দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে জানা যায়। চীনা সেনাপতি প্যান-চাও-এর নিকট দ্বিতীয় কদফিসিসের পরাজয়ের প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ্ বলিয়াছেন, তিনি পরাজিত সম্রাটের নিকট হইতে খোটান, কাশগড় প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সন্ধির সর্তানুযায়ী এক রাজকুমারকে প্রতিভূস্বরূপ নিজের রাজ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন।

সামরিক সাফল্য

কিন্তু কণিষ্কের খ্যাতি তাঁহার সামরিক সাফল্যের জন্য নয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তিনি এক অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাহা ছাড়া, সে যুগের শিল্প এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান ছিল অতুলনীয়।

বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

রাজধানী পুরুষপুরে তিনি একটি বিরাট বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেন। তাঁহার সময়েই বৌদ্ধদের মধ্যে 'হীনযান' ও 'মহাযান' নামে দুই শাখার সৃষ্টি হয়। হীনযান মতাবলম্বিগণ বুদ্ধের কোন প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া আরাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। পক্ষান্তরে, 'মহাযান' মতাবলম্বিগণ বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করিয়া আরাধনা করিতেন। তাই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিরোধ দূর করিবার জন্য কণিষ্ক কাশ্মীরে (মতান্তরে গান্ধারে বা জলন্ধরে) একটি বৌদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করেন। ইহাই ছিল **চতুর্থ** এবং সর্বশেষ **বৌদ্ধ মহাসভা** বা **সঙ্গীতি**। এই ধর্মসভায় মহাযান ধর্মপদ্ধতির প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছিল। মহাকবি পণ্ডিত বসুমিত্র এই সভার অধ্যক্ষ এবং অশ্বঘোষ সহাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকার্যেও কণিষ্ক বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম এবং দর্শনের উপর লিখিত বিরাট টীকা কোষগ্রন্থকে খোদাই করিয়া নব-নির্মিত এক বিশাল স্তূপের ভিতরে রক্ষা করার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মহাকবি অশ্বঘোষ, 'মহাযান' পণ্ডিত নাগার্জুন, চিকিৎসক চরক প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পেশোয়ার ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্রশিক্ষা ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

বৌদ্ধ ধর্ম-চর্চা

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপেও কণিষ্ক বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় সভাকবি অশ্বঘোষ 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সূত্রালঙ্কার' নামক দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বসুমিত্র 'মহাবিভাষা শাস্ত্র' নামে বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ কালজয়ী হইয়া আজও অমর হইয়া আছে।

শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের জন্য কণিষ্কের রাজত্বকাল বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। পেশোয়ারে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর তিনি যে চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সে যুগের স্থাপত্য শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বহু বিহার এবং সঙ্ঘারামও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়াছিল। গান্ধার এবং মথুরায় তিনি বহু সুদৃশ্য হর্ম্য এবং কাশ্মীরে কণিষ্কপুর নামে একটি নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৩ বৎসর রাজত্ব করার পর কণিষ্ক মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর বশিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক এবং বাসুদেব নামে চারিজন কুষাণ সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাসুদেবের মৃত্যুর পরে প্রথমে নাগবংশীয় রাজাগণ এবং পরে গুপ্ত সম্রাটগণ কুষাণ সাম্রাজ্যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কণিষ্কের পরবর্তী কুষাণ শাসকগণ

বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্য : এই যুগে গ্রীস, রোম, মিশর, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল বলিয়া সমকালীন ইতিহাস এবং ভূগোল হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতে প্রস্তুত অনেক জিনিস রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম এশিয়ায় এবং আফ্রিকার নানা অঞ্চলে রপ্তানি হইত। স্ট্রাবো নামে একজন প্রাচীন যুগের লেখক লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের রাজারা রোম সম্রাটদের নিকট অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য উপহার পাঠাইতেন। সাধারণতঃ উত্তর ভারতের সহিত স্থলপথে এবং দক্ষিণ ভারতের সহিত জলপথে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। স্থলপথে পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের ভিতর দিয়া মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় নানা অঞ্চলে বাণিজ্য দ্রব্য পাঠান হইত।

রোমের সঙ্গে যোগাযোগ

কুষাণ যুগে রোমের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রোমে ভারতীয় পণ্যের খুব চাহিদা ছিল। বিনিময়ে রোম হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাচ, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি ভারতবর্ষে আসিত। 'Periplus of the Erythrean Sea' নামক গ্রন্থে মিশরীয় ও রোমীয় নাবিকগণের লোহিত সাগরের উপকূল দিয়া জলপথে ভারতবর্ষে আসার কথা বলা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে ভৃগুকচ্ছ এবং পূর্বদিকে মাদ্রাজের উপকূলস্থ নানা বন্দরের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

কুষাণ যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি : ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাসে

কুষাণ যুগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। শিল্পের ক্ষেত্রে এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল **গান্ধার শিল্প**। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পর হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীকদের বসবাস এবং কুষাণ যুগে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম এবং শিল্প ও সভ্যতার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে এক মিশ্র শিল্পরীতির উদ্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় শিল্পরীতির সহিত মিশিয়াছিল রোমীয় ও মধ্য-এশিয়ার রীতি-নীতি। এই সমন্বয়ের ফলে সৃষ্ট হইয়াছিল অপূর্ব গান্ধার শিল্প-রীতি। ভারতীয় ভাব ও রীতির সহিত প্রাচীনকালের বিখ্যাত গ্রীক ও রোমীয় স্থাপত্য-রীতির সমন্বয়ের এমন অপূর্ব সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না। গ্রীক শিল্পরীতির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি গঠন এই শিল্পরীতির অন্যতম নিদর্শন। মথুরা, অমরাবতী প্রভৃতি জায়গায় এই শিল্পরীতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গান্ধার শিল্প

সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত মৌর্যোত্তর যুগে আগত গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণ প্রভৃতি ভারতে বসবাসকারী বৈদেশিক জাতিগুলির সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।[১] এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রকাশ ঘটিয়াছিল সে যুগের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে। শিল্পের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক প্রভৃতি মনীষিগণের অবদান অবিস্মরণীয়। অশ্বঘোষ ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার এবং দার্শনিক। অনেকে মনে করেন, কবি-প্রতিভায় তিনি কালিদাসের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। মহাযান ধর্মমতের সূত্র 'প্রজ্ঞা পারমিতা' ও 'মাধ্যমিক সূত্র' প্রণেতা নাগার্জুন ছিলেন মহাযান ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। বসুমিত্র 'মহাবিভাষা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। চরকের 'চরক-সংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুত সংহিতা', কাত্যায়নের 'বিভাসা', পাতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', যাজ্ঞবল্ক্যের 'স্মৃতি', বাৎসায়নের 'কামসূত্র', মনুর 'মনুসংহিতা', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতি চিকিৎসা বিজ্ঞান, ধর্ম, কাম, মোক্ষ, সাহিত্য-দর্শন সম্বন্ধীয় নানাজাতীয় গ্রন্থও এই যুগে রচিত এবং সঙ্কলিত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে, রামায়ণ-মহাভারতের বর্তমান রূপের সঙ্কলন এই সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল।

সাহিত্য

এই যুগে রচিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ছিল বৌদ্ধধর্মীয়। লেখার ভাষা ছিল সংস্কৃত। এইজন্য এই যুগকে 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' যুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই যুগে বৌদ্ধ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সে যুগে বৌদ্ধ শাস্ত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ার বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। তাহা ছাড়া, তক্ষশিলাও বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ পরিচিত ছিল।

শিক্ষা

(১) রবীন্দ্রনাথের ভাষায় শক, হূণ, দল......এক দেহে লীন হইয়া গিয়াছিল।

সামাজিক ক্ষেত্রেও বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণের ফলে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। শক, পহ্লব বা পার্থিয়ান, ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি জাতির হিন্দু ও বৌদ্ধদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে এক সর্ব-ভারতীয় জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেক গ্রীক এদেশে বসবাসকালে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন এইরূপ অনুমানও করা হয়। গ্রীক রাষ্ট্রদূত হেলিওডোরাস (Heliodoros) বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেসনগরে গরুড় স্তম্ভ নামে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সমাজ

উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রেও এই যুগে বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার কাশগড়, ইয়ারখন্দ খোটান, তুরফান, কুচি প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও প্রভৃতি পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সে যুগে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। গুপ্ত যুগে যে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও বৃহত্তর ভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল এই যুগে।

বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ

(চ) মধ্য ভারত এবং দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন বংশের আধিপত্য

(১) পুরাণে সাতবাহনদিগকে 'অন্ধ্র' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী তেলেগু প্রদেশে অন্ধ্রগণ বাস করিত। সাতবাহনগণ অন্ধ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিয়া যে সব রাজশক্তি স্বাধীন সর্বভারতীয় রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সাতবাহনদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে মালব হইতে কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩০ হইতে ২২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীকাল এই রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

পুরাণের মতে সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **সিমুক**। তাঁহার পুত্র সাতকর্ণীর সহিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আগত শক ক্ষত্রপদের সংঘর্ষের কথা কার্লে, নাসিক প্রভৃতি গুহালিপিতে উল্লেখ আছে। সাতকর্ণী মালবের পূর্বাংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। জয়গৌরব ঘোষণার জন্য তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়াও অনুমান করা হইয়াছে।

সাতকর্ণী

(২) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি শক, যবন, বাহ্লীক-গ্রীক প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া ঐতিহাসিক গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সৌরাষ্ট্র, কোঙ্কন, বিদর্ভ প্রভৃতি সাতবাহন রাজ্যের

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী

অন্তর্গত হইয়াছিল। তাঁহার মাতা গৌতমী বলশ্রীর এক শিলালিপিতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই শিলালিপিতে তাঁহাকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং শক, যবন ও পহ্লবদের উচ্ছেদকারী বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ১০৬ হইতে ১৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্য বিজেতা ছাড়াও সমাজ-সংস্কারকরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বর্ণ সংমিশ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। নাসিক প্রশস্তির বিবরণ অনুযায়ী তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্পচূর্ণকারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রজাকল্যাণকর শাসকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

রুদ্রদামন

তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ী শকরাজ রুদ্রদামনের নিকট দুইবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তাঁহার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। তিনি ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য-বিরোধী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। রুদ্রদামনের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় নাই।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী

সাতবাহন বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী। রুদ্রদামনের পরবর্তী রাজাদের হাত হইতে তিনি কিছু হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সাতবাহন রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। অন্ধ্র রাজ্য তথা সাতবাহন বংশের পতন ঘটে। অপরদিকে বিদেশী আক্রমণকারীরা তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন করে।

(ছ) গুপ্ত সাম্রাজ্য ও সভ্যতা

গুপ্ত বংশের উত্থান ঃ কুষাণদের পতনের পর উত্তর-ভারতে কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল না। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রায় সব সময় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। মধ্য ভারতের বাকাটক রাজবংশ, উজ্জয়িনীর শক বংশ এবং পূর্ব-ভারতের গুপ্ত রাজবংশ ছিল ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মগধ অঞ্চলে গুপ্ত রাজারা রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা মগধকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অব্যবস্থা এবং অনৈক্যের সুযোগ লইয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

গুপ্ত বংশের উত্থান ঃ ভারত-ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ'

মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মগধ সাম্রাজ্য উহার প্রাধান্য হারাইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একরূপ অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এই রাজবংশের অধীনে আবার তাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই যুগে ব্যাপক উৎকর্ষ দেখা দিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ঐতিহাসিকগণ গুপ্ত যুগকে ভারতের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

গুপ্ত বংশের প্রথম রাজা রূপে অনুমিত শ্রীগুপ্ত চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মগধের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ঘটোৎকচ গুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ঘটোৎকচের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎপরবর্তীকাল হইতে মগধ তাহার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। গুপ্ত রাজাদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মতভেদ আছে। চৈনিক পর্যটক ই-সিংএর রচনার ভিত্তিতে কেহ কেহ মনে করেন যে, বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি অথবা মালদহ জেলায় তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল। ডঃ গয়াল নামক এক গবেষকের মতে গুপ্ত রাজাদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তরপ্রদেশে।

প্রথম রাজা শ্রীগুপ্ত

ঘটোৎকচ গুপ্ত

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ গুপ্ত বংশের তৃতীয় এবং সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসন আরোহণ কাল স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে 'গুপ্ত সম্বৎ' নামে এক সম্বৎ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। পুরাণের মতে অযোধ্যা এবং প্রয়াগ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। বৈশালীর শক্তিশালী লিচ্ছবিবংশীয়া কন্যা কুমারদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে ইহাতে গুপ্ত বংশের রাজনৈতিক প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্তবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা বলা যায়। দশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(১) **সমুদ্রগুপ্ত** (৩৩০-৩৭৫ খ্রীঃ)ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মনোনয়নক্রমে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন তথা মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের অন্যতম দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতবিরোধ আছে। 'কাচ' নামে একজন গুপ্ত শাসনকর্তার শাসনকালের প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রা হইতে কোন ঐতিহাসিক (যেমন, ভিনসেণ্ট এ. স্মিথ) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কাচ সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা ছিলেন। আবার অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে সমুদ্রগুপ্ত হয়ত একই ব্যক্তি ছিলেন।

বিজয় অভিযান ঃ এই দিগ্বিজয়ী বীরের সামরিক অভিযানের ইতিহাস তাঁহার সভাকবি হরিষেণ-রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি', অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মারক পদক এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্ত মুদ্রা প্রভৃতি উপাদান হইতে সংকলিত হইয়াছে। সভাকবির বর্ণনায় উচ্ছ্বাস বাহুল্য থাকা অসম্ভব নয়। তাহা হইলেও সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র আর্যাবর্ত (উত্তর-ভারত) জয় করিয়া 'সর্ব-রাজ্যচ্ছেত্তা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অসুর বিজয় ও ধর্মবিজয় নীতির অনুসরণও সুনিশ্চিতভাবে ঐতিহাসিক ঘটনা। উত্তর-

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য-জয় নীতি

ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে আর্যাবর্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সংহতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি শুধু রাজ্য জয় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন—পরাজিত রাজাদের রাজ্য তিনি নিজ-রাজ্যভুক্ত করেন নাই। উত্তর-পূর্ব ভারত হইতে সুদূর দক্ষিণে রাজ্য শাসনের অসুবিধা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

উত্তর-ভারত অভিযান কাহিনী

'এলাহাবাদ প্রশস্তি'[১] হইতে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত বাকাটক বংশীয় রাজা রুদ্রদেব, নাগরাজা নাগদত্ত, অহিচ্ছত্রের রাজা অচ্যুত, মথুরার নাগবংশীয় রাজা গণপতিনাগ, আসামের বালবর্মন, পশ্চিমবঙ্গের শুশুনিয়ার (বাঁকুড়া জিলা) চন্দ্রবর্মন প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া উত্তর-পূর্ব ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব, মালবের অর্জুনায়ন, মদ্রক, আভীর প্রভৃতি পশ্চিম-ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যেও তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল অতঃপর সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব-উপকূল ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন।

দক্ষিণ ভারতে অভিযান কাহিনী

দাক্ষিণাত্যের যে সমস্ত নরপতি সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোশলরাজ মহেন্দ্র, কাঞ্চিরাজ বিষ্ণুগোপ, এরণ্ডপল্ল-অধিপতি দমন, বেঙ্গীরাজ হস্তিবর্মন, কট্টুররাজ স্বামীদত্ত এবং মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত বিজিত রাজ্য তিনি পূর্বতন শাসকদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকৃতিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই নীতিকে সভাকবি হরিষেণ 'গ্রহণপরিমোক্ষ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজাগণ

উত্তরাপথ এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের সামরিক অভিযানের সাফল্য দেখিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজাগণ এবং উপজাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলি স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়।

রাজ্য বিজয়ের প্রধান তিনটি শ্রেণী

সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য-বিজয়কে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) আর্যাবর্তের সম্পূর্ণ রাজ্য বিজয়, (২) দাক্ষিণাতের 'অনুগ্রহম' অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকার করিলে বিজিত রাজ্যের রাজাকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং (৩) প্রত্যন্ত প্রদেশে করদ রাজ্য স্থাপন।

রাজ্য বিজেতা হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

---

(১) এলাহাবাদের স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের কাহিনী খোদিত আছে। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ ইহার রচয়িতা।

সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার রাজসভায় একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়াতে একটি মঠ নির্মাণ করার জন্য তাঁহার অনুমতি চাহিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমুদ্রগুপ্ত এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শকরাজাগণ উপহারাদি প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের অধীনতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বৈদেশিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

দিগ্বিজয় শেষ করিয়া সমুদ্রগুপ্ত সেকালের প্রচলিত প্রথানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা স্বীয় সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন।
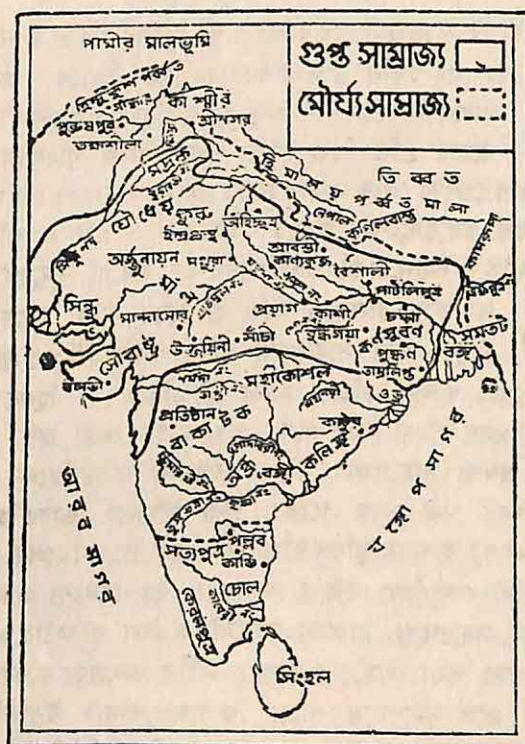
সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা,[১] পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই গুপ্ত সাম্রাজ্যই হইল প্রাচীন ভারতের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য।

রাজ্যসীমা

(১) ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পশ্চিম পাঞ্জাব তাঁহার সাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা বিষয়েই ছিল তাঁহার গভীর অনুরাগ। হরিসেন-রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'তে তাঁহাকে 'কবিরাজ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি আখ্যাতে ভূষিত করা হইয়াছে। তিনি যে কেবল বিদ্বান্ ছিলেন তাহা নয়, বিদ্যানুশীলনেও ছিল তাঁহার সমান উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা। খ্যাতনামা বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধুকে তিনি পরম সমাদর করিতেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তাঁহার নামাঙ্কিত বীণাবাদনরত মূর্তি হইতেই সুস্পষ্ট-রূপে জানা যায়। শিল্পের ক্ষেত্রেও তাঁহার অনুরাগ লক্ষণীয়।

বহুমুখী প্রতিভা

ধর্মের দিক দিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সফল রাজ্যবিজয় অভিযানের পর তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মানুমোদিত উপায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু নিজে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হইলেও অন্য ধর্মের প্রতি ছিল তাঁহার পরম শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা। জাতিধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক তাঁহার নিকট সমান ব্যবহার পাইত।

ধর্মমত

ভারত-ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্তের স্থান ঃ অসাধারণ সাহস ও শক্তির অধিকারী, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্মানুরাগী বহু গুণান্বিত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত সমসাময়িক ভারতীয় রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখেন। অশোকের মৃত্যুর পরে সার্বভৌম শক্তির অধিকারীরূপে সমুদ্রগুপ্তই প্রথম সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত দিগ্বিজয়ের আদর্শ গ্রহণ করিয়া তিনি একের পর একটি রাজ্য জয় করিয়া খণ্ডিত ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্যের ভিতরে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট এ স্মিথ এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁহাকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' (**Indian Napoleon**) আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন যুগাদর্শানুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী। দিগ্বিজয় ছিল তাঁহার আদর্শ। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, সমুদ্রগুপ্ত ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ কার্যকরী করার জন্য দিগ্বিজয় তথা সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অনুসরণ করেন। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে সমুদ্রগুপ্ত পাঞ্জাব ও রাজপুতানার উপজাতিগুলিকে জয় করার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপজাতিগুলির সামরিক শক্তি বিনষ্ট হয়। দীর্ঘকাল ব্যাপী জাতি ও উপজাতির মধ্যে সংগ্রামের অবসান ঘটে সমুদ্রগুপ্তের একাধিক অভিযানের ফলে। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী রাজত্বের পর চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতীয় নেপোলিয়ন

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৭৬-৪১৪ খ্রীঃ) ঃ সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার ইচ্ছানুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্তকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন যোগ্য পিতার

যোগ্য পুত্র। বিশাখদত্ত-রচিত 'দেবী-চন্দ্রগুপ্ত' গ্রন্থে রামগুপ্ত নিধন কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, সিংহাসনারোহণ করিয়া তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

বৈবাহিক সম্বন্ধের দ্বারা রাজ্য বিস্তার

প্রথমতঃ, উত্তরাধিকার-সূত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈবাহিক সূত্রে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগ এবং বাকাটক বংশীয় রাজকন্যাদের বিবাহ করিয়া বা গুপ্ত বা গুপ্ত রাজকন্যাদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিয়া তিনি গুপ্ত বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপদের সেনাপতি করিয়া মালব ও সৌরাষ্ট্র তিনি অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই কীর্তির জন্য 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক বিজয়ের ফলে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সেনাপতি বীরসেনের নেতৃত্বে অভিযান পাঠাইয়া তিনি আরও কয়েকটি রাজ্য অধিকার করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ফলে পশ্চিম উপকূলের গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। ফলে পাশ্চাত্য দেশের সহিত জলপথে বাণিজ্যবৃদ্ধির পথ সুগম হইয়াছিল। রাজধানী পাটলিপুত্রের অনুরূপ পশ্চিম উজ্জয়িনীতে একটি রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারত ভ্রমণে আসেন। (তাঁহার বিবরণী পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) তাঁহার রাজসভায় সমকালীন বহু মনীষী এবং কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কালিদাস প্রমুখ নবরত্ন তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ধর্মমত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাঁহার পূর্বসূরীদের ন্যায়ই পরধর্ম সম্পর্কে তিনি উদার মত পোষণ করিতেন। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা তাঁহার অন্যতম চরিত্র-গুণ ছিল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত। মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকে শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'শকারি বিক্রমাদিত্য' অভিধায় ভূষিত ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই ইহা স্বীকার করিতে রাজী নন। কিন্তু উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রায় 'বিক্রমাদিত্য', 'সিংহবিক্রম', 'শকারি' প্রভৃতি উপাধির

উল্লেখ পাওয়া যায়। কিংবদন্তী অনুযায়ী উত্তর-ভারতের একাধিক রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই যে সেই কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য তাহার সমর্থনে একটি বড় যুক্তি এই যে, প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিক্রমাদিত্যের রাজসভার 'নবরত্নের' অন্যতম 'রত্ন' কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরই রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, প্রাপ্ত মুদ্রায় বিক্রমাদিত্যকে 'পাটলিপুরবর অধীশ্বর' ও 'উজ্জয়িনী পুরবর অধীশ্বর' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিকদের অনুমান এই যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কিংবদন্তী-খ্যাত বিক্রমাদিত্য।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভের প্রমাণ

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ : ফা-হিয়েন ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত। বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান ভারত পরিভ্রমণ এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তিনি এদেশে কয়েক বৎসর ধরিয়া পর্যটন করিয়া একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক-দের অনুমান সম্ভবতঃ ৪০১ হইতে ৪১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল তিনি ভারতে অতিবাহিত করেন। প্রায় ৩ বৎসর তিনি পাটলিপুত্র নগরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েনের বর্ণনা হইতে আমরা গুপ্তরাজাদের রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা, ভারতের তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে জানিতে পারি। ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে, গুপ্তরাজারা উদারনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রজাদের উপর রাজস্বের চাপ ছিল কম। জিনিসপত্রের দাম ছিল সস্তা। দেশের সর্বত্র বিরাজ করিত শান্তি ও শৃঙ্খলা। রাজপথে চুরি-ডাকাতির উপদ্রব এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ছিল না। দন্ডনীতি ছিল উদার। দোষীর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে জরিমানা আদায় করা হইত। পূর্ব-প্রচলিত প্রাণদন্ড বা অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি শাস্তি একেবারে রহিত করা হইয়াছিল।

উদার নৈতিক শাসন-ব্যবস্থা

রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মচর্চার কেন্দ্রস্থল। অশোকের আমলের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ফা-হিয়েন মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিরাট আকারের দাতব্য চিকিৎসালয়, বৌদ্ধ সংঘারাম প্রভৃতি দেখিয়াও ফা-হিয়েন বিস্মিত ও মুগ্ধ হন।

: জারা ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হইয়াও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিত। পাঞ্জাব এবং বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মধ্য-ভারতে আবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। ফা-হিয়েন বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত (অধুনা তমলুক) বন্দরে বৌদ্ধ স্তূপের

নিদর্শন পাইয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত ছিল সেকালে সমুদ্রযাত্রার একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখান হইতে বণিকেরা সমুদ্র পথে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ফা-হিয়েন মন্তব্য করিয়াছেন যে গুপ্ত রাজাদের সময়ে এই স্থানগুলির পূর্ব প্রাধান্য ও গৌরব হ্রাস পাইয়াছিল, তবে একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, দেশের অবস্থা ছিল খুব সচ্ছল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল। সারাদেশে সুষ্ঠু পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

সামাজিক অবস্থা

সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ কঠোর হইয়া উঠিতেছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির লোকদের উচ্চ জাতির লোকেরা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিত। চণ্ডালরা সুরাপান করিত এবং আমিষাসী ছিল।

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ : দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসেন। তাঁহার শাসনকালে গুপ্ত

কুমারগুপ্ত (৪১৪-৫৫ খ্রীঃ)

সাম্রাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ণ থাকে। তিনি পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের মত একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে পুষ্যমিত্র নামক এক দুর্ধর্ষ বর্বর জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এই জাতি সম্ভবতঃ নর্মদা নদীর তীরবর্তী মেকল অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ইহাদের আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তাহাদের দমন করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না।

পিতার মৃত্যুর পর যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পিতামহের ন্যায় 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। পিতার জীবদ্দশায় যুবরাজরূপে

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৬৭ খ্রীঃ)

পুষ্যমিত্রের সামরিক অভিযান প্রতিহত করিয়া তিনি অসাধারণ সামরিক কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই মধ্য-এশিয়া হইতে আগত বর্বর হূণগণ ভারত আক্রমণ করিলে নূতন বিপদের সূচনা হইল। হূণগণ ছিল পুষ্যমিত্রগণের অপেক্ষা অধিকতর দুর্ধর্ষ। স্কন্দগুপ্ত বহু কষ্টে তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সাময়িকভাবে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার স্কন্দগুপ্তকে 'ভারতের রক্ষাকারী' (Saviour of India) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি হূণদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। তাহারা গান্ধার অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শুরু করিয়াছিল। স্কন্দগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের বাকাটকগণের

আক্রমণও প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর (৪৬৭ খ্রীঃ) পর গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শেষ গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য নিশ্চিত পতনের সম্মুখীন হয়।

স্কন্দগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত যথাক্রমে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রান্তিক রাজ্যগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। গুপ্ত বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা বুধ গুপ্তের সময় (৪৭৭-৯৫ খ্রীঃ) হূণ নেতা তোরমানের নেতৃত্বে হূণেরা পুনরায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আক্রমণ করিয়া পাঞ্জাব দখল করিয়া লইয়াছিল।

হূণ আক্রমণ : তোরমান

(২) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ চতুর্থ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের সামরিক প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক দক্ষতার দ্বারা যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পতন শুরু হয় এবং বুধ গুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। পতনের কারণগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) অভ্যন্তরীণ এবং (২) বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে (১) স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজাদের সামরিক শক্তির অভাব, (২) শাসনবিষয়ক অযোগ্যতা, (৩) পারিবারিক কলহ, এবং (৪) প্রাদেশিক রাজাদের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রধান কারণ ছিল। বৈদেশিক ক্ষেত্রে আক্রমণকারী বর্বর হূণদের আক্রমণ, পুষ্যমিত্রদের আক্রমণ, যশোধর্মনের অগ্রগতি ইত্যাদি ঘটনা গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

(১) স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি উহার পতনের পথ রোধ করিতে পারেন নাই। (২) পরবর্তী গুপ্তরাজাদের বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগ তাঁহাদের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করিয়াছিল। (৩) আত্মকলহে নিয়ত ব্যাপৃত থাকার ফলে পরবর্তী গুপ্তরাজগণ সুষ্ঠুভাবে সাম্রাজ্য শাসন এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। (৪) শেষ গুপ্তরাজগণ শাসন বিষয়ে ছিলেন সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাঁহারা না ছিলেন বীর যোদ্ধা, না ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ সুশাসক। (৫) কেন্দ্রীয় শক্তির এই দুর্বলতার সুযোগে উচ্চাভিলাষী প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। যশোধর্মন মান্দাসোরে, মৌখরীগণ উত্তরপ্রদেশে, রাজা শশাঙ্ক বঙ্গদেশে, ভট্টারক সৌরাষ্ট্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এক একটি সার্বভৌম শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিলে গুপ্ত সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যে পরিণত হইল। (৬) বৈদেশিক হূণদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী অবস্থা অপেক্ষাও খারাপ। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা হেতু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনৈক্য এবং চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সমগ্র উত্তর-ভারত যে কয়েকটি খন্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল কনৌজের মৌখরী বংশ, কামরূপের ভাস্করবর্মা, গৌড়বঙ্গের ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব এবং শশাঙ্ক, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ, মান্দাসোরের যশোধর্মন, বরোচ ও ভিনমলে গুর্জর রাজ্য, সৌরাষ্ট্রের ভট্টারক-প্রতিষ্ঠিত বলভী রাজ্য ইত্যাদি।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী অবস্থা

গুপ্ত সভ্যতা : ধর্ম বিষয়ে গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। তাঁহারা শাসন-ব্যবস্থাকে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের সূচনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভারতের ইতিহাসে একটি 'স্বর্ণযুগের' সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন দেশের ইতিহাসে কোন এক সময়ে **স্বর্ণযুগ** আসে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও ইহা সর্বজন-স্বীকৃত যে গ্রীসে পেরিক্লিসের আমলে, ইংলন্ডের ইতিহাসে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্ত যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক ব্যাপক মানসিক উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, এক কথায় জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার নব-সৃজনীশক্তির চরম গৌরবময় বিকাশ ঘটিয়াছিল। এইজন্য ঐতিহাসিকগণ ভারত-ইতিহাসের এই গৌরবময় যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। জনসাধারণের সুখ-শান্তিময় জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার, শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা প্রণালী প্রভৃতি জাতীয় জীবনের লক্ষণগুলি বৈদেশিক পর্যটকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ, সমসাময়িক সাহিত্য, উৎকীর্ণ শিলালিপি প্রভৃতি উপাদান হইতে আমরা এই গৌরবময় যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক মূল্যবান তথ্য পাই।

স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন?

ধর্ম : অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Maxmuller) মন্তব্য করিয়াছেন যে গুপ্ত যুগে হিন্দু ধর্মের নবজাগরণ (Hindu Renaissance) ঘটিয়াছিল। গুপ্তরাজগণ সকলেই হিন্দু ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণু, শিব, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর উপাসনা করিতেন। ইহার ফলে মৌর্য আমলে বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে হিন্দু ধর্মের যে অবনতি দেখা দিয়াছিল তাহার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, রক্ষণশীল সংকীর্ণ গন্ডী ছাড়িয়া বৃহত্তর হিন্দু ধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়া হিন্দু ধর্মকে উন্নত ও সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। হিন্দু ধর্মের এই নব-জাগৃতি সমকালীন শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

হিন্দু ধর্মের এই রেনেসাঁস বা নব-জাগৃতিকে অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়া

লইতে রাজী নহেন। তাঁহাদের মতে অশোক বা কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের দ্বারা হিন্দু ধর্মের বা জৈন ধর্মের বিলুপ্তি বুঝায় না। মৌর্যোত্তর যুগের মগধের শুঙ্গ রাজারা, উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপগণ, উত্তরাঞ্চলের আরও কয়েকটি রাজবংশ ব্রাহ্মণ্যধর্ম তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সুতরাং গুপ্ত যুগেই হিন্দু রেনেসাঁস ঘটিয়াছিল একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের অপেক্ষাকৃত কম সমাদৃত ধর্ম এই যুগে আদৃত এবং রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের দ্বারা অনুশীলিত হইয়াছিল, হিন্দু শিল্পধারা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে ইহার উৎকর্ষলাভ ঘটিয়াছিল। সেইজন্য এই যুগকে হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষের বা রেনেসাঁসের যুগ বলিয়া অভিহিত করা সুসঙ্গত বলা যায় না।

সমালোচনা

গুপ্ত সম্রাটগণ নিজেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। ফা-হিয়েন মথুরা, পাটলিপুত্র প্রভৃতি নগরীতে হীনযান ও মহাযান উভয় ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধদের দেখিয়াছিলেন, তাহাদের পৃথক পৃথক মঠের অস্তিত্বের নিদর্শনও দেখিয়াছিলেন এবং বুদ্ধগয়া ও লুম্বিনী গ্রামে বৌদ্ধ শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই যুগের উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপিতে জৈন ধর্ম সম্বন্ধেও উল্লেখ পাওয়া যায়।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

সাহিত্য : 'ক্লাসিক্যাল' ভারতীয় সাহিত্যের অবদানে গুপ্ত যুগ অবিস্মরণীয়। এই যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল। **সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয়** চন্দ্রগুপ্ত উভয়েই কাব্য-রসিক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের বীরসেন সে যুগের বিখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তীখ্যাত 'নবরত্ন সভা'র উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন **কালিদাস**। ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপীয়ার (**Shakespeare**), গ্রীক্ সাহিত্যে হোমার (**Homer**) প্রভৃতি মহাকবিদের মত কালিদাসও ছিলেন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিক। কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা'. 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' প্রভৃতি নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক নানা আখ্যানবস্তুর উল্লেখ আছে। তাঁহার নাটকগুলি অদ্যাবধি বিশ্বসাহিত্যের মূল্যবান রত্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। মৃচ্ছকটিক নাটকের রচয়িতা শূদ্রক এবং মুদ্রারাক্ষস নামে অর্ধ-ঐতিহাসিক নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণও এই যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ দুই দার্শনিক লেখক বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ এবং বিখ্যাত জ্যোতিষী আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্ত এই যুগেরই উল্লেখযোগ্য মনীষী ছিলেন। জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট এবং বরাহমিহির গ্রীক বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থাবলী হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত

কালিদাস

হয়। 'অমরকোষ' নামে প্রসিদ্ধ অভিধান-প্রণেতা অমরসিংহও এই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিল্পকলা : স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং ধাতুশিল্প ও চিত্রকলায় গুপ্ত যুগ উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এই যুগের অধিকাংশ অট্টালিকা ও মন্দির মুসলমান অভিযানকারীদের আক্রমণের ফলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই যুগের কয়েকটি অপরূপ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ছিল সারনাথে, দেওগড়ে, ভিতরগাঁও-এ, অজন্তার গুহাগুলিতে এবং আরও কয়েকটি স্থানে। ইহাদের মধ্যে খুব কমই বর্তমান কালে টিকিয়া আছে। বিশ্ববিখ্যাত অজন্তার গুহাগুলি প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। সুতরাং অজন্তা গুহার কতকগুলি গুহাই মাত্র গুপ্ত যুগে নির্মিত হইয়াছিল। গুহাগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—চৈত্য এবং বিহার। চৈত্যগুলিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা উপাসনা করিতেন, আর বিহারগুলি ছিল তাঁহাদের বাসভবন। পাহাড়ের গা কাটিয়া ঐ গুহাগুলি নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু গুহাগুলির দেওয়ালের মসৃণতা আজও দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। দেওয়ালগুলির চিত্রাঙ্কন সর্বকালীন চিত্রশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। দেব-দেবীর মূর্তি, বুদ্ধদেবের খোদিত মূর্তি, বুদ্ধদেবের জীবনের বিবিধ ঘটনার বর্ণনা, লতাপাতা, পশু-পক্ষীর মূর্তি ইত্যাদি হইল অধিকাংশ চিত্রের বিষয়বস্তু। বরহুত, সাঁচী, মথুরা ও সারনাথে এই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন আছে।

অজন্তার স্থাপত্য এবং চিত্র শিল্প

ধাতুশিল্পেও এই যুগে চরম উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দিল্লীতে 'চন্দ্রনাথের লৌহস্তম্ভ' এই যুগেই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য, এত দীর্ঘকালের ব্যবধানেও আজ পর্যন্ত তাহাতে মরিচা পড়িয়া এতটুকু নষ্ট হয় নাই। এই যুগের প্রাপ্ত মুদ্রা এবং তাম্র-নির্মিত বৌদ্ধমূর্তিও এই যুগের ধাতুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শনরূপে এখনও বিরাজমান।

ধাতুশিল্প

এই যুগে সঙ্গীতশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত নিজেই ছিলেন সঙ্গীত রসিক। সঙ্গীতের প্রতি এই অনুরাগ তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

সঙ্গীত

শুধু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উৎকর্ষের জন্যই এই যুগকে যে স্বর্ণ-যুগ বলা হয় তাহা নয়, এই যুগে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থারও অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে পশ্চিম উপকূলের ভৃগুকচ্ছ, সুর্পারক প্রভৃতি বন্দর গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হওয়ার ফলে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটিয়াছিল। এই সকল বন্দর হইতে রোম সাম্রাজ্যে পণ্য পাঠান হইত।

বাণিজ্যিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য

পূর্ব-ভারতের তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে ভারতীয়গণ সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে যাতায়াত করিতেন। এইস্থান হইতে চীনের সহিতও বাণিজ্য চলিত।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এইস্থান হইতেই চীন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই যুগে ইন্দোচীন এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে শুধু ভারতের বাণিজ্যই চলিত তাহা নয়; সেখানে ভারতীয় উপনিবেশও স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে ঐসব অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়াছিল। পরবর্তীকালে বৃহত্তর ভারত বলিতে এইসব অঞ্চলকেই বুঝাইত। এই সমস্ত অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল। ভারতের বাহিরে এই সমস্ত অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম এখনও টিকিয়া আছে। বহির্ভারতে নৌ-বাণিজ্যের প্রসার এবং উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগের দিক হইতে এই যুগের অবদান ভারত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

অজান্তর গুহাচিত্রে (রাহুল)

পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। অজন্তার গুহাচিত্র হইতে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এই যুগকে ভারতের বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এক গৌরবময় যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়।

উপসংহার

গুপ্ত যুগ ভারত-ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গৌরবময় যুগ। কেননা, এই যুগে কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি স্থাপত্য, কি ভাস্কর্য, কি ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয়েরা চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ যে ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তাহা যথার্থ যুক্তিসংগত।

অনুশীলনী

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে উত্তর-ভারতে কতটি রাজ্য ছিল ? (খ) মগধে কোন্ কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করে ? (গ) অজাতশত্রু কোথাকার রাজা ছিলেন ? (ঘ) মৌর্য বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (মাঃ ১৯৮৪) (ঙ) নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি ? (মাঃ ১৯৮৫) (চ) অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কে ? (ছ) ইন্ডিকা কাহার রচনা ? (জ) আলেকজান্ডার কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন ? (ঝ) হিদাসপিস বা ঝিলামের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হয় ? (ঞ) মেগাস্থিনিস কাহার আমলে ভারতে আসেন ? (মাঃ ১৯৭৬) (চ) সেলুকাস কে ছিলেন ? (ঠ) ক্ষত্রপ কাহাকে বলে ? (ড) শকাব্দ কে প্রচলন করেন ? (মাঃ ১৯৭৭) (ঢ) ধর্মমহামাত্র কাহাকে বলে ? (ণ) প্রাচীন ভারতের কোন্ রাজাকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' বলা হয় ? (ত) সমুদ্রগুপ্তের সভা-কবির নাম কি ? (থ) 'শকারি' কাহার উপাধি ? (দ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারত ভ্রমণকারী চৈনিক পর্যটকের নাম কি ? (ধ) পাটলিপুত্র নগরীর স্থাপয়িতা কে ? (ন) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী কোন্ বংশের রাজা ছিলেন ? (প) কালিদাস কে ছিলেন ? (ফ) বিহারযাত্রা কাহাকে বলে ? (ব) প্রাচীন ভারতের কোন্ যুগকে 'সুবর্ণযুগ' বলে ? (ভ) আর্যভট্ট কে এবং কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন ? (ম) মিনান্দার কে ছিলেন ? (মাঃ ১৯৮০) (য) গুপ্ত সম্রাটগণ কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? (র) শূদ্রকের প্রধান রচনার নাম কি ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর ভূমিকা আলোচনা কর। (খ) মহাপদ্মনন্দের অধীনে মগধের প্রাধান্য বিস্তার কিভাবে ঘটিয়াছিল ? তাঁহার 'একরাট' ও 'সর্বক্ষত্রান্তক' উপাধি গ্রহণের যৌক্তিকতা দেখাও। (গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কিভাবে গ্রীকগণের হাত হইতে ভারতকে মুক্ত করেন তাহা লিখ। (ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজ্যসীমার বর্ণনা দাও। (ঙ) কলিঙ্গ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখ। (চ) মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা বর্ণনা কর। (ছ) পাটলিপুত্র নগরের শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর। (জ) অশোকের 'ধর্মবিজয়' নীতি কি এবং কেন তিনি এই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঝ) বৌদ্ধ ধর্মমতের সহিত অশোকের ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা কর। (ঞ) মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী ভারতের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর। (ট) মৌর্য স্তূপ ও স্তম্ভ সম্বন্ধে কি জান ? (ঠ) সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তার নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ড) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজত্বকালের গুরুত্ব কি ? (ঢ) সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিজয় নীতির প্রধান প্রধান নীতি কি কি ? (ণ) গুপ্ত যুগকে 'হিন্দু রেনেসাঁসের আমল বলা হয় কেন ? (ত) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে 'শকারি' বলা হয় কেন ? (থ) গুপ্ত যুগের শিল্পকলা সম্বন্ধে কি জান ? (দ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য

বৈদেশিক আক্রমণ কতটা দায়ী ছিল ? (ধ) গুপ্ত বংশের শেষ প্রধান সম্রাট কাহাকে বলে ? তাঁহার প্রধান অবদান কি ? (ন) মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের ধর্মনীতি কতটা দায়ী ছিল ? (প) গুপ্ত যুগের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান ?

৩। **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও ঃ**

(ক) ‘ষোড়শ মহাজনপদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (খ) মগধের সাম্রাজ্য স্থাপনে নিম্নলিখিত তিনজন রাজার কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর ঃ (১) অজাতশত্রু, (২) মহাপদ্মনন্দ, (৩) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। (গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ-পরিচয় কি ? তিনি গ্রীক ও নন্দরাজাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঘ) অশোকের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশ কর। (ঙ) মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার কি নীতি ছিল ? অশোক এই শাসন-ব্যবস্থার কি সংস্কার সাধন করেন ? (চ) মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি কি ? (ছ) সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (মাঃ ১৯৮৪) (জ) সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য কিভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল আলোচনা কর। (ঝ) আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও। ইহার ফলাফল সম্বন্ধে কি জান ? (ঞ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সহিত আক্রমণকারী শক্তির সংঘাত সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (ট) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর। (ঠ) গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতের ‘স্বর্ণযুগ’ বলা কতটা যুক্তিসঙ্গত ? (ড) গুপ্ত যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং শিল্পকলা সম্বন্ধে কি জান ? (ঢ) সাতবাহন বংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ণ) মৌর্যোত্তর যুগের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাধান্য স্থাপনের জন্য দ্বন্দ্ব

(Struggle for Domination)

(ক) **উত্ত-ভারত :** খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ক্রমাগত হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক-১) হূণগণ ছিল মধ্য এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ ও যাযাবর বর্বর জাতি। ইহাদের একটি শাখা এ্যাটিলা নামক একজন নেতার অধীনে ইউরোপে প্রবেশ করিয়া রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে। অপর একটি শাখা ভারত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। তাহাদের প্রথম আক্রমণ গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত প্রতিহত করেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে হূণনায়ক তোরমানের নেতৃত্বে হূণগণ পুনরায় ভারত আক্রমণ করে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থান তাহারা দখল করিয়া লয়। তোরমানের মুদ্রা হইতে জানা যায় যে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কিছু অংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। কথিত আছে, ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তোরমান গুপ্ত বংশীয় সম্রাট ভানুগুপ্তের নিকট পরাজিত হন।

মিহিরকুল

হূণনেতা তোরমানের পুত্র মিহিরকুল পরবর্তীকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যে আরও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং মান্দাসোরের রাজা যশোধর্মন তাঁহাকে বাধা দেওয়ায় তিনি পশ্চাদপসরণ করিয়া কাশ্মীরে পলাইয়া যান।

মিহিরকুলের পর আর কোন শক্তিশালী হূণনেতা ছিল না। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাহারা ভারতীয় রাজ্যে মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করিয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে তাহারা ভারতীয় জনসমাজে মিশিয়া যায়। হূণ ও ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রণে আধুনিক 'রাজপুত' উপজাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

যশোধর্মন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ফলে সর্বত্র অরাজকতা দেখা দিলে যশোধর্মন নামে এক ব্যক্তি মালবে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মান্দাসোর (বা মন্দাসোর) নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া তিনি পরাক্রান্ত রাজারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি মালবের কোন সামন্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। মান্দাসোরে প্রাপ্ত একটি স্থানে অনুশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, যশোধর্মনের রাজ্য ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে আরব সাগর এবং উত্তরে হিমালয় হইতে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যশোধর্মন রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মান্দাসোরের রাজবংশের রাজত্বকাল শেষ হয়। অনেকের মতে যশোধর্মন ও 'শকারি বিক্রমাদিত্য'

একই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যশোধর্মন কখনও শকদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই এবং উজ্জয়িনীতে তাঁহার রাজধানী ছিল না।

গুপ্তোত্তর আমলে বঙ্গদেশ: শশাঙ্ক

(ক-২) বঙ্গদেশের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত ছিল। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব নামে তিনজন রাজা সম্ভবতঃ পতনশীল গুপ্ত সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীর বঙ্গদেশ

গৌড়রাজ শশাঙ্ক : স্বাধীন ও সার্বভৌম গৌড়ের উত্থান সম্পূর্ণ হইয়াছিল মহারাজ শশাঙ্কের নেতৃত্বে। আনুমানিক ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক নামে এক পরাক্রমশালী বীর গৌড়বঙ্গের রাজা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি প্রথম জীবনে শেষ গুপ্ত রাজাদের সামন্তরাজা বা সেনাপতি ছিলেন। শেষ গুপ্তরাজার (মহাসেন গুপ্ত) দুর্বলতার সুযোগে তিনি স্বাধীন গৌড়বঙ্গ রাজ্যের অধিপতি হইয়া বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার 'কর্ণসুবর্ণ' নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমে বারাণসী এবং দক্ষিণে আধুনিক গঞ্জাম প্রদেশ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রাঢ় ও দক্ষিণ বঙ্গের দন্ডভূক্তি (দাঁতন) তাঁহার সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজ্য বিস্তারে থানেশ্বর এবং কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। মালবরাজ দেবগুপ্তকে মিত্রে পরিণত করিয়া শশাঙ্ক মৌখরীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দেবগুপ্ত মৌখরীরাজ গ্রহবর্মাকে পরাজিত এবং নিহত করিয়া কনৌজ অধিকার করিয়া লইলেন। গ্রহবর্মা থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্ধন ভগ্নীপতি-হন্তা দেবগুপ্তকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। এই যুদ্ধে দেবগুপ্তের শোচনীয় পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও গৌড়রাজ শশাঙ্কের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হইলেন। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়বঙ্গাধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে মন্ত্রী ভান্ডিকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। কামরূপের (আসামের) রাজা ভাস্করবর্মার সহিত অধীনতামূলক মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়া হর্ষবর্ধন তাঁহাকে সপক্ষে আনয়ন করেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল বলিয়া জানা যায়। বঙ্গাধিপ শশাঙ্কের সার্বভৌমত্বের পরিচায়ক 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়।

হর্ষবর্ধনের সহিত গৌড়াধিপ শশাঙ্কের সংঘর্ষের অপর কারণ ছিল ধর্মনৈতিক। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী ছিলেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ আছে। ডঃ আর. এস. ত্রিপাঠীর মতে শশাঙ্ক কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

ধর্মমত

শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় ৬৩৫ অব্দে (মতান্তরে ৬৩৭) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। পাল বংশের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এই অরাজকতা অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল।

(ক-৩) **কনৌজের সাম্রাজ্যবাদ ঃ** গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যজনিত কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত 'থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ' শাসিত রাজ্য ছিল তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

হর্ষবর্ধনের সিংহাসন আরোহণ

পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন, গৌড়বঙ্গের অধিপতি শশাঙ্ক এবং মালবরাজ দেবগুপ্তের মিলিত শক্তির সহিত যুদ্ধে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের এই আকস্মিক মৃত্যুতে একদিকে থানেশ্বর রাজ্যের এবং অপরদিকে তাঁহার জামাতা গ্রহবর্মার মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসন শূন্য হয়। উভয় রাজ্যের মন্ত্রিগণ একযোগে রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী হর্ষবর্ধনকে উভয় রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে যুগপৎ কনৌজ এবং থানেশ্বর উভয় রাজ্যেরই রাজা হন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য এই বৎসর হইতে হর্ষাব্দ আরম্ভ হয়।

হর্ষবর্ধন ঃ সিংহাসন লাভের পর কয়েক বৎসর (ছয় বৎসর) হর্ষবর্ধন 'যুবরাজ শীলাদিত্য' নাম ধারণ করিয়া রাজ্য-পরিচালনা করিয়াছিলেন। ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন 'সম্রাট' উপাধি ধারণ করিয়া ঐক্যবদ্ধ থানেশ্বর এবং কনৌজের অধীনে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল কনৌজ। হর্ষবর্ধনের শাসনাধীন এই সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ঐতিহাসিকগণ এই যুগকে 'কনৌজ সাম্রাজ্যের যুগ' (**'The Age of Imperial Kanouj'**) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দুই মিলিত রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য এবং ভ্রাতৃহন্তাকে শাস্তি দিবার জন্য গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার মিত্রতা এবং সাহায্য

লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই যুদ্ধের কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ জানা যায় না। 'হর্ষ-চরিত' প্রণেতা বাণভট্টও এই বিষয়ে নীরব। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্মার নিধানপুর তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ আছে।

বঙ্গেশ্বর শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ
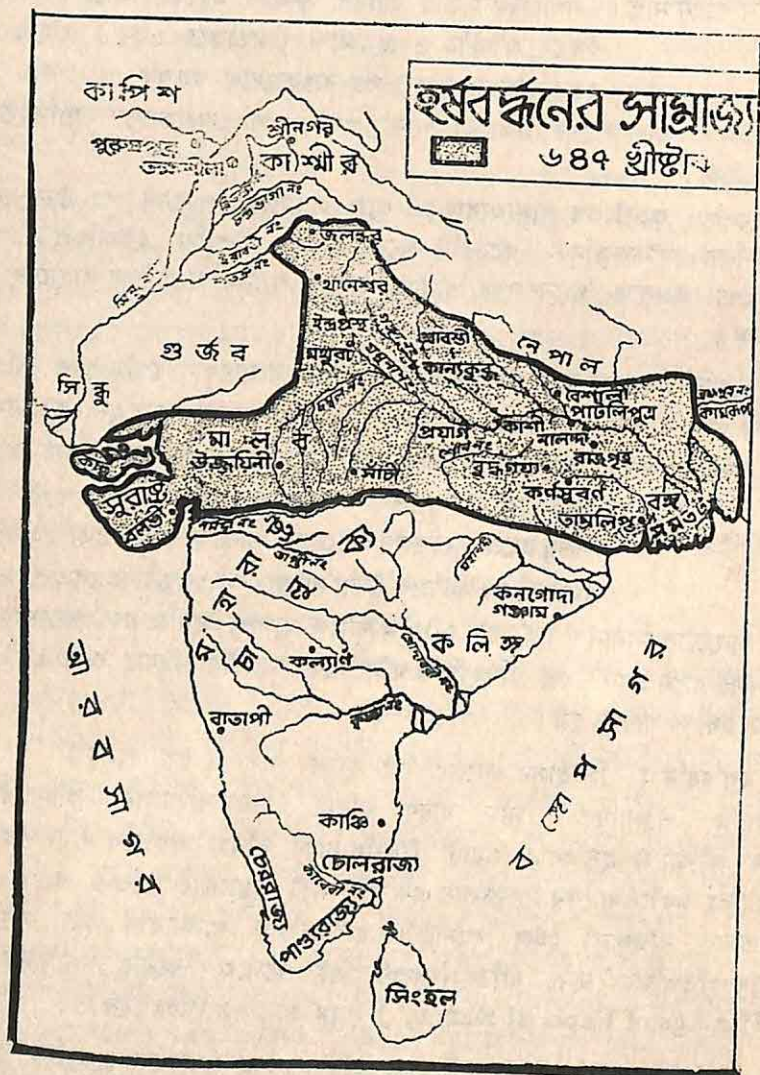
ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে হর্ষবর্ধন বন্দিদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। গৌড়রাজ শশাঙ্কের সহিত দীর্ঘদিন যুদ্ধ করিবার পর পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ তিনি

অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। হিউয়েন সাঙের মতে, ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে (?) হর্ষবর্ধন কঙ্গোদ (বর্তমান গঞ্জাম প্রদেশ) জয় করিয়াছিলেন। চৈনিক দূত মা-তোয়ান-লিনের সাক্ষ্য অনুসারে তিনি মগধ জয় করিয়া 'মগধাধিপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম বলভীর রাজা ধ্রুবসেনের রাজ্যও তিনি সাময়িকভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙের মতে, বলভীর সঙ্গে কনৌজের সম্পর্ক দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে তিনি বলভীরাজের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কচ্ছ ও দক্ষিণ কাথিয়াবাড় রাজ্যও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সিন্ধু এবং কাশ্মীরের বিরুদ্ধে তিনি সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয়ের উদ্দেশ্যেও হর্ষবর্ধন এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়া চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট নর্মদা নদী তীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সৈন্যবাহিনীসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়

হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা পূর্বে কামরূপ (আসাম) হইতে পশ্চিমে কাথিয়াবাড়, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁহার শাসনাধীনে না আসিলেও উত্তর-ভারতে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ যে তাঁহার শাসনাধীনে আসিয়াছিল সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষবর্ধনকে 'পঞ্চ ভারতের' (Five Indies) অধীশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পানিক্কর প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য কেবল উত্তর-ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহার আমলে সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটায় সাম্রাজ্যিক কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যায়।

রাজ্যসীমা

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ : হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া পরবর্তী চৌদ্দ বৎসর কাল তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার বিবরণীতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার এই বিবরণীর নাম 'সি-ইউ-কি'।

হিউয়েন-সাঙ উত্তর-ভারতের প্রসিদ্ধ নগরগুলি যথা কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, পাটলিপুত্র এবং কনৌজ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই শহরগুলি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। হিউয়েন-সাঙ্ বলিয়াছেন, উত্তর-ভারতের পথঘাট বিশেষ নিরাপদ ছিল না। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। দেশে নানা ধরনের অপরাধের কথা এবং অপরাধীর শাস্তিদান-নীতি সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ লোকেরা ধর্মভীরু ছিল।

হিউয়েন-সাঙ্ বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেশের উন্নতি হইয়াছিল। সেই সময় ভারতীয়গণ দেশ-দেশান্তরের সহিত ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্বদিকে বাংলার তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) অপর একটি প্রধান বন্দর ছিল। সেখান হইতে চীন এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত সামুদ্রিক পথে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রের ব্যয়-নির্বাহের জন্য কৃষকদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। বাণিজ্য দ্রব্যের উপর আরোপিত শুল্ক (customs duty) হইতেও রাষ্ট্রের অনেক আয় হইত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

হিউয়েন-সাঙ্ নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষা নীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি নিজে কয়েক বৎসর নালন্দায় বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নালন্দা সেই সময় ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। তক্ষশীলা ছিল সে যুগে প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্র। চৈনিক পরিব্রাজকের পরিদর্শনের সময়ে ইহার পূর্ব-গৌরব কিছুটা হ্রাস পাইলেও তখন পর্যন্ত তক্ষশীলায় বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। মহাযান সম্প্রদায়ের বহু বৌদ্ধ পন্ডিত সেখানে বসবাস করিতেন।

নালন্দা ও তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর-ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়া চৈনিক পরিব্রাজক তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজে চড়িয়া দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে দাক্ষিণাত্যের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সম্রাট্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজ দরবার

হিউয়েন-সাঙ্ হর্ষবর্ধনের ধর্মমত, রাজ্য শাসন প্রণালী, ব্যক্তিগত চরিত্র ও কৃতিত্ব প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন কনৌজে ধর্মমহাসভা আহ্বান করিতেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগের তীর্থক্ষেত্রে মেলা বসিত। প্রয়াগের এই মেলায় বা দানক্ষেত্রে রাজা মুক্তহস্তে তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ বিতরণ করিতেন।

প্রয়াগের তীর্থক্ষেত্র

(ক-৪) **প্রতিহার রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :** প্রতিহারদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণের বংশোদ্ভূত ছিলেন। কোন কোন আধুনিক ও ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে প্রতিহারগণ গুর্জর জাতির একটি শাখা। গুর্জরগণ পাঞ্জাব, মারোয়াড় এবং ব্রোচ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন ষষ্ঠ শতকে। সপ্তম শতকের প্রথমভাগে রচিত বাণভট্টের হর্ষ-চরিতে এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণে গুর্জর-প্রতিহারদের উল্লেখ আছে। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলালিপিতেও গুর্জরদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে

কোন কোন গুর্জর দলপতি রাষ্টকূট রাজাদের দ্বাররক্ষক বা প্রতিহারী রূপে কার্য করিতেন। উজ্জয়িনীতে যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তদনুযায়ী তাঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি হয় প্রতিহার। যেহেতু লক্ষ্মণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের দ্বার রক্ষা করিতেন। প্রতিহারগণ লক্ষ্মণকে তাঁহাদের আদি পিতারূপে দাবি করেন।

গুর্জর-প্রতিহার বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বৎসরাজ। তিনি অবন্তীর শাসক ছিলেন। উজ্জয়িনীর নিকটে অবন্তী রাজ্য ছিল। তিনি গুর্জর-প্রতিহারদের বিভিন্ন শাখার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বাংলাদেশের পালবংশীয় রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজপুতানায় বিতাড়িত করেন। এই সময় হইতেই উত্তর-ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্টের সময় প্রতিহার রাজ্য সাম্রাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়। তিনি সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গ রাজ্যের রাজাদের উপর স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিবার পর কনৌজ আক্রমণ করেন এবং বঙ্গাধিপতি ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করিয়া তথায় (কনৌজে) নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি ধর্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং নিজে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।

(ক-৫) পাল সাম্রাজ্যের উত্থান : শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য ছিল না। অভ্যন্তরীণ অনৈক্যজনিত কলহে সারা দেশে যে চরম অরাজকতা দেখা দিয়াছিল তাহাকে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকগণ 'মাৎস্য-ন্যায়' অর্থাৎ সবলের দ্বারা দুর্বলের উপর পীড়ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অরাজকতার ইতিহাসের কোন প্রামাণ্য বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। যতদূর জানা যায়, হর্ষবর্ধনের পর কনৌজরাজ যশোবর্মন এবং তারপর কাশ্মীরের ললিতাদিত্য এই সময়ে বাংলাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অরাজক অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে 'গোপাল' নামে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে বঙ্গবাসীগণ রাজা নির্বাচিত করেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে এই নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গোপালই ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাল বংশের স্থাপয়িতা।

বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা

পাল বংশের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য রাজা : পাল বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন গোপাল। খালিমপুর শিলালিপি অনুসারে গোপাল ছিলেন দয়িতবিষ্ণুর পুত্র এবং বপাটের পৌত্র। পরবর্তী যুগের একাধিক তাম্রলিপিতে পাল রাজাদের সূর্য বংশীয় মান্ধাতা পরিবার উদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে সন্ধ্যাকর নন্দী এবং লামা তারানাথের মতে ইঁহারা ছিলেন সামুদ্রিক ক্ষত্রিয়। আবুল ফজল পাল রাজাদের কায়স্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাসভূমি নাকি বারেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গে ছিল। ইঁহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

গোপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ধর্মপাল। ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁহার সময় হইতে উত্তর-ভারতে পাল-রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার বংশের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব শুরু হয় (৭৭০-৮১৫ খ্রীঃ)। ধর্মপাল পাল রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যের রূপ দেওয়ার চেষ্টায় পশ্চিমদিকে রাজ্যসীমা বিস্তারের চেষ্টা করেন। অপরদিকে গুর্জর-প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজ পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন, ফলে ধর্মপালের সহিত তাঁহাকে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয়। অনেকে মনে করেন, এই দ্বন্দ্বে বৎসরাজ জয়লাভ করিয়াছিলেন। তবে এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব আকস্মিকভাবে পূর্ব-ভারতে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করিবার ফলে বৎসরাজ এবং ধর্মপাল উভয়েই পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপাল পুনরায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ধর্মপালের পক্ষে রাষ্ট্রকূট বিজয়ের একটা সুফল হইল এই যে পশ্চিমের গুর্জর-প্রতিহার আক্রমণের হাত হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ ছিল 'কনৌজ' সাম্রাজ্যের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা।[১] বংশানুক্রমিকভাবেই তিন বংশের দ্বন্দ্বকে নিম্নলিখিত আকারে দেখান যায়ঃ

ধর্মপাল
(৭৭০-৮১৫ খ্রীঃ)

ত্রিপাক্ষিক সংঘর্ষের কালানুক্রমিক রূপঃ

রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের মৃত্যু এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-বিরোধী শক্তিজোট তৈয়ারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রকূট আধিপত্য সাময়িকভাবে লোপ পায়। ধর্মপাল বিনা

(১) Vide : Ancient India, p. 283

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তর-ভারতে আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ পান। তিনি একে একে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যবন, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া আর্যাবর্তে তাঁহার সার্বভৌম অধিকার স্থাপন করেন। বিজয়ী ধর্মপাল কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। এইভাবে পূর্বে বঙ্গদেশ (পূর্ববঙ্গ) হইতে পশ্চিমে পূর্ব-পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ধর্মপালের বিজয়াভিযান

কিন্তু নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিহার শক্তির পুনরভ্যুত্থানের ফলে ধর্মপালের সার্বভৌম প্রাধান্য বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট পিতৃ-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি প্রথমে ধর্মপালের আশ্রিত কনৌজরাজ চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিলেন এবং পরে মুঙ্গেরের নিকট যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু এইবারেও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ আকস্মিকভাবে উত্তর-ভারতে আবির্ভূত হইয়া নাগভট্টকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপাল স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে পুনরায় সচেষ্ট হইলেন। অল্পকালের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের পরাজিত করিয়া তিনি উত্তর-ভারতে তাঁহার সার্বভৌম অধিকার পুনঃস্থাপন করিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ধর্মপাল উত্তর-ভারতে তাঁহার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের উত্তর-ভারত বিজয়

ধর্মপালের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন

দেবপাল (৮১৫-৮৫৪ খ্রীঃ): পিতার মৃত্যুর পর দেবপাল ৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি হূণ-গুর্জর-প্রতিহার, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, উৎকলের রাজা জয়পাল এবং কামরূপ বা আসামের রাজাকেও তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক লিপিতে উল্লেখ আছে। হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য সীমা বিস্তৃত ছিল।

দেবপালকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাঁহার সময়ে এই বংশের গৌরব চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার খ্যাতি মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্র বংশের মহারাজ বালপুত্রদেব তাঁহার কাছে দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং নালন্দায় একটি মঠ নির্মাণ করিয়া তাহার খরচ চালাইবার জন্য পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাল বংশের গৌরবময় যুগের অবসান হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন অযোগ্য, অকর্মণ্য এবং সুবৃহৎ রাজ্য শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

পাল বংশের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রাজা প্রথম মহীপালের আমলে কম্বোজ নামে জাতি বাংলাদেশ আক্রমণ করে। মহীপাল এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কম্বোজগণের সঠিক পরিচয় এখনও অজ্ঞাত।

প্রথম মহীপাল বারাণসী পর্যন্ত পাল রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু কলচুরি এবং চোলগণ তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে রাজ্যবিস্তারে বাধা দিয়াছিলেন। চোল বংশীয় রাজেন্দ্র চোলদেব বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া বাংলাদেশের কতকাংশ দখল করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু চোলদের রাজনৈতিক প্রভাব উত্তর-ভারতে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। মহীপালের নামের সহিত অনেক দীঘি এবং নগরের নাম জড়িত আছে।

তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মহীপাল অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। অনেকে মনে করেন তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রজারা 'দিব্য বা দিব্বোক' নামে এক কৈবর্ত নেতার অধীনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তর বঙ্গে এই বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। বিদ্রোহীরা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করিয়া দিব্বোককে রাজপদ দান করিয়াছিল। দিব্বোকের মৃত্যুর পর রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম। সমকালীন কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রাম-চরিত' নামক কাব্যে এই বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে বিদ্রোহী কৈবর্ত নেতারা বেশীদিন ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল ভীমকে পরাজিত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশেরকোন শাসনদক্ষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন না। অবশেষে দাক্ষিণাত্য হইতে আগত কর্ণাটক ব্রাহ্মণ বংশীয় বিজয় সেন নামক জনৈক সামন্ত পাল রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া সেন বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

দিব্বোকের বিদ্রোহ

সেন বংশ ঃ দ্বাদশ শতকে পাল বংশের পতনের পর দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটক ব্রাহ্মণগণ বাংলাদেশে সেন বংশ নামে এক নূতন রাজবংশের পত্তন করেন। সামন্ত সেন এবং তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন পালরাজাদের সামন্ত রাজা ছিলেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন ছিলেন সেন রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা।

সেন বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ঃ বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। তিনি কামরূপ (আসাম), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) প্রভৃতি জয় করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার বিজয়পুর নামে একটি নূতন নগরের পত্তন করিয়া তিনি সেখানে রাজাধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

বল্লাল সেন ঃ বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) সামাজিক ক্ষেত্রে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষায়

সুপণ্ডিত ছিলেন। 'দানসাগর' নামে স্মৃতি শাস্ত্রের একটি বই এবং 'অদ্ভুতসাগর' নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অপর একটি বই তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গৌড়, নবদ্বীপ এবং রামপাল (বিক্রমপুর পরগনায়)—এই তিনটি জায়গায় তাঁহার রাজধানী ছিল। সম্প্রতি নবদ্বীপে বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদের ঢিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা তাঁহার বর্ধিত রাজ্যসীমার পরিচয় বহন করে।

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) ঃ সেন বংশের তথা বাংলাদেশের শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। পরবর্তীকালের লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইনি পুরী, বারাণসী এবং প্রয়াগ জয় করিয়াছিলেন। বিজিত স্থানগুলিতে তিনি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার মতই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিতার অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থটি তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। 'গীতগোবিন্দ' প্রণেতা প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীগণ তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। সমসাময়িক প্রসিদ্ধ জ্ঞানী পণ্ডিত হলায়ুধ ছিলেন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও বিচারপতি। তাঁহার রাজধানী ছিল মালদহ জেলার গৌড় হইতে কিছুদূরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণাবতী নামক নগরে।

কথিত আছে, লক্ষ্মণ সেনের বৃদ্ধাবস্থায় মুসলমানগণ উত্তর-ভারত জয় সমাপ্ত করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আনুমানিক ১২০৩-১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণকারী মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন্ বখতিয়ার খল্‌জী আরবী অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশে কৌশলে নদীয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং অধিকার করিয়া নেন।

(খ) দাক্ষিণাত্য ঃ

দাক্ষিণাত্যের রাজবংশাবলী : (রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত)

(খ-১) চালুক্য রাজবংশ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে যখন শশাংক, হর্ষবর্ধন এবং যশোধর্মন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দক্ষিণ ভারতে তখন বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত বিজাপুর জেলার বাতাপি বা বাদামী নামক কানাড়ী ভাষাভাষী অঞ্চলে চালুক্যগণ একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করিয়াছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম পুলকেশী বাতাপি বা বাদামীতে স্বাধীন চালুক্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই চালুক্য বংশের আদি-ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। চালুক্যগণ ছিলেন অযোধ্যার এক ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর। পরবর্তীকালে বাদামী ছাড়া মহারাষ্ট্রের কল্যাণেও এই জাতির একটি শাখা-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাদামী বা বাতাপির চালুক্য বংশ ঃ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুলকেশী ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাদামী ছিল এই রাজ্যের

রাজধানী। তিনি একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মণ ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উত্তর-কোঙ্কন, কানাড়া প্রভৃতি জয় করিয়া নিজের রাজ্য-সীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মঙ্গলেশ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি কোঙ্কন উপকূলে রত্নাগিরি জেলা অধিকার করিয়া কলচুরিদের বশীভূত করিয়াছিলেন। তারপর রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী। তিনিই ছিলেন চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

আদি পল্লবরাজগণ

(খ-২) দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রথম কৃতিত্ব হইল তিনি বিদ্রোহী সামন্তরাজগণকে এবং প্রতিবেশীদের দমন করেন। ইহার পর তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়া উত্তর কানাড়ার কদম্বরাজ, মহীশূরের গঙ্গরাজ এবং কোঙ্কনের মৌর্যরাজকে পরাজিত করিয়া চালুক্য রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তিনি তৎকালীন উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা হর্ষবর্ধনের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য অভিযান তাঁহার দ্বারাই প্রতিহত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। হর্ষবর্ধন নর্মদা নদীর তীরে তাঁহার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। সুদূর দক্ষিণের চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলিকে তিনি চালুক্য রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী

হিউয়েন-সাঙ্ তাঁহাকে তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে পল্লব ও চালুক্যদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া তিনি ভেঙ্গী নামক স্থানটি দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পূর্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্যবিপর্যয়ে চালুক্য রাজশক্তির প্রাধান্য সাময়িকভাবে লোপ পায়। কিন্তু দীর্ঘদিনের চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্ব ইহার পরও চলিয়াছিল। কথিত আছে, পল্লব-রাজ নরসিংহবর্মন বাতাপি (বা বাদামী) ধ্বংস করিয়া স্বহস্তে পুলকেশীকে নিধন করিয়াছিলেন।

পল্লব-চালুক্য দ্বন্দ্ব

দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর নিকট রাজদূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীনের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক ছিল বলিয়া জানা যায়।

বৈদেশিক সম্পর্ক

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য (৬৫৫-৬৮০ খ্রীঃ) বাতাপির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃহন্তা নরসিংহ-বর্মনকে পরাজিত এবং কাঞ্চী অধিকার করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর রাজা হইলেন বিনয়াদিত্য। তিনিও পল্লবরাজগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ উত্তর-ভারতের কোন গুপ্তরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা বিজয়াদিত্যও কাঞ্চীর পল্লবগণের সহিত

যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। চালুক্য বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। ইনি পল্লব রাজাকে পরাজিত করিয়া সাময়িকভাবে পল্লব রাজধানী অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। চোল, পান্ড্য এবং মালাবারের অধিবাসীরাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তিনি সিন্ধুবিজয়ী আরবগণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া স্বদেশ রক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কাঞ্চীর সুবিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দিরের অনুকরণে রাজধানী বাতাপিতে বিরূপাক্ষ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

চালুক্য বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণের (৭৪৩-৭৫৩ খ্রীঃ) সময় রাষ্ট্রকূট বংশীয় দন্তিদুর্গ চালুক্য বংশের (বাতাপির) উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

(খ-৩) **রাষ্ট্রকূট রাজবংশ :** ভারতের অনেক রাজবংশের মত রাষ্ট্রকূটগণের উদ্ভবও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোন কোন পন্ডিত কিংবদন্তী খ্যাত সাত্যকি নামে যাদব বংশীয় জনৈক নেতার বংশধর বলিয়া রাষ্ট্রকূটদের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার অনেক ঐতিহাসিক রাষ্ট্রকূটগণকে অশোকের অনুশাসনে উল্লিখিত রাঠকগণের বংশধর বলিয়া মনে করেন। আধুনিক অনেক গবেষক রাষ্ট্রকূটগণকে অন্ধ্রপ্রদেশের চাষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্য রাজাদের অধীন সামন্ত ছিলেন।

উৎপত্তি

ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল সম্ভবতঃ কর্ণাটকে এবং মাতৃভাষা কানাড়ী। কিন্তু সাধারণতঃ রাষ্ট্রকূটদের মান্যখেটের (হায়দ্রাবাদ ? মহারাষ্ট্র ?) রাষ্ট্রকূট বলিয়া অভিহিত করা হয়। সম্ভবতঃ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিদুর্গ বাতাপির শেষ চালুক্য রাজাকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্রের মান্যখেটে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চী, কলিঙ্গ, দক্ষিণ কোশল, মালব প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালনা করিয়া দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ইহার পর রাজা হইলেন যথাক্রমে প্রথম কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় গোবিন্দ। প্রথম কৃষ্ণ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কৃষ্ণ ছিলেন অকর্মণ্য এবং অযোগ্য। তাই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হইলেন ধ্রুব। ইনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী রাজ্য-বিজয়ী বীর। গুর্জর-প্রতিহার রাজ, বৎসরাজ এবং পালবংশীয় রাজা ধর্মপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল হইতে রাষ্ট্রকূটগণ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিরূপে পরিগণিত হন।

ধ্রুবের পরবর্তী তৃতীয় গোবিন্দ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব তাঁহার সময়ে তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। তারপর রাজা হইলেন প্রথম অমোঘবর্ষ। তিনি ষাট বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর-ভারতের বঙ্গদেশ পর্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মান্যখেটে স্থায়িভাবে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তিনি অমর কীর্তির অধিকারী ছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দ এবং অমোঘবর্ষ

অমোঘবর্ষের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ রাজা হন। তিনি প্রতিহাররাজ ভোজ এবং ভেঙ্গীর চালুক্য রাজাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্তী রাজাগণ, তৃতীয় ইন্দ্র, চতুর্থ গোবিন্দ, পঞ্চম কৃষ্ণ প্রভৃতি ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির। সেইজন্য রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িল। এই সময়ে পরমার বংশীয় রাজা হর্ষ মান্যখেটে সাময়িকভাবে অধিকার করিয়া রাষ্ট্রকূট শক্তির উপর চরম আঘাত হানিলেন। অবশেষে এই বংশের শেষ রাজাকে চালুক্যবংশীয় তৈলপ বা দ্বিতীয় তৈল পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূট শাসনের পরিবর্তে চালুক্য শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পরবর্তী রাষ্ট্রকূটরাজ গণ

(খ-৪) পরবর্তী চালুক্যগণ কল্যাণের চালুক্য বংশঃ কল্যাণের চালুক্য বংশ বাতাপির চালুক্য বংশের একটি শাখা ছিল। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বাতাপির চালুক্য বংশের দ্বিতীয় তৈল বা তৈলপ রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ রাজা কার্ককে পরাজিত করিয়া এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত কল্যাণ (বা কল্যাণী) ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। দ্বিতীয় তৈল চালুক্য বংশের হৃতরাজ্যের কতকাংশ পুনরুদ্ধার করিয়া 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় তৈলের পর যথাক্রমে সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য, দ্বিতীয় জয়সিংহ, প্রথম সোমেশ্বর রাজত্ব করেন। তাঁহারা পরমার, কলচুরি, চোল প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। প্রথম সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁহার সভাকবি বিহ্লন-রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেব' নামক গ্রন্থে তাঁহার সামরিক প্রতিভা ও রাজ্যজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১২৬ (মতান্তরে ১১২৮) খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজা তৃতীয় সোমেশ্বর এবং তৃতীয় তৈলের রাজত্বকালে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং হোয়সল ও যাদবদের আক্রমণে চালুক্য রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটে। প্রদীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে জ্বলিয়া উঠিবার মতই ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে কল্যাণের চালুক্য বংশ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য সমসাময়িক চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল কুলোতুঙ্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি পাল বংশের রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কিছু অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহীতার জন্যও তাঁহার খ্যাতি ছিল। কবি বিহ্লন এবং হিন্দু আইন 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কল্যাণের চালুক্য বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কৃতিত্ব

(গ) দক্ষিণ ভারতঃ

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে কাঞ্চীর পল্লভ বংশ এবং তাঞ্জোরের চোল রাজবংশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া

আছে। দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস উত্তর-ভারতের মতই সুপ্রাচীন। উত্তর-ভারতের মত দক্ষিণ ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক রাজবংশের অধীনে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাঞ্চীর পল্লভ বংশ ও তাঞ্জোরের চোল বংশ সেইরূপ দুইটি স্বাধীন রাজ্য দীর্ঘকাল শাসন করিয়াছিল।

(১) কাঞ্চীর পল্লভ বংশ : খ্রীষ্ট্রীয় তৃতীয় শতকের প্রথমার্ধে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চী নগরকে কেন্দ্র করিয়া পল্লভ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পল্লভদের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন পল্লবণ ও পারস্যের পহ্লব বা পার্থিয়ানগণ অভিন্ন। কিন্তু শুধু 'পল্লব' ও 'পল্লভ' নামের সাদৃশ্য থাকার জন্য এইরূপ মনে করা মারাত্মক ভুল হইবে। পল্লভ রাজাদের দলিলপত্রে কোথাও পল্লব-দের নামের উল্লেখ নাই। ডক্টর জয়সওয়ালের মতে পল্লভগণ ছিলেন উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্মী বাকাটক বংশের শাখা। কিন্তু 'তালাগুন্ডা-লিপি'তে পল্লভগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে পল্লভগণ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় অধিবাসী। আবার কাহারো কাহারো মতে পল্লভগণ ছিলেন চোল-নাগ বংশসম্ভূত। কিন্তু চোল ও পল্লভদের মধ্যে বংশগত শত্রুতা হইতে উক্ত মত প্রমাণিত হয় না। পল্লভগণ উত্তর-ভারত হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাঁহাদের গ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং উত্তর-ভারতীয় রাজাদের মত অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন।

পল্লভদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

পল্লভ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিবস্কন্দবর্মন। তিনি কাঞ্চী এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ লইয়া তাঁহার রাজ্য স্থাপন করেন। চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে পল্লভরাজ বিষ্ণুগোপের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে সিংহবিষ্ণু পল্লভ রাজ্যের সীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি চোল, পান্ড্য এবং চের রাজাদের ও সিংহলের রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রবর্মার সময়ে দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য স্থাপন বিষয়ে চালুক্যদের সহিত পল্লভদের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ শুরু হয়। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লভরাজ মহেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া ভেঙ্গী নামক স্থানটি অধিকার করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মহেন্দ্রবর্মার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম নরসিংহবর্মন এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি পল্লভ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া পরিগণিত। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন এবং 'বাতাপি কোন্ডা' উপাধি গ্রহণ

কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পল্লভ রাজার রাজনৈতিক ইতিহাস

করেন। ফলে, দক্ষিণ ভারতে পল্লভদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ তাঁহার সময়ে পল্লভ রাজধানী কাঞ্চীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়কার পল্লভ রাজ্যের এক মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি কাঞ্চী নগরীর জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং বৌদ্ধ ও জৈন মঠগুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য ও পল্লভদের মধ্যে সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হয়। এই সময়ে চালুক্যরাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লভরাজ প্রথম পরমেশ্বরবর্মনকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী অধিকার করেন। অষ্টম শতকে ধীরে ধীরে পল্লভ শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পল্লভরাজ নন্দীবর্মন পল্লভমল্লকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পল্লভ বংশের পতনের ইতিহাস সুস্পষ্ট। পল্লভ বংশের শেষ রাজা অপরাজিতকে পরাজিত করিয়া চোলরাজ আদিত্য পল্লভ রাজবংশের ধ্বংসাবশেষের উপর চোল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

(২) তাঞ্জোরের চোল রাজ্যের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত: কাঞ্চীর পল্লভ বংশের মত তাঞ্জোরের চোল রাজবংশের দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।

চোল রাজবংশ: চোল রাজ্য ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার রাজধানী ছিল তাঞ্জোর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতের এই সর্ব দক্ষিণ প্রান্তের রাজ্যটির অস্তিত্ব ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কাত্যায়নের গ্রন্থে, অশোকের শিলালিপিতে চোলগণকে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ উল্লিখিত আছে, কারিকল নামক জনৈক চোল-নায়ক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পার্শ্ববর্তী চের এবং পান্ডা রাজ্য জয় করিয়া এই রাজ্যের সীমা দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। **কারিকল** ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা। তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই চোল রাজ্যের ইতিহাসের সূত্রপাত হইয়াছে বলা যায়। চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে একদিকে পল্লভ শক্তির অভ্যুত্থান, অপর দিকে পান্ড্য রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি দুই কারণে চোল রাজ্য তাহার ক্ষমতার গৌরব হইতে বঞ্চিত হয়। এই সময়ে চোলগণ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিয়া পল্লব রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙ্ চোল রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইহা একটি জনবিরল এবং অরণ্যবহুল দেশ ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পল্লভ রাজারা দুর্বল হইয়া পড়িলে চোলগণ আবার নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে এবং ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য লাভ করিতে থাকে। নবম শতাব্দীতে বিজয়ালয় পল্লভদের অধীনতাপাশ হইতে চোলদের মুক্ত করেন। প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ) স্বাধীন চোল রাজ্যের

প্রাচীন ইতিহাস

রাজা ছিলেন। তিনি পল্লভরাজ অপরাজিতবর্মনকে পরাজিত করিয়া পল্লভ রাজ-শক্তির ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। প্রথম আদিত্যের পুত্র পরান্তকও (৯০৭-৯৫৩ খ্রীঃ) পিতার মত সমরকুশল নরপতি ছিলেন। তিনি সমসাময়িক পান্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়া পান্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরা অধিকার করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সহিত গঙ্গরাজের বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই সংঘর্ষে চোলেরা স্বাধীনতা হারায়।

(৩) এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **প্রথম রাজরাজ**। ইঁহার শাসন-কালে চোল বংশের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চের এবং পান্ড্য রাজাদের পরাজিত করিয়া চোলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কল্যাণের চালুক্যগণকেও পরাজিত করেন। কেবল দিগ্বিজয়ী বীররূপে নয়, ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপেও প্রথম রাজরাজ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। তিনি নিজে শৈব ছিলেন। তাহা হইলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রথম রাজরাজ

প্রথম রাজরাজের পুত্র **রাজেন্দ্র চোলদেব** এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন। তিনিও ছিলেন পিতার মতই বিজয়ী বীর। তিনি কল্যাণের চালুক্যরাজ, বাংলার পাল রাজবংশের মহীপাল, গঙ্গরাজ প্রভৃতি সমকালীন রাজাদের পরাজিত করিয়া 'গঙ্গাইকোন্ড' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিচিনপল্লীতে 'গঙ্গাইকোন্ড চোলপুরম্' নামক স্থানে তিনি একটি রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। তিনি নৌ-বাহিনীর সাহায্যে পেগু, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া চোল:বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলদেব
(১০১২-৪২ খ্রীঃ)

তিনি চীন সম্রাটের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং একাধিকবার তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। পরবর্তী চোলরাজগণ, যথা—প্রথম রাজাধিরাজ দ্বিতীয় রাজেন্দ্র, বীর রাজেন্দ্র, অধিকারেন্দ্র, রাজেন্দ্র কুলোতুঙ্গ প্রভৃতি ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির। তাঁহারা চোল বংশের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারেন নাই। চালুক্য রাজাদের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম এবং পান্ড্য, হোয়সল, কাকতীয় প্রভৃতি সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতি কারণে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোল রাজবংশের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। এই পতন রোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজির সুযোগ্য সেনাপতি মালিক কাফুর চোল রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন।

চোলরাজাদের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান। অষ্টম শতাব্দীতে সুমাত্রার শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার হিন্দু রাজবংশগুলির মধ্যে শৈলেন্দ্র বংশের

নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলদেবের সহিত শৈলেন্দ্র বংশের সংঘর্ষ ঘটে। চীনের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েও উভয় রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এই দুইটি বহির্বিশ্বের রাজ্যের সহিত গোড়ার দিকে সম্পর্ক ভাল ছিল। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলদেব একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী শৈলেন্দ্ররাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ররাজ বিজয়তঙ্গবর্মন পরাজিত ও বন্দী হন। ইহার ফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের কিছু অংশ চোলরাজার হস্তগত হয়। কোন ভারতীয় রাজা ইতিপূর্বে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এইরূপ সামরিক সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

সমুদ্র পরপারে অভিযান

চোল শাসন-পদ্ধতি ঃ চোলগণ কেবল দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন না, রাজ্যশাসন বিষয়েও তাঁহারা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। চোল রাজাদের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে তাঁহাদের রাজ্য শাসন প্রণালীর অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

চোলদের প্রাদেশিক প্রশাসনিক বিভাগের নাম ছিল **প্রদেশ** বা **মণ্ডল**। প্রত্যেক 'মণ্ডল' কয়েকটি জিলা বা 'নাড়ু'তে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক 'নাড়ু' বা 'কুট্টম' বিভক্ত ছিল কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিতে বা 'কুররম'-এ এবং প্রত্যেকটি 'কুররম' বিভক্ত ছিল কতকগুলি গ্রামে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া গ্রাম-সভা বা 'উর' ছিল। গ্রামের শাসনভার এই সভারই উপর ন্যস্ত ছিল। গ্রামের যাবতীয় শাসনকার্য 'অধিকারী' নামক কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ঐ সভার পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইত। এই সভার সদস্যরা গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা নির্বাচিত হইত। গ্রামের সমস্ত জমি তাহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিত। তাহারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে আদায় করিত। গ্রামবাসীদের বিচার-আচার ও শিক্ষা-ব্যবস্থার ভারও ন্যস্ত ছিল তাহাদের হাতে। সভার সভ্যগণ এক বৎসর অন্তর নির্বাচিত হইতেন। সভার অধিবেশন বসিত কোন মন্দির প্রাঙ্গণে কিংবা সার্বজনীন গৃহকোণে। চোল 'নগরম' এবং 'মণ্ডলম'-গুলিতে এই ধরনের এক সুন্দর স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিকগণও এই স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রশাসনিক বিভাগ —'মণ্ডল', 'কুট্টম' 'কুররম'

অনুশীলনী

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) যশোধর্মন কে ছিলেন? (খ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর কনৌজে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিত? (গ) শশাঙ্ক কোন্ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন? (ঘ) ভাস্করবর্মা কে ছিলেন? (ঙ) হর্ষবর্ধন কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (চ) হর্ষের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে কোন্ শক্তিশালী রাজবংশ রাজত্ব করিত? (ছ) দক্ষিণ ভারতে হর্ষের প্রধান

প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন ? (জ) হর্ষের রাজত্বকালে কোন্ পর্যটক ভারতে আসেন ? (মাঃ ১৯৭৭) (ঝ) হর্ষের সভাকবির নাম কি ? তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম কি ? (ঞ) 'কাদম্বরী' কাহার রচনা ? (ট) শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি ? (ঠ) শশাঙ্ক কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন ? (ড) প্রয়াগের মেলা কত বৎসর অন্তর হইত ? (ঢ) পাল বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ? (মাঃ ১৯৮৪) (ণ) মাৎস্য-ন্যায় কাহাকে বলে ? (মাঃ ১৯৭৮) (ত) বাংলায় মাৎস্য-ন্যায় কে দূর করেন ? (থ) পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ? (দ) ধর্মপালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম কর। (ধ) বালপুত্রদেব কে ? (ন) রামপাল-চরিত কাহার লেখা ? (প) মহীপালের নাম কিজন্য স্মরণীয় ? (ফ) লক্ষ্মণ সেন কোথাকার রাজা ছিলেন ? (ব) বল্লাল সেনের রচিত গ্রন্থগুলির নাম কর। (ভ) বল্লাল সেন কি সামাজিক প্রথার সৃষ্টি করেন ? (ম) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? (য) রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম কর। (র) পল্লভ রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল ? (ল) চোল রাজাদের মধ্যে দুইজন উল্লেখযোগ্য রাজার নাম কর। (ব) চোলদের রাজধানী কোথায় ছিল ? (শ) কোন্ চোল রাজা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিন্ন পাঠন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) হর্ষবর্ধনের সহিত গৌড়াধীপ শশাঙ্কের সংঘর্ষের বর্ণনা দাও। (খ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা বর্ণনা কর। (গ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যবিজয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (ঘ) হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ঙ) মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যজয় ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (চ) ধর্মপালের কৃতিত্ব কি ? (ছ) বিজয় সেন ও লক্ষণ সেনের রাজ্য বিজয় বর্ণনা কর। (জ) রাষ্ট্রকূট বংশের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে কি জান ? (ঝ) চালুক্য ও পল্লভ দীর্ঘ সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঞ) রাজেন্দ্র চোলদেবের বহির্বিশ্বে সমুদ্রপারে সম্প্রসারণ সম্বন্ধে কি জান ? (ট) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ঠ) কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে কি জান ? (ড) দ্বিতীয় নাগভট্ট এবং প্রথম ভোজের রাজত্বকাল আলোচনা কর।

৩। নাতিদীর্ঘ বর্ণনামূলক উত্তর দাও ঃ

(ক) পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট—এই ত্রিশক্তির সংঘর্ষ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(খ) পাল বংশের উল্লেখযোগ্য রাজাদের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
(গ) বাংলার ইতিহাসে সেন বংশের রাজাদের অবদান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(ঘ) দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রশ্নে পল্লভ ও চালুক্যদের সংগ্রাম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(ঙ) চোল রাজাদের দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাস ও রাজ্যশাসন প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
(চ) কনৌজের সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণতা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আলোচনা করিয়া দেখাও।

সপ্তম অধ্যায়

(ক-৭) সপ্তম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার বিবরণ

(১) হর্ষের রাজত্বকালে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা : খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে কনৌজের বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় হর্ষবর্ধনের অধীনে। তিনি উত্তর-ভারতের সার্বভৌম সম্রাটরূপে স্বীকৃত হওয়ায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক ঐক্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হয়। হর্ষের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ ভারত পরিভ্রমণ করেন। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার ঐতিহাসিক উপাদানরূপে হিউয়েন-সাঙের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিউয়েন-সাঙ্ বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের মূল গ্রন্থগুলির সন্ধানে তিনি ভারতে আসিয়া মোট চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে আট বৎসর কনৌজে হর্ষের অনুগ্রহে ও সখ্যতায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি কনৌজ ছাড়াও বারাণসী, শ্রাবস্তী, তাম্রলিপ্ত এবং দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও পল্লভ রাজ্যেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কনৌজের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে শহরটি ছিল সুন্দর, প্রশস্ত ও সুরক্ষিত। সেখানে বহু বৌদ্ধবিহার ও দেবমন্দির ছিল। মধ্যে মধ্যে ধর্ম সম্মেলন বসিত। কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধনের প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিকী মেলায় মুক্তহস্তে দান করার কথা হিউয়েন-সাঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন।

সপ্তম শতকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা হিউয়েন-সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায়

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ অনুযায়ী ভারতে সেই সময় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল। গুপ্ত রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ফলে বৌদ্ধ মঠগুলি অক্ষত ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) মঠের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম যে সেই সময় শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ছিল সে কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষিত লোকেরা সংস্কৃত ভাষার চর্চা করিত। মঠগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়া, সে যুগের বিখ্যাত দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়—বিহারের রাজগীরের নিকটবর্তী নালন্দায় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার প্রদেশে তক্ষশীলায় অবস্থিত ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা, শিক্ষার উচ্চমান, অধ্যাপকমণ্ডলীর পাণ্ডিত্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের নানা বিষয়ে পাঠগ্রহণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। ১৪০টি গ্রামের আয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হইত। প্রায় দশ হাজার ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে প্রবেশ করিতে হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে

শিক্ষা : নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হইত। 'দ্বার পণ্ডিত' নামধারী অধ্যাপক প্রবেশিকা পরীক্ষা লইতেন। অধ্যক্ষ মহাস্থবির ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা। নালন্দার অধ্যক্ষরূপে বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্রের নাম হিউয়েন-সাঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন।

তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব হইতে। গ্রীক ঐতিহাসিকেরা তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষের রাজত্বকালে তক্ষশীলার খ্যাতি বজায় ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ এখানে বৌদ্ধ মঠ দেখেন।

সে যুগে সাধারণতঃ নয় হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করার রীতি ছিল। হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিজ নিজ শ্রেণীভিত্তিক কর্ম করিত। কিন্তু পূর্ববৎ ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছিল। কনৌজের ব্রাহ্মণগণ হর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতার জন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন। বঙ্গদেশে সেই সময় মহারাজ শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়াছিল।

হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয় ছিল। বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না। সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিউয়েন-সাঙ্ ভারতীয়দের সাধুতা, সরলতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং (৬৭২-৬৭৮ খ্রীঃ) গ্রামসংঘ কর্তৃক কৃষিকার্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা : পাল বংশের রাজত্বের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিবরণীতে দেশবাসীর সামাজিক আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রশংসা করিয়াছিলেন। পাল যুগে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে বজায় ছিল। পাল যুগের সাহিত্য হইতে বাঙ্গালী জাতির সহজ ও সরল জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও শূদ্র—এই চারিটি শ্রেণীতে হিন্দুরা বিভক্ত ছিল। অসবর্ণ বিবাহ নিসিদ্ধ ছিল। নারীজাতির স্থান ছিল উচ্চে। পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল না। খাদ্যগ্রহণ প্রথা বর্তমান কালের মত ছিল। পোশাক-পরিচ্ছদে বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না। পুরুষরা ধুতি ও চাদর এবং মেয়েরা শাড়ী পরিধান করিত। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার ব্যবহার করিত। সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যগীত ও বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই থাকিত।

পাল যুগ বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ[১]। এই যুগে উত্তর-ভারতে বাংলার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ হইল শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে যে মাৎস্য-ন্যায়

(১) 'বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে ইহার (পাল সাম্রাজ্যের) অনুরূপ শক্তি বা সমৃদ্ধির পরিচয় ইহার পূর্বে বা পরে কখনই পাওয়া যায় নাই। —মজুমদার : বাংলার ইতিহাস

দেখা দিয়াছিল, পাল রাজারা তাহা দূরীকরণ করিয়া সুবৃহৎ এবং সুদৃঢ় সাম্রাজ্য স্থাপনপূর্বক অভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য স্থাপন এবং বৈদেশিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং আনুকুল্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী এবং সারনাথের বৌদ্ধ-সংঘ ও মহাবিহারগুলি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধতীর্থক্ষেত্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ধর্মপাল বিদ্যাচর্চ্চার পরম উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর বাংলার প্রসিদ্ধতম বৌদ্ধবিহার সোমপুরী মহাবিহার তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়াছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ তাঁহার অন্যতম কীর্তি। কথিত আছে যে, সেই যুগের শিল্পী ধীমান ও বীতপাল এই মহাবিহারটির নির্মাণ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই মহাবিহারটির ব্যয়ভারও ধর্মপাল বহন করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এখানে তিন সহস্রেরও অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর এখানকার অধ্যাপক ছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মহাবিদ্যালয়টির কীর্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়টিও তাঁহার সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে এই বিদ্যায়তনটিতে আলোচিত হইত।

বিক্রমশীলা মহাবিহার

ওদন্তপুরী মহাবিহার

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক জায়গায় ধর্মপাল সোমপুরী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে এই মহাবিদ্যালয়টির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সোমপুরী মহ বিহার

দেবপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নবনির্মিত ভবনের ব্যয়ভার বহন করিবার দায়িত্ব লইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি সুমাত্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে পাঁচটি গ্রাম এই মঠটিকে দান করিয়াছিলেন।

নালন্দার পৃষ্ঠপোষকতা

ধর্মে পালরাজারা বৌদ্ধ হইলেও পরধর্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা শুধু ধার্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না, জনকল্যাণকর শাসকও ছিলেন। পাল আমলে অনেক বড় বড় দীঘি, নগর, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল।

জনহিতকর কীর্তি

পালরাজারা সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যিক হরিভদ্র ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। 'চর্যাপদ' নামক বৌদ্ধ দোঁহা ও গান এই যুগে রচিত হইয়াছিল। লুই ও কাহ্নপদ এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। এই যুগের বৌদ্ধ ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণের ফলে সহজিয়া ধর্মমত গড়িয়া উঠে। চর্যাপদে ও কৃষ্ণের দোঁহায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী দ্বিতীয়

সাহিত্য

মহীপাল এবং রামপালের আমলে রামচরিত' কাব্য লিখিয়াছিলেন। দায়ভাগ নিবন্ধকার জীমূতবাহন, আয়ুর্বেদ গ্রন্থ প্রণেতা চক্রপানি দত্ত প্রভৃতি এই যুগের অন্যান্য বিখ্যাত লেখক ছিলেন। এই যুগে বৌদ্ধ চিত্রকলা ও স্থাপত্য ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নেপাল, তিব্বত, মালয়, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল।

চিত্রশিল্প

বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রেও এই যুগে বাঙ্গালীরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রাধান্য এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে বাঙ্গালী জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গরুর গাড়ী, ঘোড়া এবং পালকিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। দেবপালের সভায় সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেবের দূতপ্রেরণের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সেই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল। হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম অপর একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর ছিল। এই দুইটি বন্দর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত বাণিজ্য চলিত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

(৩) **সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর :** পাল যুগে ছিল বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রাধান্য ; কিন্তু সেন আমলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সেনরাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং সংস্কৃত ভাষার সম্প্রসারণ হইয়াছিল। বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়া পরবর্তী হিন্দু সমাজের জন্য একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় কাঠামো গঠন করিয়া গিয়াছেন। তবে একথা স্বীকার্য নয় যে বৌদ্ধ পাল যুগে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছিল এবং হিন্দু সংস্কৃতির বিলোপ সাধন হইয়াছিল। পাল আমলে যত বৌদ্ধ মঠ ও বিহার তৈয়ারী হইয়াছিল তাহার অপেক্ষাও বেশী হিন্দু ধর্ম-মন্দির, দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি তৈয়ারী হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের (বিশেষ করিয়া মহাযান ধর্মমতের) এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হইয়াছিল। সেন আমলে হিন্দু ধর্মের তথা সমাজের সংস্কার সাধন ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। তন্ত্রযান, বজ্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়াছিল মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম এবং পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণের ফলে।

ধর্ম

সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিগত শ্রেণীবিভাগ পাল আমলে যেমন ছিল, সেন আমলেও প্রায় ঠিক তেমনিই ছিল। শুধু ঊর্ধ্বতন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এবং বৃত্তিগত জাতিবিভাগ দৃঢ়ীভূত হওয়ার ফলে হিন্দু সমাজ আধুনিক রূপ ধারণ করিল। সমাজে ঊর্ধ্বতন শ্রেণীগুলির প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হইল। স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সংস্কার সেন যুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়।

জাতিবিভাগ

পাল যুগের সমাজ-ব্যবস্থা সেন যুগে পরিবর্তিত হইয়াছিল বল্লাল সেনের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে কুলীন শ্রেণী সৃষ্টি ও বিবাহের ক্ষেত্রে কঠোরতার ফলে। কুলীন শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ প্রথাও জনপ্রিয় ছিল। নৃত্য-গীত-বাদ্য জনপ্রিয় ছিল। কবি জয়দেবের পত্নী পদ্মাবতী লক্ষণ সেনের রাজসভায় নৃত্য পরিবেশন করিতেন।

অর্থনৈতিক অসন্তোষ

সেনরাজাদের শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি বীরভূমের কেন্দুবিল্বের জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও 'পদাবলী', ধোয়ী-রচিত 'পবনদূত', 'উমাপতিধর', 'হলায়ুধ' প্রভৃতির রচনাবলী সে যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেনরাজারা নিজেরাও সুপণ্ডিত ছিলেন। বল্লাল সেন 'আচার্যসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অদ্ভূতসাগর' নামে চারিটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উল্লেখ থাকে যে শেষোক্ত গ্রন্থ দুইখানি তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণ সেন সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

সাহিত্য

সেন যুগে পোড়ামাটির মূর্তি গঠনে বাঙ্গালী শিল্পীরা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই যুগের আবিষ্কৃত বিহার, মন্দির ও স্তূপ হইতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতির কথা জানা যায়। পটুয়াদের পটচিত্র অঙ্কনও এই সময়ে পরিলক্ষিত হয়। এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন শূলপাণি।

শিল্প

পাল ও সেন যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ পাল ও সেন যুগে রাজনৈতিক ঐক্য ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল। ঐ যুগের অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। ধান, পাট, ইক্ষু, সরিসা, কার্পাস প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। নানা রকমের গবাদি পশু গৃহস্থের সম্পদ ছিল। কৃষকগণ নির্দিষ্ট হারে রাজাকে ভূমি-রাজস্ব দিত। কৃষকদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। পাল ও সেন আমলে রাজকর্মচারীদিগকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর জমি দেওয়া হইত। ইহার ফলে সামন্ততন্ত্র তথা জমিদারী প্রথার ব্যাপক প্রসার হয়। ইহার ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত সামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সামন্ত শ্রেণীভুক্ত জমিদারগণ কৃষকদের উপর নানাপ্রকার কর চাপাইতেন। ফলে কৃষকদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে।

কৃষকশ্রেণীর মধ্যে কারিগর ও শিল্পীরা মাটির কাজ, ধাতুর কাজ এবং বয়নশিল্পে পারদর্শী হইয়া উঠে এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তাঁতিদের কাপড় ও মসলিনের দেশে ও বিদেশে চাহিদা ছিল।

পাল যুগে বহির্বিশ্বের সহিত যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হইয়াছিল, সেন যুগেও তাহা অব্যাহত ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চলিত। তাম্রলিপ্ত তখনও বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বাণিজ্যিক বন্দর

বহির্বাণিজ্য

ছিল। স্থলপথে নেপাল, তিব্বত, মধ্য এশিয়া এবং চীনের সহিত বাণিজ্য চলিত। বাংলার কার্পাস বস্ত্রের, বিশেষতঃ মসলিনের চাহিদা ছিল সর্বত্র। আরব বণিকগণ বাংলার বস্ত্রের এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য করিতেন।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে অনুমান করা যায় যে এই যুগে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নত ছিল বাঙ্গালীরা।

দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও অর্থনীতি ঃ দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তারলাভ করিবার পূর্বে দ্রাবিড় সভ্যতার একাধিপত্য ছিল। প্রাক্-আর্য যুগের অন্যান্য অধিবাসীর মত দ্রাবিড়গণও মাতৃপূজা, বৃক্ষ ও প্রকৃতির পূজা করিত। কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তার করেন। অনুমান করা হয় যে, বৈদিক যুগের শেষে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। মহাপদ্মনন্দ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোকের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সহিত উত্তর-ভারতের আর্য সভ্যতারও সেখানে প্রসার-লাভ ঘটে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন রাজাদের রাজত্বকালে আর্য সমাজের জাতিভেদ এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রসারলাভ করে। এই যুগে জীবিকার ভিত্তিতে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) সামন্ত বা শাসক শ্রেণী, (২) সরকারী আমলাতন্ত্র—যথা, অমাত্য, মহামাত্র প্রভৃতি, (৩) বৈদ্য বা চিকিৎসক, কৃষক, লেখক প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত শ্রেণী এবং (৪) স্বর্ণকার, চর্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি বংশগত কারিগর শ্রেণী। সাতবাহন রাজাদের আমল হইতেই দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন যুগে শ্রেণীবিভাগ

আর্য সভ্যতার পাশাপাশি দ্রাবিড় জাতির নিজস্ব সংস্কৃতিও পূর্ববৎ দক্ষিণ ভারতের চের, পান্ড্য ও তামিল ভূমিতে বিরাজ করিতে থাকে। তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্, কানাড়ি প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকেরা দ্রাবিড় সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট। তাহাদের সমাজ ছিল আদিতে মাতৃ-প্রধান এবং কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত এবং 'কো' নামক এক প্রধান দেবতার উপাসনা করিত। বহিরাগত আর্যরা তাহাদের অনার্য, দাস, দস্যু, রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এখনও আদি দ্রাবিড়গণকে ব্রাহ্মণগণ অস্পৃশ্য অনার্যজাতি বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন[১]।

দ্রাবিড় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

আর্যদের আগমনের ফলে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও বিস্তার লাভ ঘটে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও বিস্তৃতি ঘটে সেখানে। দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন রাজা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দী হইতে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের প্রভাব দাক্ষিণাত্যে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেন।

(1) M. N. Srinivas : Sanskritization and Westernization

সপ্তম শতাব্দী হইতে দক্ষিণ ভারতে ধর্ম আন্দোলন শুরু হয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের বিরুদ্ধে শৈব ও বৈষ্ণবগণ আন্দোলন শুরু করেন। শৈব ও বৈষ্ণব আন্দোলনের মূলে ছিল ভক্তিবাদ। শিব ও বিষ্ণুর উপাসকগণ যথাক্রমে 'নায়নার' ও 'আলভার' নামে পরিচিত ছিলেন। এই দুই সম্প্রদায় ছাড়াও বৈদান্তিক ধর্মপ্রচারকগণও হিন্দু ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, যমুনাচার্য ও মাধবাচার্যের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শৈব ধর্মপ্রচারে শংকরাচার্যের অবদান সর্বাধিক। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে মালাবার প্রদেশের নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈদিক সাহিত্যে অসাধারণ পন্ডিত ছিলেন। তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়া অদ্বৈত বেদান্ত মতের প্রচার করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি প্রধান মঠ স্থাপন করেন, যথা মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ, পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ এবং বদ্রিকাশ্রমের যোশী মঠ। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারে কুমারিল ভট্টের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বৈদিক যাগ-যজ্ঞের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রামানুজ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক ছিলেন। মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 'শ্রী' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাঁহার মতবাদ 'বৈশিষ্ট্য-দ্বৈতবাদ' নামে খ্যাত। তিনি প্রচার করেন যে 'ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়'। পরবর্তীকালে ভক্তি-আন্দোলন দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব আন্দোলন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে ধর্মান্দোলনের নেতৃবর্গ

অর্থনীতি : রাষ্ট্রকূট, চোল, চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশগুলির রাজত্বকালে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতিতে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট রাজাদের আরব বণিকদের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। চোল রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ-অভিযান পাঠাইয়া সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কৃষি ছিল অর্থনীতির মূলভিত্তি। তাহা ছাড়া, খনি-কর, জলকর প্রভৃতি উৎস হইতেও রাজস্ব আয় হইত। চোলরাজাগণ প্রজাদের মোট আয়ের এক-চতুর্থাংশ, রাষ্ট্রকূটগণ এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব আদায় করিতেন। দেশে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৃহৎ বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছিল। কৃষ্ণা, কাবেরী ও অন্যান্য নদী সেচকার্যের জন্য ব্যবহৃত হইত।

ক-৪) দক্ষিণ ভারতের শিল্প : চালুক্য শিল্প : চালুক্য রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাতাপিতে বিরূপাক্ষ মন্দির, এলিফ্যাণ্টার গুহাচিত্র প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। আইহোলের দুর্গামন্দিরও চালুক্য স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই যুগে যে উৎকর্ষ দেখা দিয়াছিল তাহা এই বংশের বিভিন্ন রাজার সাহিত্য কীর্তি এবং সভাকবিদের লেখা হইতে বুঝা যায়। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য নিজে রাজনীতি, বিচার, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন।

(ক-৫) পল্লভ বংশের রাজত্বকালে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ : পল্লভ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাঞ্চী তথা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটিয়াছিল। বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত শিল্পরীতি তাঁহাদের যুগেই প্রথম এদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

পল্লভ যুগে রাজধানী কাঞ্চীতে এবং অন্যান্য বহু স্থানে সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মামল্লপুর বা মহাবলীপুরমের মুক্তেশ্বর কৈলাস মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিচিনপল্লীতে নির্মিত মন্দিরগুলির কারুকার্য বিস্ময়জনক। পল্লভ স্থপতিগণ বড় বড় পাথর খোদাই করিয়া মন্দিরের কারুকার্য রচনা করিতেন। তাঁহাদের শিল্প-কৌশল আজিও দর্শকদের অভিভূত করে। মহাবলীপুরমের সপ্তরথ মন্দির যুগ যুগ ধরিয়া পল্লভ শিল্পকলার অবিনশ্বর স্বাক্ষর বহন করিতেছে। সপ্তরথের সাতটি রথই মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি চরিত্রের নামে নির্মিত হইয়াছিল।

(ক-৬) রাষ্ট্রকূট শিল্প : দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলায় রাষ্ট্রকূট বংশের অবদান অবিস্মরণীয়। রাষ্ট্রকূটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির তাঁহাদের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।[১] রাষ্টকূট রাজারা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহারা ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতা ও নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করিতেন। এই বংশের দ্বিতীয় রাজা প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বকালে ইলোরায় পাথর খোদাই করিয়া বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ভিনসেণ্ট স্মিথ এই মন্দিরকে "ভারতের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কাণ্ড" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই কৈলাসনাথ মন্দিরটি রাষ্ট্রকূট স্থাপত্যের অতুলনীয় নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। রাষ্ট্রকূট রাজাগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে কেহ কেহ জৈন ধর্মও গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট গৌরব প্রথম অমোঘবর্ষের আমলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। ইনি সমসাময়িক যুগের কবি ও সাহিত্যিকগণকে সমাদর করিতেন। ইনি নিজেও 'রত্নমালিকা' নামক একটি ধর্মগ্রন্থের রচয়িতারূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য

সাহিত্য

(ক-৭) চোল শিল্প : দক্ষিণ ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় যেমন চোলদের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে, তেমনি দাক্ষিণাত্যের শিল্প-রীতিতেও তাঁহাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। চোলরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের মন্দির নির্মিত হয়। চোলরাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজরাজের সময়ে এই মন্দির নির্মিত

(১) Vincent Smith-এর মতে "The Kailas Temple is one of the wonders of the world, a work of which any nation may be proud."

হইয়াছিল। ইহা এক অপূর্ব কীর্তি। এই মন্দিরের চূড়ায় চৌদ্দটি স্তর আছে। শিল্পকলার ইহা এক বিস্ময়কর নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা এক অনবদ্য সৃষ্টি।

মহারাজ রাজেন্দ্র চোলদেব 'গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম' নামে ত্রিচিনপল্লীতে একটি নূতন নগরের পত্তন করিয়াছিলেন। এই নগরে অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা এবং সুরম্য মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরগুলির গাত্রে নানা প্রকার মূর্তি খোদাই করিয়া রাখা হইত।

চোল শিল্পিগণ ধাতু শিল্পেও পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। ব্রোঞ্জ-নির্মিত নটরাজের মূর্তি ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মধ্য ভারতের চান্ডিল্য বংশের রাজত্বকালেও শিল্পকলার বিকাশ উল্লেখযোগ্য। যথা—(খাজুরাহোর মন্দির) উড়িষ্যার গঙ্গাবংশের চোড়গঙ্গদেব উপাধিধারী রাজাগণের রাজত্বকালে দক্ষিণ বঙ্গের বৃহৎ অঞ্চলে উৎকল রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ফলে এই অঞ্চলে উড়িষ্যার সামাজিকপ্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। নবম হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে উড়িষ্যার মন্দির নির্মাণ শিল্পের বিকাশ উল্লেখযোগ্য। কোনারকের সূর্য-মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পান্ড্য ও চের রাজবংশ : এই রাজবংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। হর্ষবর্ধনের আমলে, পান্ড্য রাজ্য পল্লব রাজাদের অধীনে ছিল। স্বাধীনতা লাভের

পাণ্ড্য

পরও দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহারা পল্লব, চোল, সিংহল প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত ছিলেন। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ইঁহারা চোলদের অধীনে আসিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পান্ড্যরা একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে দাক্ষিণাত্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। কায়ল ছিল এই যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বন্দর। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর এই রাজ্যটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

চের

চের বা কেরল রাজ্য এক সময় স্বাধীন ছিল। কিন্তু দশম ও একাদশ শতাব্দীতে চোল প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই রাজ্যটি চোলদের অধীনে চলিয়া আসে।

(খ) বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

সূচনা : উত্তরের 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু' এবং দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের 'দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করিয়া প্রাচীনকালের ভারতীয়েরা বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্তমানকালের মত তখন জলে, স্থলে, আকাশে পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত যানবাহন ছিল না। তথাপি পাহাড়-পর্বত লঙ্ঘন করিয়া, গিরিপথ-গুহা-কন্দরের ভিতর দিয়া পদব্রজে যাত্রা করিয়া, জলে অর্ণবপোত ভাসাইয়া, নানা বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদল বাণিজ্যসম্ভার লইয়া পাড়ি

দিয়াছিল রোম, মিশর, ব্যাবিলন এবং মধ্য এশিয়ায়। বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারিত হইয়াছিল চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, কোরিয়া, জাভা, জাপান প্রভৃতি দেশে এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল 'বৃহত্তর ভারতে' তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপরি-উক্ত দেশগুলিতে। বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম বিস্তারের দ্বারাই ভারতের সহিত ঐ সমস্ত দেশের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

(১) **পশ্চিম এশিয়ার সহিত যোগাযোগ:** খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী গিরিপথ ছিল এই যোগসূত্রের প্রধান পথ। আলেকজাণ্ডার এই গিরিপথ দিয়া সসৈন্যে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, সেলুকাস মেগাস্থিনিসকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় পাঠাইয়াছিলেন। রাজর্ষি অশোকের রাজত্বকালে এই পথ দিয়া মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল; মৌর্যোত্তর যুগে গ্রীক, কুষাণ, ব্যাক্ট্রিয়ান, পার্থিয়ান প্রভৃতি জাতি এই গিরিপথ দিয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছিল এবং এই গিরিপথের নিকটবর্তী গান্ধার প্রভৃতি দেশে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। বসবাসকারী এই সমস্ত জাতি ভারতে রাজ্য স্থাপন করার ফলে যোগসূত্র হইয়াছিল সুগভীর, বন্ধন সুদৃঢ় এবং একে অপরের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে করিয়াছিল প্রভাব বিস্তার। কুষাণ রাজাদের আমলে মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল হইতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপনিবেশ বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারও পূর্বে অশোকের যুগে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজ্যগুলিতে ধর্মপ্রচারের জন্য মৈত্রীদূত প্রেরণের কথা জানা যায়। অশোক সিরিয়ার অধিপতি অ্যাণ্টিয়োকস, থিয়স, ম্যাসিডনের রাজা অ্যাণ্টিগোনাস, এশিয়াসের রাজা, মিশরের রাজা, কাইরণের রাজা প্রভৃতির নিকট ধর্মদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং ধর্মবিজয়ের দ্বারা সুবিশাল ধর্মীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন-সাঙ্ মধ্য এশিয়ার পথ দিয়া ভারতে আসিবার কালে এবং ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের বহু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন বলিয়া নিজেদের বিবরণীতে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় মধ্য এশিয়ার দক্ষিণে খোটান আর উত্তরে কুচি নামক দুইটি জায়গায় ভারতীয় সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল। খোটানে বৌদ্ধ মঠের কথা দুইজন পরিব্রাজকই উল্লেখ করিয়াছেন। ফা-হিয়েন বলিয়াছেন, সেই সময় এখানে বড় বৌদ্ধ মঠ ছিল গোমতী বিহার। হিউয়েন-সাঙ্ চীনে প্রত্যাবর্তনের পথে খোটানের ভারতীয় রাজা বিজিত

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ

ধর্মনৈতিক যোগসূত্র

সিংহের অতিথি হইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

(২) **মধ্য এশিয়ার সহিত যোগাযোগ ঃ** আধুনিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত অরেল স্টাইন (Aurel Stein) মধ্য এশিয়ায় বহু ভারতীয় নগরের ধ্বংসাবশেষ, ভারতীয় ভাষাক্ষরে লিখিত বহু মূল্যবান বৌদ্ধ গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন। আধুনিক তুর্কীস্থানে বহু বৌদ্ধস্তূপ, বুদ্ধমূর্তি হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ এবং অসংখ্য পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত, খোটানী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত। ইহা হইতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে এখানে ভারতীয় ধর্মের প্রসার ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া, প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রীয়ান সী' (Periplus of the Erythrian Sea) নামক গ্রন্থে ভারতের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলির যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আরব বণিকদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে পশ্চিম এশিয়ায় বাংলার কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা ছিল।

(৩) **চীনের সহিত যোগাযোগ ঃ** অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের সঙ্গে চীনের ধর্মগত ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। জনশ্রুতি অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দ হইল চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলনের শুভ বৎসর। তবে ভারত হইতে ধর্ম প্রচারকরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আরও পরে চীনে আসিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে উভয় দেশের মধ্যে ধর্ম ও সভ্যতার বিনিময় শুরু হয়। ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষকগণের নিকট ধর্ম শিক্ষার জন্য, বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক, বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বহু চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিত চীন হইতে ভারতে আসিতে শুরু করেন। ভারতীয় বৌদ্ধ রাজারাও চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেন। ফলে, উভয় দেশের মধ্যে এক গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ধর্মের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগও স্থাপিত হইয়াছিল উভয় দেশের মধ্যে। চীনা রেশমবস্ত্র ভারতে সমাদর লাভ করিয়াছিল। চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে জনৈক চৈনিক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী হইতে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে প্রায় পৌনে দুইশত চৈনিক তীর্থপর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ কাহিনী এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা সেই সময়কার চীন-ভারত সম্পর্কের উল্লেখ্য নিদর্শন। চীনে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে কুচির পণ্ডিত কুমারজীব, কাশ্মীরের রাজপুত্র গুণবর্মন, উজ্জয়িনীর পণ্ডিত পরমার্থ এবং কাঞ্চীর রাজকুমার বোধিকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা গুপ্ত যুগে চীনে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞানভদ্র যশোগুপ্তও চীনে গিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা অনেক বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক চীনা ভাষায়

চীনে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকগণ

অনুবাদ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ ৭৪ খানি ভারতীয় পুঁথির চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইৎ-সিং চারিশত সংস্কৃত পুঁথি চীনে লইয়া গিয়াছিলেন।

শুধু স্থলপথে নয়, জলপথেও চীন-ভারতের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। চৈনিক পন্ডিত ইৎ-সিং সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, সমুদ্রপথে বণিকরা চীনের সহিত বাণিজ্য করিত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌর্য যুগ হইতে গুপ্ত যুগের শেষ পর্যন্ত চীন-ভারতের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্রাটগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের দূত চীন সম্রাটের দরবারে পাঠাইতেন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রেও উভয় দেশের মধ্যে যোগসূত্র উল্লেখযোগ্য।

(৪) **তিব্বত ঃ জাপান ঃ কোরিয়া ঃ** তিব্বতের সহিত ভারতের যোগাযোগ প্রাচীন-কাল হইতে। কথিত আছে যে, ভারতের এক রাজকুমার তিব্বতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্রং-সান-গাম্পো নামক তিব্বতের জনৈক রাজা তাঁহার দেশে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় অক্ষরমালা তাঁহার চেষ্টায় সেখানে প্রচলিত হইয়াছিল। তিব্বতে ভারতের অনুকরণে অনেক মঠ ও মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। তিব্বতী অনেক পন্ডিত সেকালের বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করিতেন। বিখ্যাত বাঙ্গালী পন্ডিত বৌদ্ধভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর পাল রাজাদের রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার ও প্রসার করিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধরূপে সম্মান জানানো হয়। তিব্বত হইতে জাপানে ও কোরিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতীয় পন্ডিত বোধিসেন জাপানে গিয়া সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জাপানের সম্রাট তাঁহাকে বৌদ্ধসঙ্ঘাধিপতি পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। জাপানের ধর্ম ও সংস্কৃতি মঙ্গোলিয়া এবং কোরিয়ায় প্রসার লাভ করিয়াছিল।

তিব্বত

জাপান

কোরিয়া

(৫) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ** দ্বীপময় বৃহত্তর ভারতের সহিত মূল ভারত ভূখন্ডের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল দুই হাজার বৎসরেরও পূর্বে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে, কম্বোডিয়া (বা কম্বোজ), আনাম চম্পা (বা বর্তমান ইন্দোচীন) প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের মাধ্যমে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সময় এই সকল দেশকে একত্রে বলা হইত 'সুবর্ণভূমি'। ভারত হইতে বহু

রাজ্যাকাঙ্ক্ষী যুবরাজ কিংবা সিংহাসনচ্যুত রাজা সাগর পাড়ি দিতেন এইসব 'সাগরিকা' দ্বীপে নূতন রাজ্যের পত্তন করিবার জন্য।[১]

তাহা ছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে সেখানকার ভারতীয় নামধারী রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকগণ এইসব অঞ্চলে অনেক সংস্কৃত লিপি ও ঐতিহাসিক রচনা পাইয়াছেন যাহা হইতে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের কাহিনী জানা যায়। সুবর্ণ-দ্বীপের রাজাদের শিলালিপিতে হিন্দু দেবতার (যেমন, বিষ্ণু, শিব) উল্লেখ আছে। এখানকার মন্দিরগুলি বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি হিন্দুধর্মীয় এবং কোথাও কোথাও বৌদ্ধমঠগুলি ও বিহার ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রেও উক্ত অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। চোলরাজাদের নৌ-শক্তির প্রাধান্য হেতু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় তথা হিন্দু-প্রভাবের প্রমাণ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সমস্ত দ্বীপে, উপদ্বীপে ও রাজ্যগুলিতে ভারতীয় রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মনৈতিক প্রভাব পড়িয়াছিল তাহাদের মধ্যে সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ, শ্যাম), জাভা বা যবদ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব অর্জন করিয়াছিল। এমনকি, ভারতবর্ষে হিন্দু শাসন অবসানের পরও এই রাজ্যগুলিতে হিন্দু প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় ছিল। বর্তমান ইন্দোচীনের আনাম (ভিয়েৎনাম) প্রদেশ (যাহার পূর্ব নাম ছিল চম্পা) এবং কম্বোজ বা কম্বোডিয়া ছিল সেই রকম দুইটি হিন্দু রাজ্য।

চম্পাঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী হইতে চম্পায় হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন বলিয়া জানা যায়। চম্পা শহরে (বর্তমান ট্রাকিয়েন) বহু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এখানকার হিন্দু রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন জয়পরমেশ্বর বর্মন, ঈশ্বরমূর্তি রুদ্রবর্মন, হরিবর্মন, জয়সিংহবর্মন ইত্যাদি। অধুনা আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, চম্পা রাজ্য তিনটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—অমরাবতী, বিজয় এবং পান্ডুবঙ্গ। উত্তরের টনকিন প্রদেশটি ছিল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। পশ্চিমে ছিল কম্বোজ রাজ্য। সেখানকার রাজা সপ্তম জয়বর্মন চম্পার রাজা অষ্টম জয়ইন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। মোঙ্গল আক্রমণকারী কুবলাই খাঁ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে চম্পা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কম্বোজের রাজারা চম্পা রাজ্য সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া লওয়ার ফলে এই স্বাধীন রাজ্যটির বিলুপ্তি ঘটে।

চম্পার পতন

---

(১) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সাগরিকা' কবিতায় ভারতীয়দের 'দ্বীপময় ভারতে' উপনিবেশ স্থাপনের ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন।

চম্পায় হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই প্রধান ভারতীয় ধর্মের প্রসারলাভ ঘটিয়াছিল। সেখানে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজারা প্রধানতঃ হিন্দু শৈব ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী।

ধর্ম

কম্বোজ বা কম্বোডিয়া ঃ আধুনিক কম্বোডিয়া এবং চীনা-কোচিনের প্রাচীন নাম ছিল কম্বোজ। চীনা বিবরণী অনুসারে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কৌণ্ডিল্য নামে জনৈক ভারতীয় ব্রাহ্মণ সেখানকার উপজাতীয় রাণীকে বিবাহ করিয়া এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানকার লোকেরা অর্ধ-বর্বর ছিল এবং উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত বলিয়া ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন।[1] হিন্দু রাজারা তাহাদের মধ্যে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন। কম্বোজের বর্মন বংশ প্রায় ৯০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের রাজত্বকালে এখানে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হইয়াছিল। চম্পার মত এখানেও হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই ভারতীয় ধর্মের বিশেষ প্রসারলাভ ঘটিয়াছিল। হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব ধর্মীয় মত এখানে বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কম্বোজরাজ সূর্যবর্মনের 'আঙ্কোরভাটের বিষ্ণু মন্দির' বৈষ্ণব ধর্মের তথা হিন্দু সংস্কৃতির এখনও প্রমাণ বহন করিতেছে। আঙ্কোরথোম ছিল এই কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী। রাজা সপ্তম জয়বর্মন (মতান্তরে যশোবর্মন) এই রাজধানীটি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেকে ইহার নাম যশোধরপুর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পল্লভ শিল্পরীতি অনুযায়ী এই নগরী নির্মিত হইয়াছিল।

হিন্দুসভ্যতার বিস্তার

কারুকার্যখচিত, নানা দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত বিষ্ণু মন্দির ছাড়াও রাজধানী নগরের কেন্দ্রস্থলে 'বেয়ন মন্দির' নামে আর একটি মন্দির ছিল। এই মন্দিরটির প্রত্যেকটি গম্বুজের শীর্ষদেশে ধ্যানরত শিবের মূর্তির আকারে মূর্তি স্থাপিত ছিল। এখানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমিত হয় যে, এই নগরী একটি সুপরিকল্পিত, সুন্দর শহর ছিল। প্রশস্ত রাজপথ এবং প্রাচীরবেষ্টিত জলাশয় এই নগরের শোভা বর্ধন করিত। এখানে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা ও চর্চার প্রচলন ছিল।

(৬) মালয় উপদ্বীপ ঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে হিন্দু শৈলেন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। দীর্ঘ ৫০০-৬০০ বৎসর ধরিয়া এই রাজবংশ প্রবল পরাক্রমে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা বা যবদ্বীপ, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ লইয়া গঠিত বৃহৎ সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল। এই অঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট আরব বণিকগণের রচনা হইতে জানা যায় যে, এই সাম্রাজ্য খুব ধনশালী ছিল। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতীয় চোলরাজা প্রথম রাজরাজ সাম্রাজ্যের কিয়দংশ দখল করিয়াছিলেন

মালয়ের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

(১) The natives of the country were semi-savages and both men and women went about naked.

বলিয়া জানা যায়। যবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য গড়িয়া উঠে। চতুর্দশ শতাব্দীতে যবদ্বীপরাজ শৈলেন্দ্র রাজাদের পরাজিত করিয়া মালয় উপদ্বীপ দখল করেন নাই। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে এই হিন্দু সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মুসলমান রাজাগণ নূতন রাজ্য স্থাপন করেন।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের উপর ভারতীয় প্রভাব ঃ শৈলেন্দ্র বংশের রাজাগণ ছিলেন মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। অনেকে মনে করেন যে বাংলাদেশ হইতে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সাধু কুমারঘোষ এখানে শৈলেন্দ্র রাজাদের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এই বংশের রাজা বালপুত্রদেব বাংলার পাল রাজা দেবপালের অনুমতি লইয়া নালন্দায় একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে দেবপাল এই বিহারটির ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য পাঁচটি গ্রামও দান করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্মীয় ক্ষেত্রে শৈলেন্দ্র বংশীয়গণ বাংলাদেশের প্রভাবাধীন ছিলেন।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা শিল্পকলা চর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাঙ্গালী ধর্মগুরুর নির্দেশে তৈয়ারী করা তারাদেবীর সুন্দর মন্দিরটি তাঁহাদের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। যবদ্বীপের 'বরবুদুরের' মন্দিরটি শৈলেন্দ্র রাজবংশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ অবদান। 'বুদুর' নামক গ্রামের এই সুদৃশ্য নয়তলা পার্বত্য মন্দিরটি আজিও সেই যুগের জাঁকজমক ও শিল্পানুরাগের পরিচয় বহন করিতেছে। নয়তলার সর্বোচ্চ তলাটিতে আছে ঘন্টাকৃতি একটি বৃহৎ স্তুপ। স্তুপগুলির মধ্যে আছে অগণিত বুদ্ধমূর্তি। দেওয়ালে অঙ্কিত আছে জাতকের বিভিন্ন কাহিনী। সুতরাং ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম যে শুধু এখানে প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহা নয়, অপূর্ব সুন্দর বৌদ্ধ মন্দিরও এখানে নির্মিত হইয়াছিল ভারতের অনুকরণে। পন্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ভারত হইতে আগত সুদক্ষ শিল্পিগণই এই মহামন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয় রাজ্য

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার অনেক পূর্বে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রা দ্বীপে শ্রীবিজয় (বর্তমান পালেমবাং) নগরকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীবিজয় রাজ্য নামে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যটি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইহার পর শৈলেন্দ্র রাজাগণ এই রাজ্যটিকে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র বংশের পতনের পর মলায়ু নামে এক নূতন রাজবংশ এখানে স্থাপিত হয়।

সুমাত্রা দ্বীপের এই রাজ্যটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। মুসলমান আক্রমণের ফলে এখানকার বৌদ্ধ ও হিন্দু নরনারীরা পার্শ্ববর্তী বলি দ্বীপে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এই সমস্ত অঞ্চল হইতে লুপ্ত হইলেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এখনও এই সমস্ত অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়।

জাভা বা যবদ্বীপ

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের পর যবদ্বীপও একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। বিজয় নামে জনৈক রাজা তিক্ত-বিল্ব নামে একটা জায়গায় এই রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। মুসলমান আক্রমণের ফলে এখানকার হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে।

বলি দ্বীপ

পার্শ্ববর্তী যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে মুসলমান আক্রমণের ফলে হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে। বলি দ্বীপে এখনও হিন্দু শাসন বজায় আছে।

ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশ

ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশেও বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের আমল হইতে এইসব দেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট। দক্ষিণ ব্রহ্মের অধিবাসিগণ তৈলং নামে পরিচিত ছিল। অনেকে মনে করেন ভারতীয় তেলিঙ্গনা হইতে তৈলং নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। তৈলং অঞ্চলের উত্তরে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত ব্রহ্মজাতি শ্রীক্ষেত্র নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে আরাকান অঞ্চলে হিন্দু ধর্ম এবং উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বর্মী শিলালিপি হইতে জানা যায়। মধ্য ব্রহ্মে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল।

শ্যাম দেশে প্রাচীনকালে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্মও সেইদেশে প্রসারলাভ করিয়াছিল। প্রাচীন শ্যাম দেশ বর্তমানে থাইল্যান্ড নামে পরিচিত। সেখানকার জাতীয় ধর্ম এখনও বৌদ্ধ ধর্ম।

সিংহলে সম্রাট অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। 'বাঙ্গালীর ছেলে লঙ্কা করিয়া জয়'—সিংহল নাম রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

সিদ্ধান্ত

উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে প্রাচ্যের দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট। এই দ্বীপময় দেশগুলির জাতীয় জীবনে হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ভারতীয় ঋষিদের রচিত স্মৃতিশাস্ত্র এখানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। সুবর্ণদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ জাতিভেদ প্রথার মত জাতিভেদ পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জাত্যাভিমান ও প্রাধান্য এখানেও লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ দ্বীপময় বৃহত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে এখনও যে ভারতীয় প্রভাব টিকিয়া আছে তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বর্তমান যুগেও এই প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীনকালের হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব তথা সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

১। **দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ** (ক) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল ? (খ) শীলভদ্র কে ছিলেন ? (গ) বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় ? (ঘ) অতীশ দীপঙ্কর কে ছিলেন ? (ঙ) বীতপাল ও ধীমান কে ছিলেন ? (চ) চর্যাপদ কি ? উহা কোন্ যুগে রচিত হয় ? (ছ) রাম-চরিত কে রচনা করেন ? (জ) দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর গ্রন্থদ্বয় কাহার রচনা ? (ঝ) গীতগোবিন্দ কে রচনা করেন এবং কবে ? (ঞ) পবনদূত কাহার রচনা ? (ট) কৌলিন্য প্রথার প্রচলন কে করেন ? (ঠ) শঙ্করাচার্য কে ছিলেন ? (ড) কুমারিলভট্ট কে ছিলেন ? (ঢ) রামানুজের ধর্মমত কি ছিল ? (ণ) পল্লভ রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল ? (ত) চোল রাজাদের রাজধানী কোথায় ছিল ? (থ) মহাবলীপুরমের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প কোন্ রাজবংশের রীতি ? (দ) তাঞ্জোরের বিখ্যাত চোল মন্দিরটির নাম কি ? (ধ) ভারবি কোন্ রাজার সভাকবি ছিলেন ? (ন) চালুক্য রাজাদের দুইটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উল্লেখ কর। (প) গোমতী বিহার কোথায় ছিল ? (ফ) 'সুবর্ণভূমি' বলিতে কোন্ দেশকে বুঝায় ? (ব) আঙ্কোরভাট কি এবং কোথায় ? ইহা কাহার সময়ে নির্মিত ? (ভ) বরবুদুর স্তূপ কোন্ রাজবংশের কীর্তি ? (ম) কৈলাসনাথের মন্দির কোথায় এবং কাহাদের কীর্তি ? (য) চম্পার বর্তমান নাম কি ?

২। **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ** (ক) পাল যুগের শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে কি জান ? (খ) সেন যুগের সমাজ-ব্যবস্থার বিবরণ দাও। (গ) চোল রাজাদের সামুদ্রিক কার্যের পরিচয় দাও। (ঘ) পল্লভ শিল্পকলা সম্বন্ধে লিখ। (ঙ) পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন ? (চ) দক্ষিণ ভারতে প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কিরূপ ছিল ? (ছ) দ্রাবিড় জাতি কোথায় বাস করিত ? তাহাদের সম্বন্ধে কি জান ? (জ) চীনের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঝ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনের কয়েকটি উদাহরণ দাও এবং কেন ও কিভাবে স্থাপিত হইয়াছিল লেখ।

৩। **নাতিদীর্ঘ বর্ণনামূলক উত্তর দাও ঃ** (ক) পাল ও সেন যুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) প্রাচীন ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

(গ) দক্ষিণ ভারতের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ঘ) বৃহত্তর ভারত বলিতে কি বুঝায় ? সুবর্ণভূমি ও কম্বোজে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশ আলোচনা কর (মাঃ ১৯৭৮)।

(ঙ) প্রাচীনকালে ভারত-চীন সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিবরণ দাও।

ইতিহাসে ভারত

মধ্য যুগ

প্রথম অধ্যায়

(ক) মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য,
(খ) ঐতিহাসিক উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(ক) ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদের আগমন এবং দিল্লীতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর হইতে দীর্ঘ পাঁচ শতাধিক বর্ষব্যাপী তুর্কী সুলতান এবং মুঘল বাদশাহদের (আনুমানিক ১২০৬-১৭০৭ খ্রীঃ) রাজত্বকাল পূর্ববর্তী হিন্দু রাজবংশ-গুলির রাজত্বকাল হইতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক শাসন-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রবর্তনের ফলে মুসলমান শাসন-ব্যবস্থা হইতে পৃথক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হইল। ফলে প্রাচীনকালের হিন্দুরাজত্ব এবং আধুনিক কালের ইংরেজ রাজত্বকালের মধ্যবর্তী যুগের মুসলমান শাসনকালকে ভারতের ইতিহাসে মধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক এই যুগকে মুসলমান যুগ বলিয়াও অভিহিত করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিন্দু যুগ বা মুসলমান যুগ বলিয়া ইতিহাসে কোন যুগকে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ প্রাচীন ভারতে একমাত্র হিন্দুরাজারাই যে রাজত্ব করিয়াছিলেন এমন নয়, কুষাণ, শক, গ্রীক প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিসম্ভূত রাজবংশগুলি রাজত্ব করিয়াছিল এবং তাহারা ভারতীয় জাতিতে (Nationality) পরিণত হইয়াছিল। অনুরূপভাবে মধ্য যুগে মুসলমান-সুলতান ও বাদশাহগণ দিল্লীতে শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের (যেমন রাজপুতানার) রাজারা ছিলেন অমুসলমান—ভারতীয় হিন্দু এবং উপজাতীয় বংশোদ্ভব। গোড়ার দিকের মুসলমান শাসকগণ বহিরাগত তুর্কী মুসলমান হইলেও পরবর্তীকালে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়ত্ব অর্জন করেন। শাসন-ব্যবস্থায় (বিশেষতঃ রাজস্ব বিভাগে) তাঁহারা হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটে। মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে সহজিয়া মতবাদ। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানদের পীর লইয়া প্রতিষ্ঠিত হন মিশ্র দেবতা সত্যপীর। বাংলার হুসেন শাহ কাশ্মীরের জয়নাল আবেদিন এবং দিল্লীশ্বর মুঘলশ্রেষ্ঠ মহামতি আকবর হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য এবং সমন্বয়মূলক ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অবশ্য মুসলমান সুলতানদের মধ্যে অনেকের ধর্মীয় গোঁড়ামীও ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং যুগ-বৈশিষ্ট্যের বিচারে এই যুগকে মুসলমান যুগের ভারত না বলিয়া মধ্য যুগের ভারত বলাই যুক্তিসংগত। মধ্য যুগ বলিতে বুঝায় সুদূর অতীত এবং আধুনিক বা বর্তমান যুগের মধ্যবর্তী সময়কালকে। সভ্যতার উত্তরণের ইতিহাসে

মুসলমান শাসন আমল না বলিয়া মধ্য যুগ বলার কারণ

এই যুগ দুই প্রান্তবর্তী যুগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাচীন যুগের উত্তরাধিকার এবং আধুনিক যুগের ভিত্তিভূমি নিহিত আছে।

(খ) মধ্য যুগের সুলতানী আমলের ভারত-ইতিহাসের উপাদান : মধ্য যুগের সুলতানদের ইতিহাস রচনার উপাদানের অভাব নাই। বরং পূর্ববর্তী যুগ অপেক্ষা প্রাচুর্য রহিয়াছে বলা যায়। লিখিত উপাদানগুলির মধ্যে ভারতে আগত ও বসবাসকারী বিভিন্ন মুসলমান রাজবংশের ইতিহাস, সরকারী দলিলপত্র, সভা, ঐতিহাসিকদের তথ্য-বহুল রচনা, সভাকবিদের প্রশস্তিমূলক রচনা, জীবনী ও আত্মজীবনীমূলক রচনা, বৈদেশিক পর্যটকদের বৃত্তান্ত উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া, মধ্য যুগের বিভিন্ন সময়ের প্রাপ্ত মুদ্রা এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও শিল্পকলা সমকালীন যুগের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করিতে সাহায্য করে।

লিখিত সাহিত্যিক উপাদানের ভাষা ছিল আরবী ও ফারসী। রাজানুগ্রহপুষ্ট কবি-সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকদের রচনার মধ্যে অতিরিক্ত পক্ষপাত পরিদৃষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী তথ্যও পাওয়া যায়। সাবধানতার সহিত সেই সকল উপাদান হইতে সত্য নিরূপণ করিয়া ঐতিহাসিকদের ব্যবহার করিতে হয়।

সুলতানী আমলে আরবী ভাষায় রচিত **চাচ্‌নামায়** আরবদের সিন্ধু-বিজয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আলবেরুণী-রচিত **'তারিখ-উল-হিন্দ'** একাদশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতের ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থ। আলবেরুণী সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। হাসান-নিজামির 'তাজ-উল-মাসির' ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ-হইতে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ হইতে কুতুবউদ্দীন এবং ইলতুৎমিসের রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যায়। মিনহাজ-উস-সিরাজের **তাবাকৎ-ই-নাসিরি** গ্রন্থে বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ অভিযান এবং দিল্লীর দাস রাজবংশের ইতিহাস জানা যায়। আমীর খসরুর **তারিখ-ই-আলাই** হইতে মোঙ্গল আক্রমণের বিবরণ জানা যায়। তিনি খিলজী ও তুঘলক সুলতানদের সভাকবি ছিলেন। জিয়াউদ্দীন বরণীর **তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী** এই যুগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য আকরগ্রন্থ। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের **ফতোয়াৎ-ই-ফিরোজশাহী** সুলতানী আমলের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে ইসলামের আগমনঃ আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় ও তাহার ফলাফল

'চাচ্‌নামা' নামক গ্রন্থ হইতে মুসলমানদের (আরবদের) ভারত অভিযানের আদি-পর্বের বিবরণ পাওয়া যায়। মীর মহম্মদ মাসুদ কর্তৃক রচিত 'তারিখে-সিন্দ' এবং আলিশের কাজি-রচিত 'তুফাতুল কিরাণ' নামক গ্রন্থ দুইটিতেও আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয়ের বিবরণ আছে। এই সকল ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিকগণ আরবদের ভারতে রাজ্যবিস্তার নীতি, সিন্ধুদেশ আক্রমণ এবং তাহার ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছেন। আরবদের সিন্ধুদেশে রাজ্যবিজয় ভারতে ইসলামের আগমনের প্রথম ইতিহাস-স্বীকৃত ঘটনা বলিয়া এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণের অভিমত জানা গিয়াছে।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর সময় (৬৩২ খ্রীঃ) আরবদের আধিপত্য আরব দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এক শতাব্দীর মধ্যেই মধ্য-এশিয়া, সিরিয়া, মিশর ছাড়াইয়া পারস্য, বোখারা, সমরখন্দ এবং ফারগাণার মধ্য দিয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তানেও এই নব ধর্ম আসিয়া পৌঁছায়। পশ্চিমে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি ঘটে। বিস্তীর্ণ ঐশ্লামিক জগতের ধর্মীয়প্রধান ছিলেন 'খলিফা'। সিরিয়ার দামাস্কাস শহরে ছিল তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র তথা রাজধানী। ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযান নীতি সংযোগ ঘটায়। মুসলমানগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অভিযান শুরু করে। ঐতিহাসিক আরণল্ডের মতে আরবদের রাজ্যবিস্তারের পশ্চাতে ধর্মবিস্তার অপেক্ষা ধনসম্পদ লুণ্ঠন করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ থাকিলেও ভারতের ক্ষেত্রে ইহা অনেকাংশ সত্য ছিল বলা চলে। উগ্র ধর্মান্ধ হইয়াও সিন্ধুদেশ অভিযানের মূলে ধর্ম বিস্তার করা অপেক্ষা লুণ্ঠন করাই আরবদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণ

আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয়ঃ প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যিক সূত্রে আরব সাগর এবং খাইবার-বোলান গিরিপথ দিয়া আরবের সহিত সিন্ধুদেশের বাণিজ্য চলিত। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৭১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা বেশ কয়েকবার সিন্ধুদেশ আক্রমণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে আরবের অন্তর্গত ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজের নির্দেশে আরবগণ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিল।

আরবদের সিন্ধুদেশ আক্রমণের প্রাক্কালে সেখানে দাহির নামক এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা ছিল দুর্বল এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধ লাগিয়া থাকিত। তাহা ছাড়া, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের প্রতি রুষ্ট ছিল।

দাহিরের রাজ্যসীমা সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রতীরের বন্দরে অনেক আরব বাণিজ্যোপলক্ষে বসবাস করিত। তাহারা সিন্ধুদেশের দুর্বলতার কথা জানিত। আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে সিন্ধুদেশের অদূরে 'দেবল' নামক বন্দরে ভারতীয় জলদস্যুদের দ্বারা সিংহল প্রত্যাগত কয়েকটি আরবী তীর্থযাত্রীবাহী জাহাজ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল। হজ্জাজ ইহাতে ভীষণ রুষ্ট হইয়া দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন। দাহির এই দাবি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন হজ্জাজ দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

সিন্ধুদেশ আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ

প্রথম দুইটি আরব আক্রমণ দাহিরের পুত্র জয়সিংহ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। হজ্জাজ পরাজয়ের অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে ছয় সহস্র সুশিক্ষিত আরব সৈন্য সিন্ধুদেশ আক্রমণার্থে পাঠাইলেন।

মহম্মদ-বিন-কাশিম বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া দেবল বন্দরে উপস্থিত হন। দাহির আক্রমণকারীদের গতিরোধ করিতে ব্যর্থ হন। দেবল বন্দরের পতন ঘটে। বিজয়ী কাশিম নিরুন বা হায়দরাবাদ, সিওয়ান প্রভৃতি দুর্গগুলি অধিকার করেন। দাহির স্ত্রী-পুত্র সহ যুদ্ধে নিহত হন। সিন্ধুদেশের বিভিন্ন অংশে আরবদের প্রাধান্য খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়ী আরবগণ তারপর কাশ্মীর এবং উজ্জয়িনীর দিকে অভিযান করে। কিন্তু কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এবং কনৌজরাজ যশোবর্মন আরবদের নিজেদের দেশ হইতে বিতাড়িত করেন।

বিজয়ী আরব নেতাগণ অল্পদিনের মধ্যেই বাগদাদের খলিফার দ্বারা পদচ্যুত এবং নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া আরব ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, সিন্ধুদেশে আরব শাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ঐতিহাসিক লেনপুল (Lane Poole) বলিয়াছেন, "আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় আরব জাতির ইতিহাসে নিষ্ফল বিজয়লাভ, ভারতের ইতিহাসে ইহা একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র"।[১]

সিন্ধুদেশে আরবদের শাসন স্থায়ী হয় নাই। রাজ্য শাসন অপেক্ষা লুণ্ঠন কার্যে তাহাদের আগ্রহ ছিল বেশী। তাহাদের অধিকার ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ইহার বিস্তার লাভ ঘটে নাই। সিন্ধুদেশেও ইহার সুদূর প্রসারী ফল ছিল না। সুতরাং রাজনৈতিক বিচারে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি নিষ্ফল ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে যৎসামান্য ইহার প্রভাব ছিল।

আরবদিগের অভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদ, খলিফা শক্তির পতন, কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে সিন্ধুদেশ হইতে আরব প্রাধান্য একশত বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায়।

(১) "The Arab conquest of Sind was merely an episode in the history of India and of Islam, a triumph without results."—Stanley LanePoole

তৃতীয় অধ্যায়

(ক) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা

আরবদের সিন্ধু আক্রমণ বন্যাস্রোতের মত অল্পদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দীতে গজনীর তুর্কী সুলতানরা ভারত অভিযান করিয়া মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত করেন। গজনীর সুলতানদের ভারতবর্ষ আক্রমণকালে উত্তর ও পশ্চিম ভারত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। সর্বদাই পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত থাকিত। হিন্দু রাজাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব গজনীর সুলতানদের ভারত আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল।

আফগানিস্তানের তুর্কীরা গজনী নামে একটি নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল (আঃ ৯৬২ খ্রীঃ) আলপ্তিগীন নামে জনৈক তুর্কী বীরের অধীনে। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার জামাতা সবুক্তিগীন শ্বশুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে (আফগানিস্তানের কিছু অংশ সমেত) ও পাঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন হিন্দু শাহী বংশীয় রাজারা। জয়পাল ছিলেন সবুক্তিগীনের সমসাময়িক। তাঁহার রাজধানী ছিল উন্দ বা উদভাণ্ডপুর। জয়পাল তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে গজনী রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া গজনী আক্রমণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। সবুক্তিগীন আক্রমণকারী হিন্দু প্রতিপক্ষকে লাঘমান ও মধ্যবর্তী সূজাক নামক স্থানে যুদ্ধে পরাজিত করেন। অপমানজনক সর্তে জয়পালকে গজনীরাজের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হয়। স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়পাল এই অপমানজনক সন্ধির সর্তাবলী মানিয়া চলিতে অস্বীকার করিলে সবুক্তিগীন পুনরায় জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। তুর্কী সৈন্যরা সীমান্ত প্রদেশগুলি লুঠতরাজ করিতে শুরু করে। আমৃত্যু (৯৯৮ খ্রী) সবুক্তিগীন ও জয়পালের মধ্যে বিবাদ চলিতে থাকে। সবুক্তিগীন ছিলেন ভারতে সুষ্ঠু সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের প্রথম পথিকৃৎ। তাঁহার মধ্যম পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান মামুদ পিতার আরব্ধ কর্মের ধারক এবং বাহক রূপে পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করেন। মামুদের আক্রমণের সময় শাহী বংশের হিন্দু রাজারা ছাড়াও আজমীর ও দিল্লীতে চৌহান বংশ, বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্লী বংশ, বঙ্গদেশে পাল বংশ, কাশ্মীরে কর্কট বংশ রাজত্ব করিত।

সবুক্তিগীন ও জয়পাল

(খ) সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ ঃ ৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর হইতে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট সতের বার সুলতান মামুদ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক অনৈক্য, শক্তিশালী হিন্দু রাজশক্তির অভাব, উত্তর-ভারতের অন্যত্র রাজন্যবর্গের পারস্পরিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কারণে তাঁহাকে অভিযান পাঠাইতে উৎসাহিত

আক্রমণের অনুকূল অবস্থা

করিয়াছিল। জয়পালের তথা হিন্দু রাজাদের প্রতিরোধ করার অক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। ভারতের অতুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহাকে বার বার ভারত আক্রমণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

ধর্মনৈতিক কারণ

অনেক ঐতিহাসিকের মতে সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পশ্চাতে ধর্মনৈতিক কারণ আছে। ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং প্রসার করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।[১]

আক্রমণগুলির শ্রেণীবিভাগ

সুলতান মামুদের অভিযানগুলির উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য মূলতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) শাহী রাজাদিগের সহিত পূর্ব শত্রুতার প্রতিশোধগ্রহণমূলক আক্রমণ, (২) ধনরত্ন লুণ্ঠন, (৩) হিন্দুদের দেবমন্দির ও বিগ্রহের বিনাশ সাধন এবং সামরিক সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে অভিযান।

মন্দির লুণ্ঠন

সুলতান মামুদের উল্লেখযোগ্য অভিযানগুলির মধ্যে পিতৃশত্রু জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান ও পেশোয়ারের নিকট জয়লাভ; তাঁহার পুত্র আনন্দপালের দ্বারা গঠিত সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাহী রাজ্য গ্রাস এবং থানেশ্বর ও মথুরার মন্দির লুণ্ঠন, কাথিয়াবাড়ে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠনের দ্বারা প্রচুর ধনরত্ন লাভ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মামুদ অবাধে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাইয়া একে একে কাংড়া দুর্গ, থানেশ্বর এবং মথুরার বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করিলেন। বিপুল ধন-ঐশ্বর্য তিনি লাভ করিলেন। সর্বশেষ কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন (১০২৫ খ্রীঃ) করিয়া হিন্দু ধর্মের উপর তিনি প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন। এই সমস্ত মঠ-মন্দির লুণ্ঠন এবং হিন্দু বিগ্রহের নিগ্রহ ও ধ্বংস-সাধন পৌত্তলিকতা ও হিন্দুধর্ম-বিরোধী নীতির জন্য সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবে ধনরত্ন লাভ তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একথা অকাট্য এবং অনস্বীকার্য।

সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন মামুদের ভারত আক্রমণের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মন্দিরের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিয়া সেখানকার পুরোহিতদের তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। এই আক্রমণে বাধাদানকারী সিন্ধুবাসী জাঠদিগকে এবং গুজরাটের চালুক্যরাজ ভীমদেবকে তিনি পর বৎসর (১০২৫ খ্রীঃ) পরাস্ত করিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে ধনলোভী, পৌত্তলিকতা ও হিন্দুধর্ম-বিরোধী লুণ্ঠনকারী মামুদ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুলতান মামুদের অভিযানের ফলাফল: কোন উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মামুদ ভারত আক্রমণ করেন নাই। ভারতের অতুল ঐশ্বর্য এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করাই তাঁহার পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণের মুখ্য

---

(১) "Mahmud was simply a bandit?operation on a large scale."—Smith

উদ্দেশ্য ছিল। সেইজন্য ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁহাকে 'bandit' বা লুঠেরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] মন্দির লুণ্ঠন, দেব-দেবীর মূর্তি বিনাশ এবং 'কাফের' হিন্দুদের প্রাণনাশ করিয়া তিনি ভারতবাসীর মনে ইসলাম ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতের রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়া তিনি পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণের ফলে শুধু সামরিক নয়, আর্থিক দিক হইতেও ভারতের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল।

স্বদেশে মামুদ একজন বিচক্ষণ, ন্যায়বান এবং ধর্মপ্রাণ ও শিল্পানুরাগী শাসক বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কবি আনসারী এবং ফারদৌসী, ঐতিহাসিক উট্‌বী, দার্শনিক ফারাবী প্রভৃতি তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষী আল্‌বিরুণী (Alberuni) তাঁহার রাজসভায় ছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি এদেশে সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং 'তহ্‌কিক্‌-ই হিন্দ' নামে একটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি নানা হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালীন ভারতের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। সেইজন্য আল্‌বিরুণীর এই ভারত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ভারতে মুসলমান আগমনকালের একটি 'আকর গ্রন্থ' হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই মহান্ পণ্ডিত মামুদের দরবারে যুদ্ধবন্দীরূপে আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ভারতে মামুদের অধিকৃত পাঞ্জাব প্রদেশে তিনি কিছুদিন অবস্থান করিয়া শেষ বয়সে গজনীর দরবার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আল্‌বিরুণী

মামুদ শিল্পরসিক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি রাজধানী গজনীকে নানা সুদৃশ্য সৌধে শোভিত করিয়াছিলেন।

---

(১) 'So far as India was concerned Mahmud was simply a bandit operating on a large scale.'

চতুর্থ অধ্যায়

অভিযান হইতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পত্তন—কুতুবুদ্দিন-ইলতুৎমিস ও বলবনের অবদান ঃ সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পরে গজনীর ঘুর বংশীয় শাসনকর্তা মুইজ-উদ্দিন মহম্মদ-বিন-সাম ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিনের প্রতিনিধিরূপে ভারত অভিযান শুরু করেন ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ইতিহাসে তিনি মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। ১১৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সহিত থানেশ্বরের নিকটবর্তী তরাইনের প্রান্তরে যুদ্ধ হয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীঃ) তিনি পরাজিত হন সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর নিকট। কিন্তু তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ

ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে মুসলমান অধিকার দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কনৌজের গাহড়বাল রাজা জয়চন্দ্রের পৃথ্বীরাজের প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকার জন্য মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি যৌথ প্রতিরোধের জন্য সহায়তা করেন নাই।

তরাইনের যুদ্ধের ফলাফল

১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর মহম্মদ ঘুরী কনৌজ এবং বারাণসীর শাসনকর্তা জয়চন্দ্রকে নিহত করিয়া পূর্ববর্তী তরাইনের যুদ্ধের সময় তাঁহার পৃথ্বীরাজ বিরোধী নিরপেক্ষতার পুরস্কার দিলেন! কাবুল ও পাঞ্জাব হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের উপর মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কুতুবুদ্দিনের উপরে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া মহম্মদ ঘুরী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

জয়চন্দ্রের পরাজয় কনৌজ ও বারাণসী আক্রমণ

কুতুবুদ্দিন ১২০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করিলেন। বখতিয়ার খিলজীর পুত্র ইখতিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ নামে এক অসম সাহসী বীরের বঙ্গদেশ ও মগধ অভিযানের ফলে নব-ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হইল। বাংলাদেশে তখন রাজা ছিলেন সেন বংশীয় লক্ষ্মণসেন। ইখতিয়ার-উদ্দিনের নদীয়া আক্রমণের সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ রাজা পলাইয়া গেলেন। বাংলাদেশ মুসলমানদের অধিকারে আসিল। মহম্মদ ঘুরী আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাঁহার বিজিত রাজ্য কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গেল। ভারতবর্ষের বিজিত রাজ্যে কুতুবুদ্দিন আইবক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান হইলেন। ভারতবর্ষে স্থায়ী তুর্কী-আফগান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইল।

মুসলমানদের বঙ্গদেশ বিজয়

কুতুবুদ্দিনের সুলতানী সাম্রাজ্য স্থাপন

কুতুবুদ্দিন আইবক (১২০৬-১০ খ্রীঃ): কুতুবুদ্দিন ছিলেন জাতিতে তুর্কী। বাল্যকালে তিনি ভাগ্যচক্রে ক্রীতদাসে পরিণত হন এবং নানা বিপর্যয়ের পর মহম্মদ ঘুরীর নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। মহম্মদ ঘুরী তাঁহার সাহস ও কর্মকুশলতার জন্য তাঁহাকে ভারত অভিযানের একজন বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ও একটি সৈন্যদলের নায়কের পদে নিযুক্ত করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর বিজয়ী মহম্মদ ঘুরী কুতুবুদ্দিনকে তাঁহার হিন্দুস্থানের বিজিত দেশের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। অপুত্রক মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি সুলতান উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসেন এবং ভারতে সর্বপ্রথম এক স্বাধীন মুসলমান রাজত্বের পত্তন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম দাসরাজ বংশ।

বাল্য জীবন

মহম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ১১৯২-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মীরাট, রণথম্ভোর, ঝান্সি, কালিঞ্জর, বুন্দেলখন্ড প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তখন বাংলাদেশে ইখতিয়ার-উদ্দিন এবং মুলতানে নাসির-উদ্দিন কাবাচা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কুতুবুদ্দিন প্রথমে কাবাচার সঙ্গে বিরোধে উপনীত হইলেও পরে নিজের ভগ্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কিরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইলদিজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নিজ কন্যাকে প্রিয় অনুচর ও ক্রীতদাস ইলতুৎমিসের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সমস্ত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলে কুতুবুদ্দিনের নব-বিজিত এবং প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল।

কুতুবুদ্দিন মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১২০৬-১০ খ্রীঃ)। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কোন নূতন রাজ্য জয় করেন নাই। পূর্ব-বিজিত রাজ্যগুলিকে সুসংবদ্ধ এবং সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

শাসক হিসাবে কুতুবুদ্দিন ছিলেন সাহসী ও উদারচেতা। তিনি দানশীলতার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'লাখবক্স' (লক্ষমুদ্রা বিতরণকারী) বলিত। বিশ্বস্ত মুসলমান হিসাবে তিনি ভারতে ইসলাম ধর্মমতের প্রসার করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী ও আজমীরে দুইটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ এবং হাসান তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

কিন্তু যুদ্ধজয় এবং শাসনকার্যে তিনি অনেক সময় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি কালিঞ্জরে বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং ধ্বংসাবশেষের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মধ্য যুগের ইতিহাসে এই ধরনের ধর্মান্ধতা এবং নিষ্ঠুরতা ব্যতিক্রম নয়, বরং স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। কুতুবুদ্দিনের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব হইল ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপন। ১২১০ খ্রীষ্টাব্দে চৌগান বা পোলো খেলার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ইলতুৎমিস ঃ (১২১১-৩৬ খ্রীঃ) ঃ যদিও কুতুবুদ্দিন দিল্লীর সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন ইলতুৎমিস। কুতুবুদ্দিনের জামাতা হইবার পর তিনি বদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে আমীরদের সাহায্যে অযোগ্য আরাম শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনি দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসনারোহণের পর তিনি তিনটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হন ; যথা—(১) বিদ্রোহী রাজা ও আমীরদের দমন করা, (২) প্রতিদ্বন্দ্বী নাসিরউদ্দিন কাবাচা এবং তাজউদ্দিন ইলদিজকে পরাজিত করা এবং (৩) দিল্লীর মসনদে নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলমান শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

(১) গোয়ালিয়র এবং রণথম্ভোরের হিন্দু রাজাগণ, লাহোরের মুসলমান আমীরগণ ইলতুৎমিসকে সুলতানরূপে মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। এমন কি দিল্লীর অভ্যন্তরেও কিছু আমীর-ওমরাহ তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে চাহিলেন না। তাঁহারা ইলতুৎমিসের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলে তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করিলেন। মোঙ্গল আক্রমণকারী চেঙ্গিস খাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি একে একে রণথম্ভোর, ঝালোর, যোধপুর, গোয়ালিয়র, মালব প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া একদিকে যেমন হিন্দু রাজাদের ক্ষমতা প্রতিহত করিলেন, অপরদিকে তেমনি শিশু তুর্কী সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করিলেন।

(২) সিন্ধুদেশের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কাবাচা এবং গজনীর শাসনকর্তা তাজউদ্দিন ইলদিজ ইলতুৎমিসের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার হুমকী দেন। বাংলা এবং বিহারের শাসনকর্তা আলি মরদান খিলজীও নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া ইলতুৎমিসের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। তিনি তাজউদ্দিনকে পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাব পুনরধিকার করেন। নাসিরউদ্দিন কাবাচাকে তিনি লাহোর হইতে বিতাড়িত করেন। বাংলাদেশে আলি মরদান খিলজীকে দমন করিয়া ইলতুৎমিস তৎস্থলে আলাউদ্দিন মালিক জানি নামে এক ব্যক্তির উপর বাংলার শাসনভার অর্পণ করিলেন।

তাজউদ্দিন এবং নাসিরউদ্দিনকে দমন

ইলতুৎমিসের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা তেমুচিন বা চিঙ্গিজ খাঁর ভারত আক্রমণ। এই মোঙ্গল বীর যখন পশ্চিম এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন তখন খারজম বা খিবাব জ্যালালউদ্দিন নামে একজন পলাতক রাজার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে তিনি ভারতের সিন্ধুতীরে আসিয়া উপস্থিত হন (১২২১ খ্রীঃ)। এই পলাতক রাজা ইলতুৎমিসের আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন ; কিন্তু জালালউদ্দিনকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিয়া ইলতুৎমিস রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভারত-ভূমি হইতে জালালউদ্দিনের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোঙ্গল আক্রমণকারীও স্বেচ্ছায়

মোঙ্গল আক্রমণ

ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ফলে ভারতবর্ষ তখনকার মত চিঙ্গিস খাঁর সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। ইহাই হইল ভারতে প্রথম মোঙ্গল আক্রমণ।

ইলতুৎমিসকে বাগদাদের খলিফা একটি মানপত্র দিয়া সুলতানরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। সুলতানের নূতন উপাধি হইল 'সুলতান-ই-আজম' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুলতান।

দিল্লীর সুলতানরূপে খলিফার স্বীকৃতি

কৃতিত্ব ঃ নব-প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্যকে আসন্ন পতনের হাত হইতে তিনি রক্ষা করেন। একাধারে বিদ্রোহ দমন, রাজ্য শাসন ও দেশরক্ষা, রাজ্য বিস্তার ও সংহতি স্থাপন, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, জ্ঞানী-গুণীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ গুণের জন্য তিনি সুলতানী আমলের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহারই উদ্যোগে বিখ্যাত 'কুতুব মিনার'-এর নির্মাণ কার্য সুসম্পন্ন হয়। কুতুবুদ্দিন ইহার নির্মাণ কার্যে হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। খাজা কুতুবুদ্দিন নামে জনৈক ফকিরের নামে এই স্তম্ভটির নামকরণ করা হইয়াছিল। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্যা কন্যা রাজিয়া সুলতান হন। তিনিই দিল্লীর সিংহাসনে প্রথম ও শেষ শাসনকর্ত্রী রূপে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সুলতানী সাম্রাজ্যের গঠনকর্তা হিসাবে ইলতুৎমিসের দান

গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-৮৭ খ্রীঃ) ঃ ইলতুৎমিসের ন্যায় বলবনও ছিলেন ইলবারী তুর্কী বংশোদ্ভূত। তিনি বাল্যকালে ও যৌবনে ছিলেন জামালউদ্দিন নামে এক ব্যক্তির ক্রীতদাস। জামালউদ্দিন বলবনকে দিল্লীতে লইয়া আসেন এবং ইলতুৎমিসের নিকট বিক্রয় করেন। বিখ্যাত 'চল্লিশই-' বা বন্দেগান-ই-চাহেলগানের তথা ইলতুৎমিসের চল্লিশজন ক্রীতদাসের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। রাজিয়ার আমলে তিনি আমীর-ই-শিকার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম উলুঘ খাঁ। তিনি ধর্মভীরু সুলতান নাসিরুদ্দিনের শ্বশুর ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা মঙ্গু সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিলে উলুঘ খাঁ মোঙ্গলদের পরাজিত করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

প্রাক্-সুলতানী জীবন

বলবনের দিল্লীর শাসনকালকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রধান মন্ত্রী হিসাবে (১২৪৬-৬৬ খ্রীঃ) এবং স্বাধীন সুলতান হিসাবে (১২৬৬-৮৭ খ্রীঃ)।

প্রধান মন্ত্রী হিসাবে বলবন ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা। দুর্বল চিত্ত, ধর্মভীরু এবং ন্যায়পরায়ণ জামাতা নাসিরুদ্দিন নামে মাত্র সুলতান ছিলেন। এই সময়ে তিনি জাড্ এবং বিতস্তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিয়া (১২৪৬ খ্রীঃ) ; খোখার এবং অন্যান্য উপজাতীয় দলকে বিধ্বস্ত করেন। দোয়াবের বিদ্রোহী হিন্দুদের বিরুদ্ধে তিনি

প্রধান মন্ত্রী (১২৪৬-৬৬খ্রীঃ) রূপে কৃতিত্ব

কতকগুলি অভিযান প্রেরণ করেন। ইহা ছাড়া গোয়ালিয়র, চন্দেরী, মালব প্রভৃতি রাজ্যের শাসকদেরও পরাজিত করিয়াছিলেন। জনৈক আমীরের বিরুদ্ধাচরণের ফলে তিনি সাময়িকভাবে (১২৫৩ খ্রীঃ) ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বীয় ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করেন। অপুত্রক জামাতা নাসিরুদ্দিনের মৃত্যু হইলে ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিণত বয়সে তিনি দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন।

সুলতান হিসাবে বলবন অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি নূতন কোন রাজ্য বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থাগুলিকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা যায়; (১) বিদ্রোহ দমন ও শান্তি স্থাপন, (২) মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, (৩) সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং (৪) নরপতিত্বের নব আদর্শ ও রাজকীয় ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা।

ওমরাহদের শায়েস্তা

কঠোর হস্তে মেওয়াটি দস্যুদের দমন

দোয়াবের জমিদার-দের দমন

(১) **বিদ্রোহ দমন ঃ** বলবন সুলতান হইয়াই প্রথমে আমীর-ওমরাহদের শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন, কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন এবং তাঁহাদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ম নজর রাখিলেন। মেওয়াটি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করিয়া তিনি জনসাধারণের জীবনযাত্রা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের পথ বিপন্মুক্ত করিলেন। এই সমস্ত অঞ্চলে তিনি সৈন্য মোতায়েন করিলেন। দীর্ঘ ৬০ বৎসর পরে বরণী লিখিয়াছেন, "রাস্তাঘাটে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল না।" দোয়াব অঞ্চলের সামসীর জমিদারগণ উর্বর জমির স্বত্ব ভোগ করিয়া অতিশয় অর্থশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইহেতু তিনি তাঁহাদের জমির ভোগ দখল স্বত্ব কাড়িয়া লইলেন। ভীতি প্রদর্শন দ্বারা ইঁহাদের অনেককে দিল্লীর অধীনতা মানিতে বাধ্য করিলেন।

বাংলার তুঘ্‌রিল খাঁকে দমন ও হত্যা

বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁর বিদ্রোহ দমন তাঁহার রাজত্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগে তুঘরিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য পর পর দুইটি অভিযান প্রেরণ করিয়াও ব্যর্থ হওয়ায় বৃদ্ধ সুলতান বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য নিজে বাংলায় গমন করেন। তুঘরিল খাঁকে পরাজিত এবং নিহত করিয়া তিনি তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রাজপথে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন এইজন্য যে ভবিষ্যতে আর কেহ দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে যাহাতে বিদ্রোহ করিতে সাহসী না হয়। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(২) **মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ঃ** বলবন মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য প্রথমতঃ সীমান্তের কয়েকটি দুর্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন, কয়েকটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন এবং শের খাঁ নামক এক আত্মীয়ের উপর মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার ভার দিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, তিনি শের খাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি নিজের দুই পুত্র মহম্মদ এবং বুঘরা খাঁকে সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে বারংবার আক্রমণ সত্ত্বেও মোঙ্গলগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ১২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ সুলতান পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

(৩) **সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ** সুলতানী শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি শাসন-ব্যবস্থার অনেক সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা হ্রাস করিয়াছিলেন। পক্ষপাতশূন্য বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইসলামীয় আইনানুসারে বিচার কার্য চলিত। বিচারে প্রভু-ভৃত্য সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হইত। শাস্তিদানে কোন তারতম্য করা হইত না। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি গুপ্তচর ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সামরিক সংগঠন-কর্তা হিসাবেও তাঁহার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁহার সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার ফলে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দিল্লীর সুলতানী শাসন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

পক্ষপাতশূন্য বিচার ব্যবস্থা

সামরিক সংগঠন

(৪) **নরপতিত্বের নব-আদর্শ ও রাজকীয় মর্যাদা ঃ** রাজকীয় মর্যাদাকে বলবন অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিতেন। তিনি জাঁক-জমকপূর্ণ রাজসভা পছন্দ করিতেন। তিনি রাজার ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পারস্যের সুলতানদের অনুকরণে আদব-কায়দা, যেমন—'সিজদা (রাজার সম্মুখে নতজানু হওয়া) পাইবস (সিংহাসন চুম্বন) প্রচলন করেন। তিনি রাজার প্রতি প্রজাবর্গের আনুগত্য এবং ভীতির সঞ্চার করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহার ফলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়াও জানা যায়; সমকালীন লেখকগণের উক্তি দ্বারা তাহা সমর্থিত হয়। প্রসিদ্ধ আমীর খসরু ছিলেন তাঁহার সভাকবি।

দিল্লীর ইলবারী তুর্কী সুলতানদের মধ্যে বলবন শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। ইলতুৎমিসের অপেক্ষা তাঁহার অবদান শ্রেষ্ঠতর। তিনি ছিলেন বাস্তব রাজনীতি-জ্ঞানসম্পন্ন দূরদর্শী শাসক। তিনি চল্লিশ বৎসর (১২৪৬-৮৬ খ্রীঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। রাজস্ব সংগঠন, বিদ্রোহ দমন, সামরিক বাহিনীর সংস্কার ও শক্তি বৃদ্ধি, সীমান্ত প্রতিরক্ষা এবং রাজকীয় মর্যাদাবৃদ্ধির দ্বারা সুলতানী শাসন-ব্যবস্থাকে শক্ত ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার মৃত্যুর চারি বৎসরের মধ্যে বলবনী দাসরাজ বংশের পতন ঘটিয়াছিল সত্য কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকার আলাউদ্দিন খিলজীর সাফল্যের সোপান রচনা করিয়াছিল বলা যায়।

কৃতিত্ব

পঞ্চম অধ্যায়
খিলজী সাম্রাজ্যবাদ

বলবনের পৌত্র কাইকোবাদের অযোগ্য শাসনে অরাজকতার সুযোগ লইয়া জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজী নামে জনৈক আফগান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১২৯০ খ্রীঃ)। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে 'খিলজী বিপ্লব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইলবারী তুর্কীদের সিংহাসনচ্যুত করিয়া খিলজী-শাসন দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রমাণিত হইল যে দিল্লীর সুলতানি কোন এক বংশের একচেটিয়া অধিকার নয়। আলাউদ্দিন খিলজী দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার পর হইতে দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। খিলজী সাম্রাজ্যবাদের ফলে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়াছিল।

জালালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন সুলতানের অনুমতি লইয়া ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে মালবের ভিলসা দুর্গটি জয় ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ জালালউদ্দিন তাঁহাকে কারা এবং এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ধনরত্ন লাভের আশায় তিনি ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জালালউদ্দিনের বিনা অনুমতিতে দেবগিরি আক্রমণ করিলেন। সেখানকার যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রদেব পরাজিত হইলেন এবং বিপুল ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া আলাউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে ইহাই প্রথম মুসলমান অভিযান।

বিজয়ী আলাউদ্দিনের ক্ষমতালিপ্সা দিন দিন বাড়িতেছিল। তিনি স্নেহশীল পিতৃব্য বৃদ্ধ জালালউদ্দিনকে ষড়যন্ত্র করিয়া অভিনন্দন মঞ্চে নিহত করিলেন। শুধু তাহাই নয়, জালালউদ্দিনের উত্তরাধিকারীদেরও একে একে হত্যা করিয়া সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত স্বর্ণ ও অর্থের সাহায্যে আমীর-ওমরাহদের বশীভূত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন (১২৯৬ খ্রীঃ)।

আলাউদ্দিন খিলজীর প্রাথমিক সমস্যা ও তাহার সমাধান (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)ঃ আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াসী হন।

(১) তিনি জালালউদ্দিনের বিধবা মহিষী মালিকা জাহান এবং তাঁহার পুত্র রুকনুদ্দিনকে কারারুদ্ধ করিলেন। (২) আমীর-ওমরাহদের মধ্যে একদিকে প্রচুর অর্থ বিতরণ করিলেন, অপরদিকে বিদ্রোহীদের দমন করিয়া কঠোর শাস্তি দিলেন। (৩) দিল্লীর উপকণ্ঠে বসবাসকারী মোঙ্গল তথা নব-মুসলমানগণ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে দৃঢ় হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া একদিনে প্রায় ত্রিশ সহস্র নব-মুসলমানকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিলেন। অতঃপর তাহারা আর কখনও বিদ্রোহ করে নাই। (৪) আলা-উদ্দিনের রাজত্বের গোড়ার দিকে মোঙ্গলরা বারংবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। ১২৯৬

নব-মুসলমানদের দমন ও হত্যাকাণ্ড

খ্রীষ্টাব্দে দুইবার, ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে একবার, ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুতলুঘ খাঁর অধীনে দুইবার এবং ১৩০৩ হইতে ১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনবার মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করিয়া আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। সুলতানের বন্ধু জাফর খাঁ গোড়ার দিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুতলুঘ খাঁর ভারত আক্রমণ-কালে জাফর খাঁ প্রাণ হারাইলে সুলতান নিজে সীমান্ত রক্ষা এবং মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সীমান্তের (যথা—পাঞ্জাব, মুলতান এবং সিন্ধুদেশের) পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার এবং নূতন নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। তাহা ছাড়া, সীমান্তের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া এবং মোঙ্গলদের প্রতিরোধের জন্য বিশাল সৈন্য-বাহিনী মোতায়েন করিয়া তিনি মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। (৫) বিভিন্ন প্রদেশের বিদ্রোহও তিনি কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহের কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শুধু যে প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন তাহা নয়, ভবিষ্যতে সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ

খিলজী সাম্রাজ্যবাদ (আলাউদ্দিনের রাজ্যবিজয় অভিযান) ঃ আলাউদ্দিনের সময়েই প্রথম দিল্লীর সুলতানি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করিয়াছিল। তিনি আলেকজাণ্ডারের মত পৃথিবী বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। উলসি হেইগের (Wolsey Haig) ভাষায়, "আলাউদ্দিন সাম্রাজ্য বিজয়ে আলেকজাণ্ডারকে এবং নবধর্ম প্রবর্তন করার ব্যাপারে মহম্মদকে ছাড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন।" কিন্তু ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুলতানী আধিপত্য স্থাপন না করিয়া বিশ্ববিজয়ের অলীক স্বপ্ন কার্যে পরিণত করা কখনও সম্ভব ছিল না। সেইজন্য আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর ব্যাপক রাজ্য বিজয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী অভিযানগুলি 'খিলজী সাম্রাজ্যবাদের' সূচনা করিয়াছিল।

রাজ্যবিস্তার

উত্তর-ভারত অভিযান ঃ গুজরাটের রাজা কর্ণদেবের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন প্রথম অভিযান প্রেরণ করিয়া (১২৯৭ খ্রীঃ) তাঁহাকে সহজে পরাজিত করিলেন। কর্ণদের পলায়ন করিয়া দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়ী সেনাপতি নসরৎ খাঁ সমৃদ্ধ ক্যাম্বে বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে মালিক কাফুর এবং কর্ণদেবের মহিষী কমলাদেবীকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনিলেন। মালিক কাফুর পরবর্তী কালে আলাউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি এবং কমলাদেবী প্রধানা মহিষীপদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

গুজরাট

রণথম্ভোর বিজয় (১২৯৯-১৩০১ খ্রীঃ) ঃ রাজপুতানার স্বাধীন রাজ্যগুলি দিল্লী সুলতানির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এবং বিদ্রোহী নব-মুসলমানদের আশ্রয় দিয়া আলাউদ্দিনের বিরাগভাজন হইয়াছিল। তাহাদের শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে প্রথমে উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁর অধীনে এবং পরে নসরৎ খাঁ নিহত হইলে আলাউদ্দিন নিজে সসৈন্যে রণথম্ভোর দুর্গটি আক্রমণ করিলেন। এক বৎসর অবরোধ করিবার পর মন্ত্রী রণমলের বিশ্বাসঘাতকতায় আলাউদ্দিন তাহা দখল করিয়া লইলেন (১৩০১ খ্রীঃ)।

চিতোর বিজয় (১৩০৩ খ্রীঃ) ঃ রাজপুতানার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ মেবারের রাজধানী হইল চিতোর। আলাউদ্দিনের পূর্বে অন্য কোন মুসলমান সুলতান চিতোর অধিকার করিতে পারেন নাই। এই ঐতিহাসিক রাজপুত নগরী দখল করার

জন্য সুলতান নিজে বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন। কর্ণেল টড প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, মেবারের রাণা রতনসিংহের পরমাসুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে লাভ করিবার জন্য সুলতান এই অভিযান চালনা করিয়াছিলেন কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণ (যেমন, ডঃ কে. এস. লাল, জি. এইচ. ওঝা) এই কাহিনী সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, মেবার অভিযানের পিছনে রাজপুতানায় দিল্লীর প্রভুত্ব স্থাপন করা যে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সম্রাটের অনুগামী আমীর খসরু পদ্মিনী সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

চিতোর অভিযান ও পদ্মিনী উপাখ্যান

অতঃপর আলাউদ্দিন মালব, মারওয়ার, কারা, উজ্জয়িনী, চন্দেরী, মান্ড প্রভৃতি রাজ্যগুলি জয় করেন।

দক্ষিণ-ভারত বিজয়ঃ আলাউদ্দিনের উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত অভিযানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমত, তিনি দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে সরাসরি দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত না করিয়া করদ রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন; কারণ দিল্লী হইতে দূরবর্তী এই রাজ্যগুলি সরাসরি শাসন করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুরকে এই অভিযানগুলির অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দিনের সময় দাক্ষিণাত্যে প্রধান চারিটি রাজ্য ছিল।—যথাক্রমে (১) দেবগিরির (বর্তমান দৌলতাবাদ) যাদব রাজ্য, (২) তেলেঙ্গনার (রাজধানী বরঙ্গল) কাকতীয় রাজ্য, (৩) কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে (রাজধানী দ্বারসমুদ্র) হোয়সল রাজ্য এবং (৪) সুদূর দক্ষিণের (রাজধানী মাদুরা) পান্ড্য রাজ্য।

(১) রামচন্দ্রদেব পূর্ব-প্রতিশ্রুত বার্ষিক করদান বন্ধ করিয়া দিয়া এবং গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণদেবকে ও তাঁহার কন্যা দেবলাদেবীকে আশ্রয়দান করিয়া দিল্লীর সুলতানের অসন্তোষ এবং ক্রোধের উদ্রেক করিয়াছিলেন। তাঁহাকে শাস্তি দিতে সুলতান সেনাপতি মালিক কাফুরকে ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবগিরি অভিযানে পাঠাইলেন। রামচন্দ্রদেব পরাজিত হইয়া পুনরায় করদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব পিতৃ প্রতিশ্রুত করদান বন্ধ করেন। আলাউদ্দিন পুনরায় মালিক কাফুরকে প্রেরণ করিয়া শঙ্করদেবকে পরাজিত এবং নিহত করেন। অতঃপর দেবগিরি রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

দেবগিরি অভিযান

(২) ১৩০৮ খ্রীষ্টাব্দে কাফুর তেলেঙ্গনার কাকতীয় রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পর কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্রদেব সুলতানী বাহিনীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং বার্ষিক করদানে স্বীকৃত হইলেন।

(৩) ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে কাফুর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে হোয়সল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হোয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লাল পরাজিত হইয়া বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইলেন।

(৪) পরবর্তী বৎসর কাফুর সুদূর দক্ষিণে পান্ড্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাদের গৃহবিবাদের সুযোগে সহজেই এই রাজ্যটি দখল করিয়া লইলেন। বিজয়ী কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া রামেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি ধ্বংস করিলেন এবং পান্ড্য রাজ্যে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

আলাউদ্দিনের শাসন-ব্যবস্থা ঃ আলাউদ্দিন সুষ্ঠু ও কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছেন। গিয়াসউদ্দিন বলবনের মত তিনিও 'ভগবৎ দত্ত রাজকীয় ক্ষমতা'র নীতিতে (**Divine Right of Kingship**) বিশ্বাস করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে রাজাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা; তাঁহার অনুশাসনই হইল রাজ্যের আইনবিধি এবং ইসলামীয় শাসন-ব্যবস্থায় উলেমাদের যে অহেতুক প্রাধান্য আছে তাহা রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী। মুসলমান শাসক হিসাবে ইসলামীয় রাষ্ট্র শাসনের আদর্শে রাজ্য শাসন করিলেও তিনি ইলতুৎমিসের মত বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে কোন স্বীকৃতিপত্র লাভ, 'মিলাৎ'-এর অনুমোদন কিংবা বৃহৎ ইসলামীয় সাম্রাজ্যের অংশরূপে ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসন করার চেষ্টা করেন নাই। তিনি বলিতেন, "আমি ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম বুঝি না, রাজ্যের প্রয়োজনে যা করণীয় তাহা করিব।"[১] ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, আলাউদ্দিন বিনা দ্বিধায় ইসলামের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতে পারিতেন এবং তাহা করিতেন।

আলাউদ্দিনের রাজকীয় মতাদর্শ

আলাউদ্দিনের শাসন-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। (১) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা, (২) অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাসের বিধি ব্যবস্থা, (৩) হিন্দু-পীড়ন, (৪) রাজস্ব নীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা—মূল্য-নিয়ন্ত্রণ এবং (৫) সামরিক শক্তি বৃদ্ধি।

আলাউদ্দিন বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রধানতঃ চারিটি কারণকে বিদ্রোহের ইন্ধন যোগানদার বলিয়া স্থির করিলেন। (১) সুলতান এবং আমীর-ওমরাহদের রাজকার্যে অবহেলা, (২) মদ্যপান, (৩) আমীর-ওমরাহদের সামাজিক সম্বন্ধ, (৪) অভিজাতদের আর্থিক প্রাচুর্য। ভবিষ্যতে যাহাতে বিদ্রোহ না ঘটিতে পারে সেইজন্য তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

প্রতিবিধান

প্রথমতঃ, আমীর-ওমরাহ এবং রাজকর্মচারীরা পূর্ববর্তী সুলতানদের নিকট হইতে বিনা খাজনায় যে সমস্ত জায়গীর পাইয়াছিলেন তিনি তাহার বিলোপসাধন করিলেন।

---

(১) "I do not know whether that is lawful or unlawful, whatever I think to be for the good of the state or suitable for the emergency, that I decree......" Vide Iswari Prasad—A Short History of Muslim Rule in India

দ্বিতীয়তঃ, আমীর-ওমরাহদের দরবারে এবং প্রকাশ্য সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে মদ্যপান নিষিদ্ধ করিলেন। মদ্যপানের ফলে আমীরগণ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় অসংযত আচরণ এবং অনেক সময় রাজদ্রোহমূলক উত্তেজনা সৃষ্টি করিত। সম্রাট নিজেও মদ্যপান ত্যাগ করিলেন।

মদ্যপান নিষেধ

তৃতীয়তঃ, আমীর-ওমরাহদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক তথা বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তিনি নিয়ম করিলেন যে অভিজাতগণ সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে বা অন্য কোন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানেও তাহাদের মেলামেশা বন্ধ হইল।

সামাজিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ

চতুর্থতঃ, অভিজাতদের আর্থিক প্রাচুর্য হ্রাস করিবার জন্য সুলতান তাহাদের 'মিলক', 'ইমাম' এবং 'ওয়াকফ' প্রভৃতি জায়গীর জমি বাজেয়াপ্ত করিলেন এবং সম্পদ সঞ্চয়ের সব রকম পথ বন্ধ করিলেন।

জমি বাজেয়াপ্তকরণ

পঞ্চমতঃ, রাজ্যের অভিজাতদের, রাজকর্মচারীদের এবং অন্যান্য সংবাদ সরবরাহের জন্য প্রচুর গুপ্তচর নিয়োগ করা হইল।

গুপ্তচর

হিন্দু পীড়ন : সুন্নী মুসলমান আলাউদ্দিন ইসলামের বিধান অনুযায়ী বিধর্মীদের (হিন্দুদের) প্রতি কঠোর নির্যাতনমূলক নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের আয়ের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। তাহার উপর ছিল জিজিয়া কর, গোচারণ কর, গৃহকর, বাণিজ্যকর প্রভৃতি।

হিন্দুদের উপর করভার

অর্থনৈতিক নীতি : এই নীতির প্রধান দুইটি ভাগ হইল—রাজস্ব আদায় এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ। আলাউদ্দিনের রাজস্বনীতি ছিল একদিকে অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করার এবং অপরদিকে সামরিক বাহিনীর ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পররাজ্য লুণ্ঠন, অভিজাতদের সম্পত্তি হরণ, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারিগণকে কঠোর হস্তে রাজস্ব আদায় করিতে হইত।

অর্থসংগ্রহ

নিত্যব্যবহার্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্থায়ী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিয়া সুলতান সামরিক বাহিনীর ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস করিতে তথা সৈনিকদের মাহিনা স্থিতিশীল রাখিতে পারিয়াছিলেন। রাজকীয় শস্যাগারে সংগৃহীত শস্য সংরক্ষিত হইত। ব্যবসায়িগণকে সর-ই-আদল নামে বিপণি কেন্দ্রে বিক্রয়ের জন্য শস্য লইয়া আসিতে হইত। কৃষকদের নিকট হইতে শস্য ক্রয়ের জন্য সরকারী অনুমতি লইতে হইত। 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ' এবং 'শাহান-ই-মন্ডী' নামে দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন দ্রব্য ওজনে কম দিলে অথবা নির্ধারিত মূল্যের বেশী লইলে

বাজার বিধি

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

বিক্রেতার শরীর হইতে সমপরিমাণ মাংস কাটিয়া লওয়া হইত। বর্তমান কালের মত দ্রব্যমূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন হইত না। তাঁহার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি শুধু মধ্য যুগে কেন, আধুনিক যুগেও অভিনব। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়ের চাকরিজীবীদের পক্ষে খুব সুবিধা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা কেবল দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্রব্যমূল্যে নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রশংসা করিয়া ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে মধ্য যুগের একজন 'দুঃসাহসিক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ' (**A daring political economist**) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই মৌলিকত্ব প্রশংসনীয়।

শিল্প, স্থাপত্য এবং সাহিত্যের প্রতিও আলাউদ্দিনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি দিল্লীর সন্নিকটে সিরি নামক একটি নূতন নগরের পত্তন করিয়াছিলেন। কুতুবমিনার মসজিদটির সংস্কার করিয়া তিনি একটি প্রবেশ দ্বার—আলাই দরওয়াজা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কবি আমীর খসরু ছিলেন তাঁহার সভাকবি। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী তাঁহার রাজসভায় ছিলেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ আলাউদ্দিনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী বলেন যে, তিনি নৃশংস হত্যাকারী শাসক ছিলেন। মিশরের ফ্যারাও অপেক্ষাও তিনি বেশী রক্তপাত করিয়াছিলেন।[১] আবার আফ্রিকার ভ্রমণকারী ইবন্-বতুতা বলেন যে আলাউদ্দিন দিল্লী সুলতানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। এই দুই বিপরীত মত হইতে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই যে, আলাউদ্দিন ব্যক্তিগত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল এবং নৃশংস হইলেও শাসক হিসাবে তিনি সমসাময়িককালে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু সামরিক শক্তির উপর সমস্ত রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া তিনি মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন।[২] সামরিক শক্তির দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শাসন-ব্যবস্থারও পতন ঘটে। প্রজাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য যে সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি এই সত্য তিনি অনুধাবন করেন নাই। তাই তাঁহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খিলজী সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে।

বৃদ্ধ সুলতান ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে কাফুরের ষড়যন্ত্রে রোগশয্যায় প্রাণত্যাগ করেন।

(১) "He shed more innocent blood than ever the Pharao of Egypt was guilty of."

(২) The foundation of the military monarchy that be tried to build up was, however laid upon sand Vide Advanced History of India

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলক

আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে বসেন এবং পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন্-তুঘলক নাম ধারণ করিয়া ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘলক (১৩২৫-৫১ খ্রীঃ): মহম্মদ-বিন্-তুঘলক মধ্য যুগের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁহার চরিত্রে বিচিত্র গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তিনি ছিলেন একাধারে সুপণ্ডিত, সুকবি, সুসাহিত্যিক এবং জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শী।

চরিত্র

দানশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ধর্মসহিষ্ণুতা, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। সমকালীন ঐতিহাসিক ও পর্যটক ইব্‌ন-বতুতা এবং জিয়াউদ্দিন বরণী তাঁহাকে বিভিন্নভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বরণী বলেন যে, তিনি ছিলেন 'বিশ্বের বিস্ময়'। ইব্‌ন-বতুতা ভিন্ন মত পোষণ করেন। এলফিনস্টোন, হ্যাভেল, এডওয়ার্ড টমাস, ওলসী হেগ, স্মিথ প্রভৃতি পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে রক্তপিপাসু, স্বপ্নবিলাসী এবং বিকৃত মস্তিষ্ক সুলতানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অপর দিকে গার্ডিনার ব্রাউন, ঈশ্বরী প্রসাদ প্রভৃতি লেখকের বর্ণনায় তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মতে, মহম্মদ-বিন্-তুঘলক একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তাঁহার পরিকল্পনাগুলি বাস্তব জ্ঞান বর্জিত হওয়ার জন্য ব্যর্থ হইয়াছিল, বিকৃত মস্তিষ্ক প্রসূত নীতির জন্য নয়। তাঁহার সংস্কার নীতিগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। শাসন-ব্যবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁহার পরিকল্পিত সংস্কার নীতিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল:

(১) **রাজস্ব সংস্কার:** তিনি সরকারী আয়বৃদ্ধির জন্য গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী উর্বর দোয়াব অঞ্চলের রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। সেই সময় দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তদুপরি বাড়তি রাজস্ব আদায় করিবার জন্য সুলতানের কর্মচারিগণ সেখানকার প্রজাদের উপর উৎপীড়ন শুরু করিল। কৃষকরা কৃষিকার্য পরিত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুলতানের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষের সৃষ্টি হইল; তাহারা বিদ্রোহ করিল। সুলতান ক্ষিপ্ত হইয়া সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। ইহার ফলে রাজস্ব আদায় হইলই না; বরং সুলতানকে কৃষিঋণ, জলসেচের সাহায্য প্রভৃতি সুবিধা দিয়া কৃষকদের কৃষিকার্যে পুনরায় নিযুক্ত করিতে হইল।

(২) **রাজধানী স্থানান্তর :** মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিকল্পনা হইল দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তন। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে একাধিক কারণ ছিল। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপন করা ; দ্বিতীয়তঃ, মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রাজধানী নিরাপদ রাখা ; তৃতীয়তঃ, দেবগিরি হইতে দক্ষিণ-ভারতে সুলতানী শাসন পরিচালনা করার সুবিধা এবং চতুর্থতঃ, দিল্লীর আমীর-ওমরাহদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত থাকা।

সুলতান দিল্লী হইতে সমস্ত অধিবাসীকে দৌলতাবাদে যাওয়ার আদেশ দিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। তিনি শুধু সরকারী দপ্তরগুলি স্থানান্তর করিলে তাঁহার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইত না। দিল্লীর সমস্ত অধিবাসী সেখানে যাওয়ার অনেক অসুবিধা ছিল। প্রথমতঃ, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে গিয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, দৌলতাবাদের জলবায়ু দিল্লীবাসীদের সহ্য হইল না। তৃতীয়তঃ, সেখানে দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীর স্থান সঙ্কুলান হইল না। চতুর্থতঃ, সুলতান নিজেই কিছুদিন পরে সকলকে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিবার আদেশ দিলেন। এইভাবে যাওয়া-আসার ফলে প্রচুর অর্থব্যয় হইল। মোঙ্গলগণ এই গোলযোগের সুযোগে দিল্লী আক্রমণ করিল ; জনসাধারণ অব্যবস্থিতচিত্ত সম্রাটের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হইল এবং 'পাগলা রাজা' বলিয়া তাঁহাকে চিহ্নিত করিল। লেন-পুলের ভাষায় সুলতানের "দৌলতাবাদ প্রচেষ্টা ব্যর্থ শ্রমের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া রহিল।"[১]

(৩) **তামার নোট প্রচলন :** রাজধানী পরিবর্তনে, বিদ্রোহ দমনে, দুর্ভিক্ষ দূরীকরণে, রৌপ্যমুদ্রার মূল্য হ্রাস প্রভৃতি কারণে রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য মহম্মদ-বিন্-তুঘলক চীন ও পারস্য সম্রাটের অনুকরণে তামার নোট প্রচলন করিলেন। কিন্তু জাল নোট বন্ধ করিবার জন্য কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করার ফলে সারা দেশ জাল নোটে ছাইয়া গেল। বিদেশী বণিকগণ এই নোট গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখা দিল। সুলতান বাধ্য হইয়াই স্বর্ণমুদ্রা দিয়া এইসব জাল নোট প্রত্যাহার করিলেন। শূন্য রাজকোষ শূন্যতর হইয়া পড়িল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলেও ইহার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। সুলতানের সতর্কতার অভাব এবং প্রজাদের অজ্ঞানতা ও অসাধুতা ইহার ব্যর্থতার মূল কারণ, পরিকল্পনার অবাস্তবতা নয়।

(৪) **খোরাসান এবং কারাজল জয়ের পরিকল্পনা :** কল্পনাবিলাসী সুলতান খোরাসান এবং ইরাক জয়ের জন্য প্রায় চার লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়াছিলেন খোরাসানী আমীরগণের দেশ আক্রমণের আহ্বানে।

---

(১) **Daulatabad was a moment of misdirected energy.**

কিন্তু পরে তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় এবং সমতলভূমির সৈন্যবাহিনী পর্বতসঙ্কুল হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া খোরাসান প্রদেশ আক্রমণ করিতে সাহসী না হওয়ায় সুলতান প্রায় দুই বৎসর সৈন্য সমাবেশ করার পর এই উদ্দেশ্য ত্যাগ করেন। ইহার ফলে রাজকোষের উপর ভীষণ চাপ পড়িল এবং সুলতানের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা প্রমাণিত হইল।

ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী কারাজল প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য তিনি অনুরূপভাবে বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলের দারুণ তুষারপাতে এবং খাদ্যাভাবে এই অভিযান ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহাতে সুলতানের অযথা প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে সুলতানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি তাঁহার সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যথাক্রমে বিজয়নগর এবং বহমনী নামে দুইটি স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের পত্তন করে। বাংলাদেশে মুসলমান আমীরদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়। আলী মুবারক নামে জনৈক আমীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সিন্ধু, মুলতান, লাহোর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তাগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এখন হইতেই দিল্লীর সুলতানী শাসনের পতন শুরু হয় বলা যায়।

ফলাফল

নানা গুণের অধিকারী ইতিহাসের বিস্ময়কর ব্যর্থ চরিত্র মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দেশের বিদ্রোহ ও অশান্তির মধ্যে সিন্ধুদেশে বিদ্রোহ দমনকালে থাট্টা নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বদাউনির ভাষায় 'তাঁহার মৃত্যুতে সুলতানের হাত হইতে প্রজারা মুক্তি পাইল এবং প্রজাদের হাত হইতে সুলতান মুক্তি পাইলেন।' (**'The King was freed from the people and they from the King'**)।

ইবন-বতুতার বর্ণনা ঃ মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবন-বতুতা ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে কাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে সুলতানের দূত হিসাবে তিনি চীনদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি 'সফর-নামা' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ আট বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি সুলতানের খুব নিকট সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় সুলতানের চরিত্রের সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি সুলতানকে 'বিপরীতের সংমিশ্রণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১]

---

(১) **A mixture of contradictions.**

ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রীঃ): মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের মনোনীত উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন মহম্মদের খুল্লতাত রাজিবের হিন্দু-পত্নীর সন্তান। কিন্তু তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু-বিদ্বেষী ও ধর্মান্ধ মুসলমান শাসক ছিলেন এবং দিল্লীর সুলতানী শাসনকে পুরাপুরিভাবে ধর্মাশ্রয়ী শাসনে পরিণত করিয়াছিলেন।

সিংহাসনারোহণ

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে ফিরোজের রাজত্বকাল মুসলিম ভারতের ইতিহাসে আকবরের রাজত্বের পূর্বে এক গৌরবময় যুগ। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বরণী, সামস-ই-সিরাজ প্রভৃতি এবং পরবর্তী কালের হেনরী এলিয়ট, এলফিনস্টোন, উলসী হেইগ প্রভৃতি ফিরোজ শাহ তুঘলককে প্রজাবৎসল এবং ধর্মপরায়ণ সুশাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপর পক্ষে, ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেন যে ধর্মান্ধ মুসলমান ফিরোজের মধ্যে মহামতি আকবরের উদারতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ফিরোজকে সুলতানী আমলের আকবর বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

ঐতিহাসিকগণের মতামত

ফিরোজের জনহিতকর কার্যাবলী তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। কর্মহীন ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য তিনি কর্মপরিষদ (Employment Bureau) গঠন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান প্রজাদের জন্য দাতব্য হাসপাতাল, অবৈতনিক শিক্ষালয়, দরিদ্রদের জন্য দান বিভাগ স্থাপন, অনাথ এবং শিশুদের ভরণ-পোষণ এবং মুসলিম পরিবারের কন্যাদের বিবাহে যথোচিত সাহায্য দান প্রভৃতি অনেক প্রজাকল্যাণকর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে 'প্রজা' বলিতে তিনি একমাত্র মুসলমানদের মনে করিতেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, যান-চলাচলের জন্য নূতন পথ ও সেতু নির্মাণ, খাল খনন ও সেচ-ব্যবস্থা, নূতন নূতন নগর ও উদ্যান নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের দ্বারা তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিয়াছিলেন।

গোঁড়া মুসলমান শাসক হিসাবে তিনি ইসলাম অনুমোদিত চারি প্রকার কর ধার্য করিয়াছিলেন, যথা—খারাজ, খামস, জিজিয়া এবং জাকাৎ। শেষোক্ত কর দুইটি 'বিধর্মী' হিন্দুদের কাছ হইতে আদায় করা হইত। তিনি শাসন ব্যাপারে দূরদর্শী ছিলেন না। জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করিয়া তিনি রাজকর্মচারী এবং সৈনিক হইতে সেনাপতি পর্যন্ত সর্ব স্তরের সামরিক ব্যক্তিদের জায়গীর দান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সমস্ত সুলতানী সাম্রাজ্য জায়গীরদার সামন্তদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছিল।

জায়গীর প্রথার পুনঃপ্রবর্তন

ফিরোজ শাহ ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান শাসক। শুধু 'বিধর্মী' হিন্দুদের উপর

নয়, এমনকি সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের উপরও তিনি নির্যাতন করিতেন। তাঁহার আত্মজীবনী 'ফতুহাত-ই-ফিরোজশাহী'তে হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং তাহার উপর মসজিদ নির্মাণের কথা লেখা আছে। হিন্দুদের নানা প্রলোভন দেখাইয়া ধর্মান্তর করারও প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান উলেমাদের নির্দেশানুযায়ী ইসলাম ধর্ম ও শিক্ষা বিস্তার করা ছিল সুলতানের ধর্মান্ধ নীতি। তিনি সরকারী ব্যয়ে বহু মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন।

হিন্দু-বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতা

ফিরোজ শাহের সুদীর্ঘ শাসনকালে দিল্লী সুলতানির পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, তাঁহার হিন্দু নির্যাতন নীতির ফলে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। এমনকি উদার মুসলমানগণও এই গোঁড়া সুলতানের ধর্মান্ধতায় অসন্তুষ্ট হইল। দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশের সুলতান ইলিয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সুলতান পর পর দুইবার বাংলার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিলেন। বাংলাদেশ সুলতানী শাসন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। তৃতীয়তঃ, ফিরোজের রাজত্বের শেষের দিকে গুজরাট স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। সুলতানী বাহিনী কোনক্রমে এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল। কিন্তু ফিরোজ সামরিক কোন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বের প্রায় সব কয়টি সামরিক অভিযানে তিনি দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বংশানুক্রমিক এবং সামন্ত প্রথানুসারে গঠিত সামরিক বাহিনী কখনও শক্তিশালী হইতে পারে নাই। চতুর্থতঃ, বিরাট ক্রীতদাস বাহিনীর ভরণপোষণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহাদের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দান সুলতানের আর একটি ত্রুটি। ইহার ফলে একদিকে রাজকোষের উপর চাপ পড়িয়াছিল, অপরদিকে শাসন-ব্যবস্থায় দুর্বলতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

দিল্লী সুলতানি পতনে ফিরোজের দায়িত্ব

ফিরোজের ব্যর্থতা

সুতরাং সব দিক দিয়া বিচার করিয়া বলা যায় যে ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে ধর্মাশ্রয়ী শাসন-ব্যবস্থা সুলতানী সাম্রাজ্য পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ
ও
সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন

ফিরোজ শাহ তুঘলকের পরবর্তী সুলতানগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এবং শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেইজন্য ফিরোজ শাহের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই সুলতানী সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! একে একে জৌনপুর, গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশগুলি সুলতানী শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। দোয়াব অঞ্চলের হিন্দুরা করদান বন্ধ করিল। গোয়ালিয়র স্বাধীন হইয়া গেল। সুলতানী শাসন যখন এইভাবে ভাঙ্গনের মুখে তখন তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করিয়া সুলতানী সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিলেন।

তৈমুরলঙ্গ—পরিচিতি

তৈমুরলঙ্গ ছিলেন সমরখন্দের অধিপতি। তাঁহার পিতা আমীর তার্ঘি ছিলেন চাঘতাই তুর্কীদের নেতা। তৈমুর জন্মকাল হইতেই 'লঙ্গ' বা খোঁড়া ছিলেন। এইজন্য ইতিহাসে তিনি তৈমুরলঙ্গ বা '**Timur the Lame**' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং সমরকুশলী বীর। তিনি পারস্য, আফগানিস্তান জয় করিয়া ভারতের দিকে তাঁহার লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। শেষ তুঘলক সুলতানগণের সাম্রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকার ফলে তিনি আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইলেন। তিনি নিছক লুণ্ঠনকারী আক্রমণকে ধর্মীয় মোড়কে আবৃত করিয়া বিধর্মী হিন্দুদের নিধন, হিন্দু-ধর্ম সহিষ্ণুতার জন্য তুর্কী সুলতানদের শাস্তিদান এবং পৌত্তলিকতার বিনাশসাধন তাঁহার ভারত আক্রমণের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠনই ছিল তাঁহার আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আক্রমণের অজুহাত

ভারত আক্রমণ

শেষ তুঘলক সম্রাট নাসিরউদ্দিন মামুদের রাজত্বকালে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার সৈন্যরা অবাধে দিল্লী লুঠতরাজ শুরু করিল। লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারাইল। দিল্লী শ্মশানে পরিণত হইল। অবশেষে অপরিমিত ধনরত্নসহ তৈমুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বদাউনী বলেন যে, 'যাহারা তখনও জীবিত ছিল, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে মারা গেল। পূর্ণ দুই মাস দিল্লীর আকাশে একটি পাখী পর্যন্ত উড়িতে দেখা গেল

(১) বিখ্যাত মোঙ্গল বীর চিঙ্গিস খাঁর এক পুত্র 'চাঘতাই'র নাম হইতে চাঘতাই-তুর্কী নামের উৎপত্তি হইয়াছিল।

না।'[১] শুধু দিল্লী কেন, সারা উত্তর-ভারতে অরাজকতা এবং অনিশ্চয়তা দেখা দিল। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীন হইয়া গেল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হইল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আতংকগ্রস্ত মানুষ স্থানান্তরে যাইতে শুরু করিল।

ফলাফল

তৈমুরের পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা নিরন্তর অন্তর্দ্বন্দ্ব সিংহাসনের জন্য কলহ এবং ক্ষয়িষ্ণু সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মামুদের মৃত্যু হইলে তুঘলক বংশের রাজত্বের অবসান ঘটিল। মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লী অধিকার করিলেন।

তৈমুরের পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা

খিজির খাঁর স্থাপিত নূতন সুলতানী রাজবংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত। খিজির খাঁ তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা হিসাবে শাসন করিতেন। তিনি নিজেকে হজরত মহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন।

সৈয়দ বংশ

সৈয়দ বংশের মোট চারিজন সুলতান প্রায় চল্লিশ বৎসর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। খিজির খাঁ ছিলেন প্রথম সুলতান। খিজির খাঁর মৃত্যুর পর মোবারক 'শাহ' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের এবং দোয়াবের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী' নামে তাঁহার রাজত্বকালের সমসাময়িক প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। অতঃপর সুলতান হন মহম্মদ শাহ। তিনি নামেমাত্র সুলতান ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগে আমীরগণ শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দিন আলম শাহ আমীরদের সাহায্যে সিংহাসনে বসেন; কিন্তু তিনি রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের শাসনকর্তা বহলুল লোদী দিল্লী আক্রমণ করিলে তিনি তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে সৈয়দ রাজবংশের পতন ঘটিল এবং লোদী বংশের উত্থান হইল। উত্তর-ভারতে জৌনপুর, মালব, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যে বহমনী এবং বিজয়নগর রাজ্য স্বাধীন হইয়া যায়।

খিজির খাঁ

মোবারক শাহ

লোদী বংশ: বহলুল লোদী একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু ক্রম ক্ষীয়মাণ দিল্লী সুলতানিকে পতনের হাত হইতে পুনরুদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। হুসেন শাহের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া জৌনপুর জয় তাঁহার আমলের অন্যতম প্রধান কীর্তি। বহলুল সুলতানী সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বহলুল লোদী

(১) "Those of the inhabitants who were left died of famine and pestilence, while for whole two months not a bird movee wings in Delhi." Badauni

বহলুলের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র সিকন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার সময়ে একদিকে দিল্লী সুলতানীর শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে রাজ্য বিস্তার হইয়াছিল। জৌনপুর হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র, ঢোলপুর, চন্দেরী প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাঁহার কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। দেশে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছিল। তিনি সাহিত্যানুরাগী এবং গুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন এবং মথুরার হিন্দু মন্দির তাঁহার আদেশে ধূলিসাৎ করা হইয়াছিল।

সিকন্দর লোদী

অতঃপর রাজা হইলেন ইব্রাহিম লোদী। রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে তাঁহার পতন ঘটিয়াছিল। তাঁহার আফগান আত্মীয়-স্বজনগণ শত্রু হইয়া সারাদেশে বিদ্রোহ এবং অসন্তোষের সৃষ্টি করিলেন। এই সুযোগে বিহারের আমীরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পাঞ্জাবের দৌলত খাঁ লোদী সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। অপর কয়েকজন আমীরসহ তিনি তৈমুর বংশীয় কাবুলের রাজা বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইভাবে দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসান ঘটিল।

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ঃ প্রায় তিন শতাধিক বৎসর তুর্কী-আফগান সুলতানগণ দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতি জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত কোন আনুগত্য ছিল না। আলাউদ্দিন, ফিরোজ তুঘলক এবং বহলুল লোদীর মত হিন্দু-বিদ্বেষী সুলতানদের শাসনকালে হিন্দুদের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল এবং সৈয়দ ও লোদী সুলতানদের শাসনকালে সামরিক শক্তির দুর্বলতার সুযোগে হিন্দু প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহও বিচ্ছিন্নতাবাদের মাধ্যমে দেখা দিল। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর, পশ্চিমে গুজরাট, পূর্বে বঙ্গদেশ স্বাধীন হইয়া গেল। মৃতপ্রায় সুলতানী সাম্রাজ্য বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হানিলেন তৈমুরলঙ্গ এবং চূড়ান্তভাবে পতন ঘটাইলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভাগ্যান্বেষী বাবর।

অষ্টম অধ্যায়

কয়েকটি আঞ্চলিক রাজশক্তির উত্থানের ইতিহাসঃ

(১) ইলিয়াসশাহী বংশের অধীনে বঙ্গদেশ,

(২) বহমনী রাজ্য এবং (৩) বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সুযোগে বঙ্গদেশ এবং বিজয়নগর ও বহ্‌মনী রাজ্যের আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) বাংলার ইলিয়াসশাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজনৈতিক অবস্থা: দিল্লী হইতে বাংলাদেশের দূরত্ব, বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, বাঙ্গালীদের স্বাধীনতাস্পৃহা পূর্ব-প্রান্তিক এই রাজ্যটিকে দিল্লীর সুলতানী অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত থাকিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে মুসলমান অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে সুলতানী প্রভুত্ব বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। প্রায়ই বাংলার শাসকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার প্রয়াস পান। বলবনের আমলে তুঘরিল খাঁ প্রকাশ্যে দিল্লী সুলতানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বলবন একাধিক অভিযানের দ্বারা বাংলায় সুলতানী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ আবার স্বাধীন হইয়া যায়। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের খামখেয়ালীর পরিণামস্বরূপ রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা আলী মুবারকের ধাত্রীভ্রাতা ইলিয়াস শাহ সামসুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। এইভাবে বাংলাদেশে এক স্বাধীন ও গৌরবময় রাজবংশের ইতিহাস সূচনা হয়। আফ্রিকার ভ্রমণকারী ইবন্-বতুতা সেই সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ববর্তী রাজনৈতিক অবস্থা

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ: হাজী ইলিয়াস তথা সামসুদ্দিন ইলিয়াস ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রায় দেড় দশক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কি রাজ্যবিস্তারে, কি দেশ শাসনে তিনি সমান গৌরবের অধিকারী ছিলেন। তিনি ত্রিহুত, নেপাল, উড়িষ্যার অংশবিশেষ এবং পশ্চিমের চম্পারণ ও গোরক্ষপুর প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া বারাণসী পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি শুধু বঙ্গদেশকে দিল্লী সুলতানি হইতে স্বাধীন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, সার্বভৌমত্বের প্রতীকস্বরূপ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোনারগাঁ দখল করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে একত্র করিয়াছিলেন। পূর্বতন রাজনৈতিক

ইলিয়াস শাহ

রাজ্যবিস্তার

অরাজকতার অবসান ঘটাইয়া এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়া দেশের জনগণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুঘলক বঙ্গদেশ অভিযান করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন একডালিয়া দুর্গ অবরোধ করিবার পর ফিরোজ শাহ নামেমাত্র জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা পাইল।

সিকন্দর শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ ইলিয়াস বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁহার রাজত্বকালে আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা মোটামুটি বজায় থাকে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

সিকন্দর শাহ শিল্পানুরাগী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের অপূর্ব কারুকার্য এখনও বাংলার স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় বহন করে। সিকন্দর নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। বিদ্যানুরাগ এবং সাধুসন্তদের প্রতি অনুরাগ তাঁহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

গিয়াসউদ্দিন

সিকন্দরের শেষজীবন সুখের ছিল না। পুত্র গিয়াসউদ্দিনের সহিত তিনি সিংহাসনের দ্বন্দ্বে প্রাণ হারান। গিয়াসউদ্দিন অতঃপর ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া সিংহাসনে বসেন। তাঁহার রাজত্বকালে চীন সম্রাটের সহিত দূত বিনিময় এবং পারস্পরিক উপঢৌকন প্রেরণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চৈনিক পর্যটক 'মা-হুয়ান' সেই সময় বঙ্গদেশে আসেন। তিনি তাঁহার বঙ্গদর্শনের বর্ণনা দিয়া একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া, পারস্যের কবি হাফিজের সহিত তাঁহার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিত।

সইফুদ্দিন

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পর রাজা হইলেন সইফুদ্দিন হামজা শাহ। তিনি মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বাংলার আমীরগণ খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলে আমীরগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটে। এই গোলযোগের সুযোগে উত্তরবঙ্গের ভাতুড়িয়ার

রাজা গণেশ

(দিনাজপুর) হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদার কংসনারায়ণ বা রাজা গণেশ প্রথমে নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পরে বাংলার সিংহাসনে বসেন। রাজা গণেশ বলিয়া খ্যাত হইলেও তিনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জানা যায়। হিন্দু রাজার বাংলার সিংহাসনারোহণের ফলে মুসলমান আমীরগণ ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তাঁহারা জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে গণেশের বিরুদ্ধে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। ইব্রাহিমের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে একথা জানা যায় যে তিনি নাকি নিজ পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে পারিবেন ইব্রাহিমের সহিত এইরূপ শর্ত হইয়াছিল। তাই দেখা যায় যে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর

তাঁহার পুত্র যদু ইসলাম ধর্মান্তরিত হইয়া জালালউদ্দিন নাম ধারণ করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে বসেন। তিনি পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা হন সামসুদ্দিন আমেদ নামে তাঁহার জনৈক পুত্র। তিনি শাসনকার্যে অযোগ্য ছিলেন। ফলে বাংলার আমীরগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত এবং নিহত করিয়া ইলিয়াসশাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা গণেশের রাজত্বকালে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। যদু বা জালালউদ্দিন পাণ্ডুয়ায় একলাখী নামে একটি মসজিদ এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নির্মাণ করিয়াছিলেন।

আবিসিনিয়ান বা হাব্সী বংশ

ইলিয়াসশাহী বংশীয় নাসিরউদ্দিন মামুদ অভিজাতদের সাহায্যে ক্ষমতায় আসিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা হইলেন রুকন-উদ্দিন বারবক শাহ। অতঃপর রাজা হইলেন তাঁহার জনৈক হাব্সী ক্রীতদাস। এই হাব্সীগণ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং জনসাধারণের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তির জন্য 'ওয়াজীর' বা প্রধান মন্ত্রী হুসেন শাহের নেতৃত্বে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অবশেষে হাব্সী সুলতান মুজফরকে হত্যা করিয়া বাংলার আমীরগণ 'হুসেন শাহ'কে বাংলার সিংহাসনে বসান। ইহার ফলে বাংলায় হুসেনশাহী বংশের সূচনা হয়।

হুসেনশাহী বংশঃ হাব্সী বংশের অধীনে বাংলাদেশে অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সেই যুগের অবসান ঘটাইয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতায়

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে হাব্সী আমীর এবং সৈন্যগণকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। অতঃপর পশ্চিম সীমান্তে সিকন্দর লোদী এবং জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কির মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল তাহা মিটাইয়া উত্তর বিহারে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। একে একে আসাম, উড়িষ্যা এবং ত্রিপুরার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান প্রেরণ করিয়া রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শুধু রাজ্য বিস্তার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, এই বিশাল রাজ্যের সুশাসনেরও

প্রজাহিতৈষণা

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি মধ্য যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজা-হিতৈষী শাসক হিসাবে ইতিহাসে 'বাংলার আকবর' নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। নিজে নিষ্ঠাবান মুসলমান হইয়াও উদারতা ও পরধর্মসহিষ্ণুতার

পরধর্মসহিষ্ণুতা

জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রাজকর্মচারিগণের মধ্যে অনেকে হিন্দু ছিলেন। ইহার মধ্যে পুরন্দর খাঁ ও গোপীনাথ বসু এবং পরমবৈষ্ণব রূপ ও সনাতনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হুসেন শাহ তাঁহাকে ধর্ম প্রচারে

বাধা দেন নাই ; বরং সহায়তা করিয়াছিলেন। এই নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

হুসেন শাহ শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিস্তার লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিকগণের মধ্যে মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্যে অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। রূপ ও সনাতন চৈতন্য জীবনীর প্রামান্য গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্শ্বচর ছিলেন। সুলতানের সেনাপতি পরাগল খাঁ পরমেশ্বর নামে জনৈক পন্ডিতকে মহাভারতের বাংলা ভাষায় অনুবাদ কার্যে সাহায্য করিয়াছিলেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পৃষ্ঠপোষকতা

হুসেন শাহ শিল্প, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যেরও সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক মসজিদ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ তাঁহার আমলে নির্মিত হইয়াছিল।

নুসরৎ শাহ

হুসেন শাহের মৃত্যুর পর নুসরৎ শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনিও পিতার ন্যায় নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সমকালীন ভারত আক্রমণকারী বাবরের বিরুদ্ধে মুঘল-বিরোধী একটি শক্তিজোট তৈয়ারী করিয়া পূর্ব-ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দিয়াছিলেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের সহিত তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু মুঘল সম্রাটের নিকট পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

শিক্ষা ও সাহিত্য-চর্চা

রাজ্যশাসনে পিতার মত নুসরৎ শাহও উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে শ্রীকর নন্দী, কবি কঙ্কন প্রভৃতি খ্যাতনামা বাংলা সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

পরবর্তী শাসকগণ

হুসেন শাহের পরবর্তী ফিরোজ এবং মামুদ প্রভৃতি শাসকগণ ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির এবং শাসনকার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শের শাহ মামুদকে পরাজিত এবং সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলাদেশ অধিকার করেন। বাংলাদেশে স্বাধীন হুসেনশাহী বংশের পতন ঘটে।

(২) **বহমনী রাজ্য ঃ** মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের আমীরগণ সুলতানী সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইসমাইল মুখ নামে জনৈক নেতার অধীনে তাহারা দৌলতাবাদে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। বৃদ্ধ ইসমাইল ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অক্ষমতাহেতু রাজ্যশাসনে অনিচ্ছুক। সেইজন্য হাসান নামক জনৈক বীর সৈনিকের অনুকুলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। হাসান 'আলাউদ্দিন বহমন শাহ' উপাধি

ধারণ করিয়া ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম হইল 'বহ্‌মনী বংশ'।
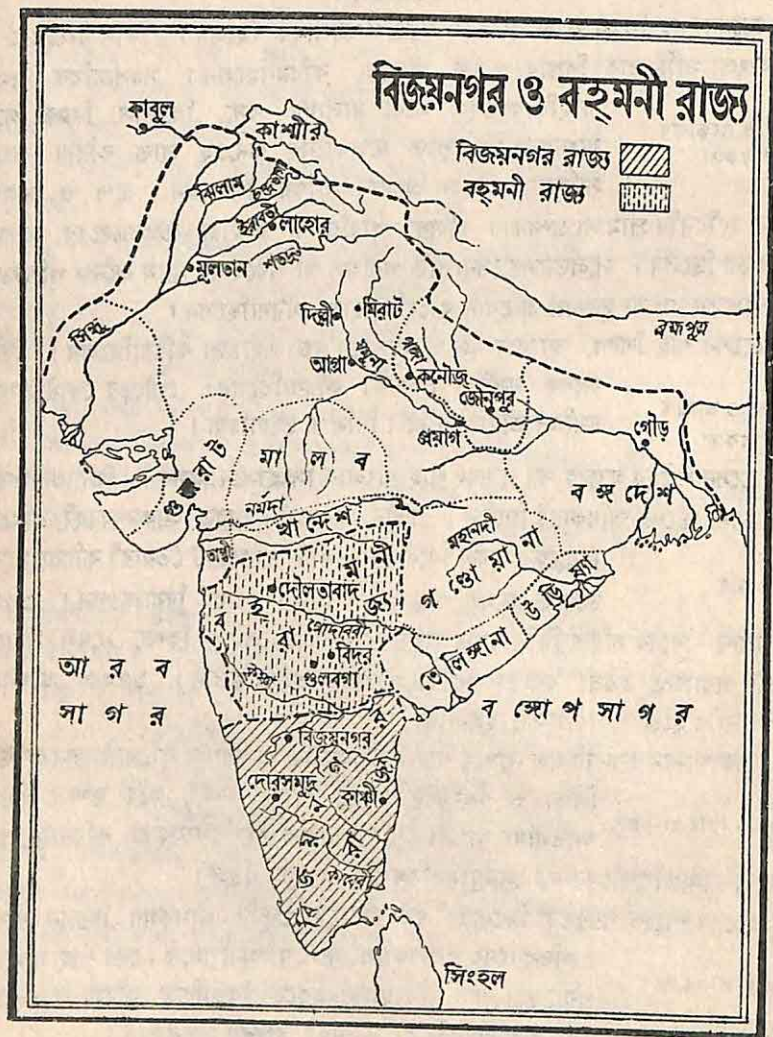
বহ্‌মন শাহ এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটিকে একদিকে সুসংহত এবং অপরদিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে পেনগঙ্গা হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পশ্চিমে গোয়ার সমুদ্রতীর হইতে পূর্বে ভঙ্গীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন দুইটি প্রধান হিন্দু রাজ্য বিজয়নগর এবং তেলিঙ্গানার সহিত তিনি সংঘর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। হাসান বহমন শাহ দৌলতাবাদের নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন

হাসানের রাজ্যবিস্তার ও শাসন নীতি

'হাসানাবাদ'। রাজ্যের সুশাসনের জন্য সমগ্র রাজ্যটিকে চারিটি তরফে ভাগ করিয়াছিলেন—গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার এবং বিদর। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া সামন্ততান্ত্রিক শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন।

প্রথম মহম্মদ শাহের পর যথাক্রমে, মুজাহিদ শাহ, ফিরোজ শাহ, আহম্মদ শাহ, দ্বিতীয় আলাউদ্দিন বহমন শাহ, নিজাম শাহ, তৃতীয় মহম্মদ শাহ সুলতান হন। তাঁহাদের মধ্যে ফিরোজ শাহ ও আহম্মদ শাহ সুলতান হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সহিত দ্বন্দ্ব প্রায় সব সময় লাগিয়া থাকিত। তৃতীয় মহম্মদ শাহের মন্ত্রী মামুদ গাওয়ানের নেতৃত্বে বহমনী রাজ্য খ্যাতি অর্জন করেন শাসন-ব্যবস্থায় এবং রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে। তৃতীয় মহম্মদ শাহ আমীরদের কুপরামর্শে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহমনী রাজ্যের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। মিডোজ টেলার (**Meadows Taylor**) বলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বহমনী রাজ্যের সংহতি এবং শক্তি অন্তর্হিত হইল।[১]

মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর অল্পদিন পরে মহম্মদ শাহও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরবর্তী সুলতানগণ ছিলেন অযোগ্য ও অকর্মণ্য। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই বংশের শেষ রাজা কলিস উল্লাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১৫২৬ খ্রীঃ) পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হইল। এই পঞ্চ রাজ্যে পাঁচটি পৃথক পৃথক রাজবংশ রাজত্ব শুরু করিল। (১) বেরারে ইমাদশাহী রাজবংশ; (২) বিজাপুরে আদিলশাহী বংশ; (৩) আহম্মদনগরে নিজামশাহী বংশ; (৪) গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী বংশ এবং (৫) বিদরে বারিদশাহী বংশ স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হইল।

বেরারঃ ইমাদ শাহ বেরার প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ইমাদশাহী বংশের চারিজন বংশধর স্বাধীনভাবে বেরার প্রদেশ শাসন করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ-নগরের সুলতান হুসেন শাহ বেরার রাজ্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন।

বিজাপুরঃ ইউসুফ আদিল শাহ ছিলেন বিজাপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মামুদ গাওয়ানের অধীনে আদিল শাহ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গাওয়ানের মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন সুদক্ষ শাসক এবং ধর্ম সম্পর্কে উদার। তাঁহার বংশধর দ্বিতীয় আদিল শাহ ছিলেন আদিল-শাহী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দ্বারা এই রাজ্যটির বিলোপ সাধন ঘটে।

---

(১) **'With his death departed all the cohesion and power of the Bahmani Kingdom.'**

গোলকুণ্ডা ঃ গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতুব শাহ। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই রাজ্যটিও অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

আহম্মদনগর ঃ আহম্মদ নিজাম শাহ ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগরের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজামশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্রাট শাহজাহান এই রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

বিদর ঃ আমীর আলি বারিদ বিদর রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বিজাপুর সুলতানের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল।

এই পঞ্চ রাজ্যের মধ্যে একমাত্র বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যেই সুদক্ষ শাসকের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া এই রাজ্য দুইটি দীর্ঘদিন টিকিয়াছিল। যাহা হউক, দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহাদের হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই রাজ্যগুলি সমবেতভাবে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজাকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ দক্ষিণ-ভারতের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়াছিল। ফলে ক্রমে ক্রমে তাহারা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

(৩) **বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ ঃ** বহমনী সুলতান মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছিল। রায়চুর দোয়াব ছিল এই দুই হিন্দু-মুসলমান রাজ্যের সংঘর্ষের মূল কারণ। মহম্মদ শাহ বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিজয়নগররাজ বুক্কা বা 'প্রথম ভূখাকে' পরাজিত করিয়া প্রচুর ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির সহিতও বংশানুক্রমিকভাবে বিজয়নগর রাজ্যের রাজাদের সংঘর্ষ চলিয়াছিল—যতদিন পর্যন্ত না এই মুসলমান রাজ্যটি পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথম মহম্মদ শাহের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিজয়াভিযান হইল তেলিঙ্গানা রাজ্য জয় ও লুণ্ঠন। দীর্ঘদিন সেখানকার হিন্দুগণ বাধাদান করিয়াও তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে তেলিঙ্গানার হিন্দু রাজা প্রভূত ক্ষতিপূরণ দান এবং গোলকুণ্ডা দুর্গটি মহম্মদ শাহকে ত্যাগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহম্মদ শাহ শক্তিশালী শাসক হিসাবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি নির্মমভাবে রাজ্যের অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া শান্তি পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর মুজাহিদ শাহ সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার সময়েও

বিজয়নগরের সঙ্গে বংশানুক্রমিক সংঘর্ষ শুরু হয়। তিনি দুইবার বিজয়নগরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে দেশে কোন বিদ্রোহ হয় নাই। বহমনী বংশের অষ্টম সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বহমনী রাজ্যের গৌরব এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি বিজয়নগর রাজ্যের সহিত সংঘর্ষ পুনরায় শুরু করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের দ্বিতীয় হরিহরের সহিত রায়চুর দোয়াব লইয়া এই সংঘর্ষ হইয়াছিল। যুদ্ধে হরিহর পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ গুজরাট, খান্দেশ এবং মালবের মুসলমান শাসকদেরও পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সহিত পুনরায় যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে ফিরোজ জয়লাভে সমর্থ হন নাই। বিজয়ী হিন্দুগণ বহু মুসলমান সৈন্যকে হত্যা করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।

মুজাহিদ শাহ (১৩৭০-৯৮ খ্রীঃ)

পরবর্তী সুলতান আহম্মদ শাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পথ অনুসরণ করিয়া বিজয়নগরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি ফিরোজের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিজয়-নগর আক্রমণ করিলেন। বিজয়নগররাজ দ্বিতীয় দেবরায় পরাজিত হইলেন। প্রচুর ধনরত্ন দিয়া তিনি সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন। অল্পদিন পরে তিনি বরঙ্গল (তেলিঙ্গানার রাজধানী) দখল করেন।

আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন বহমন শাহ রাজা হন। তাঁহার সময়েও বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলে, যথারীতি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি ঘটে।

(৪) **বিজয়নগর সাম্রাজ্য :** চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে সুলতানী সাম্রাজ্যের বিশৃংখলার সুযোগে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। হরিহর ও বুক্ক নামে দুই ভাই বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মাধব বিদ্যারত্ন এবং তাঁহার ভ্রাতা বেদের টীকাকার সায়নাচার্য এই দুই ভাইকে রাজ্য স্থাপনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। হরিহর ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের প্রথম রাজা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম সঙ্গম বংশ। হরিহরের পর রাজা হন বুক্ক। বুক্কের সময় হইতে বহমনী রাজ্যের সহিত বিজয়নগরের সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল।

সঙ্গম বংশ

হরিহরের পুত্র দ্বিতীয় হরিহর প্রথম রাজা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি মহীশূর, কানাড়া, ত্রিচিনপলী এবং কাঞ্চি বিজয়নগর সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি রায়চুর দোয়াবের অধিকার লইয়া বহমনী বংশীয় ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র প্রথম দেবরায়ের রাজত্বকালেও বহমনীরাজ ফিরোজ শাহ

বিজয়নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফিরিস্তার মতে দেবরায় বহ্মনী সুলতানকে নিজের কন্যার সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর রাজা হইলেন দ্বিতীয় দেবরায়। তিনি বহ্মনী রাজাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিজয়নগরকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন ও অভ্যন্তর শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি এবং পারস্যের রাষ্ট্রদূত আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। বিজয়নগর রাজ্য দ্বিতীয় দেবরায়ের সময়ে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

প্রথম দেবরায় ও দ্বিতীয় দেবরায়

দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মালিকার্জুন এবং পৌত্র বিরূপাক্ষের দুর্বলতার সুযোগে সঙ্গম বংশের অবসান ঘটিল। অতঃপর বিজয়নগরের শাসন-ক্ষমতায় আসিলেন সালুভ বংশীয় রাজা নরসিংহ সালুভ। তিনি মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। নরসিংহ সালুভের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি তুলুভ বংশীয় বীর নরসনায়ক শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন। তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ তুলুভ সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর রাজা হইলেন তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায়। তিনি বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলিয়া ইতিহাস বিখ্যাত।

সালুভ বংশ

তুলুভ বংশ

কৃষ্ণদেব রায় দুই দশক কাল (১৫০৯-২৯ খ্রীঃ) বিজয়নগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিজয়নগর শক্তি, সমৃদ্ধি, প্রতিপত্তি ও গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

কৃষ্ণদেব রায়

তিনি একাধারে সমরকুশলী বীর ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। সিংহাসনারোহণের পরই তিনি রাজ্যের বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবকে পরাজিত করিয়া উদয়গিরি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যার এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন (১৫১২ খ্রীঃ)। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়া তিনি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে রায়চুর দোয়ার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বিজাপুরের রাজধানী গুলবর্গা অধিকার করিয়া সেখানকার দুর্গটি ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরে কৃষ্ণা নদী হইতে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পূর্বে বিশাখাপত্তম হইতে পশ্চিমে কোঙ্কণ প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপের উপরও তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় পোর্তুগীজ গভর্নর আলবুকার্ককে ভাটখাল নামক এক জায়গায় একটি ঘাঁটি তৈয়ারী করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ (Paes) বিজয়নগর পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের শাসন দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

রাজ্য বিস্তার

রাজ্যসীমা

কৃষ্ণদেব রায় বিদ্যোৎসাহী এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার পরধর্মসহিষ্ণুতা বিদেশী পর্যটকদের বিস্মিত করিয়াছিল। সিউয়েল[১] কৃষ্ণদেব রায়ের চরিত্র সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সাহস, বীরত্ব, মহত্ত্ব ও উদারতা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন।

চরিত্র ও গুণাবলী

কৃষ্ণদেব রায়ের পর রাজা হইয়াছিলেন যথাক্রমে অচ্যুত রায়, সদাশিব রায়, বেঙ্কট রায় প্রভৃতি অযোগ্য এবং দুর্বল প্রকৃতির রাজারা। ইহার ফলে রাজ্য শাসনের সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রী রাম রায় হস্তগত করিয়া লইলেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীর নিকট রাম রায় পরাজিত এবং নিহত হইলেন। বিজয়ী মুসলমান বাহিনী বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া বিধর্মী হিন্দু প্রজাদের হত্যা করিল, তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। ফলে বিজয়নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। এই ধ্বংসলীলা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য করিয়া তুলিল।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ঃ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, সমকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনা এবং বিজয়নগরের রাজাদের উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপাদান হইতে জানা যায় যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে কেন্দ্রায়ত্ত রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সম্রাটগণ স্বৈরাচারী হইলেও প্রজাবৎসল ছিলেন। বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক স্বরচিত গ্রন্থে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, রাজা ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলিবেন; অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের দ্বারা রাজ্য শাসন করিবেন; প্রজাদের উপর লঘু করভার স্থাপন করিবেন; শত্রুদের নিহত করিয়া রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করিবেন এবং প্রজাদের বিপদে রক্ষা করিবেন। বিজয়নগরের শাসকগণ এই অনুশাসন মানিয়া চলিতেন।

কেন্দ্রীয় শাসন কার্যে সম্রাটকে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা ছিল। মন্ত্রিগণ সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত এবং পদচ্যুত হইতেন। মন্ত্রিসভা ছাড়া কোষাধ্যক্ষ, বাণিজ্য সচিব, পুলিশ তথা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় শাসন

পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ বলেন যে বিজয়নগর সাম্রাজ্য মোট দুই শতকেরও বেশী প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলি আবার কতকগুলি 'নাড়ু' বা জিলায়, প্রত্যেক জিলা, কতকগুলি শহর ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 'নায়ক' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহার নির্দেশমত প্রাদেশিক শাসন চালাইতেন।

প্রাদেশিক শাসন

(১) সিউয়েল-রচিত "A Forgotten Empire" দ্রষ্টব্য।

গ্রামের শাসন-ব্যবস্থার ভার ছিল বর্তমান গ্রাম-পঞ্চায়েতের মত গ্রামসভার উপর। গ্রামসভার কার্যে সহায়তা করিবার জন্য মহানায়কাচার্য নামক কেন্দ্রীয় কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা গ্রামের বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতির মীমাংসা করিতেন।

গ্রাম-পঞ্চায়েত

ভূমি-রাজস্ব ছিল রাজার আয়ের প্রধান উৎস। নুনিজের মতে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু বণিক, শিল্পী প্রভৃতির অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছিল। বাণিজ্য-শুল্ক, পথকর প্রভৃতি খাতেও অনেক রাজস্ব আদায় হইত।

বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট নিজে। দণ্ডবিধি খুব কঠোর ছিল। প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক শাসকগণ স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করিতেন।

বিজয়নগরের বিশাল সামরিক বাহিনী ছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। অশ্বারোহী, পদাতিক এবং হস্তী বাহিনীর উল্লেখও পাওয়া যায়।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা: বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগর সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল। ভ্রমণকারিগণ এই সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের কথা আলোচনা করিয়াছেন। এই সাম্রাজ্যে তিন শতকের অধিক বন্দর ছিল। এইসব বন্দর হইতে পারস্য ও ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চলিত। দেশের অভ্যন্তরে বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প, খনিশিল্প প্রভৃতির প্রচলন ছিল। অন্তর্বাণিজ্যের জন্য সুষ্ঠু পরিবহণ-ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজধানীতে একটি সুরম্য নগর ছিল। ইহার পথে পথে মণি-মুক্তা বিক্রয় হইত। পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েজের মতে, "বিজয়নগর পৃথিবীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগরী।"[১]

বিজয়নগরের জনগণের কৃষি ছিল সাধারণ জীবিকা। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। ব্যবসায়িগণ সংঘবদ্ধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা উন্নতমানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। জিনিসপত্রের মূল্য ছিল কম। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা করভারে জর্জরিত হইত।

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি: বিজয়নগরের সম্রাটগণ বিদ্যোৎসাহী, সুপণ্ডিত এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় 'আমুক্ত মাল্যদা' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আটজন কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অষ্টদিগ্‌গজ বলা হইত।

---

(১) "Vijaynagar is the best provided city in the world."—Paes

শিল্প-স্থাপত্যেও বিজয়নগরের সম্রাটগণ যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মন্দির, দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিজয়নগরের রাজধানী তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে 'হাজার মন্দির' বা সহস্রদ্বার মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বিঠল স্বামী মন্দির আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির। বিজয়নগরের এই মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সময়ে চিত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সর্বাধিক সম্মানলাভ করিতেন। স্ত্রীজাতির যথেষ্ট সম্মান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ করিতেন বিজয়নগরের নারীরা। বিত্তশালীদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা এবং সাধারণভাবে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নিকোলো কন্টির বিবরণ হইতে জানা যায় যে সেখানে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

এক কথায় দক্ষিণ-ভারতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উন্নতি একটি চরম নিদর্শনের দিক্‌চিহ্নরূপে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

নবম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজ-জীবনে ইসলামীয় প্রভাব

ভারতের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল পরকে আপন করিয়া লওয়া। যুগে যুগে নানা জাতি ভারতে আসিয়াছে, ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে—যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" (রবীন্দ্রনাথ)—ইহা হইল ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু শক, হূণ, গ্রীক, পহ্লব, ব্যাকট্রিয়ান প্রভৃতি পূর্ববর্তী বৈদেশিক জাতিগুলির সহিত মুসলমানদের পার্থক্য এই যে, সুদীর্ঘ তিন শতাব্দীকাল এদেশে বসবাস করিয়াও ভারতীয় জনগণের মধ্যে ইহারা একেবারে লীন হইয়া যায় নাই। ইহার প্রধান কারণ হইল স্বধর্মের প্রতি মুসলমানদের প্রবল ও প্রগাঢ় অনুরাগ। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষে হিন্দুদের সহিত পাশাপাশি বাস করিয়া উভয় ধর্মের লোকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

সুলতানী যুগে মুসলমান অধিবাসীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। (১) মুসলমানরা ছিল বিজয়ী ও শাসক শ্রেণী-ভুক্ত। স্বভাবতই তাহারা গর্বিত ও অহঙ্কারী ছিল ; আর হিন্দুরা ছিল রাজনীতিগত-ভাবে পদানত। (২) মুসলমানরা ছিল একেশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিক বিরোধী, হিন্দুরা ছিল নানা দেব-দেবীর উপাসক এবং পৌত্তলিক। (৩) মুসলমান সমাজ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এবং গণ্ডীবদ্ধ ; অপরপক্ষে হিন্দু সমাজে জাতিগত ভেদাভেদ এবং বৈষম্যজনিত অনৈক্য ছিল। (৪) ভারতে আগমনের পূর্ব হইতে মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ভীষণ সচেতন ছিল। তাহারা রাজ্য অভিযানের সহিত ধর্ম বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। বিজয়ী-বিজিতের উপর নিজ ধর্ম ও রীতি-নীতি চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছিল কখনই মিশিয়া যাইতে চাহে নাই। (৫) মুসলমান রাজ্য বিজেতারা একহস্তে তরবারি এবং অপর হস্তে কোরান লইয়া ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন, দেব-দেবীর বিগ্রহ ধ্বংসকরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ প্রভৃতি তাহাদের কার্যকলাপের ফলে নবাগত মুসলমান ধর্মের প্রতি হিন্দুদের বিদ্বেষ ও ভীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা ইসলাম ধর্ম হইতে স্বধর্ম ও সমাজকে বাঁচাইতে কূর্মাবৃত্তি ধারণ করে। (৬) সুলতানী আমলের অধিকাংশ তুর্কো-আফগান শাসক তাঁহাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যকে বৃহৎ ইসলামীয় সাম্রাজ্যের (Pan-Islamic Empire) অংশ বলিয়া মনে করিতেন। দাস রাজবংশের রাজাগণ খলিফার নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া এদেশ শাসন করিতেন। ফলে

ভারতের হিন্দু অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া যাওয়ার পরিবর্তে তাঁহারা আরব দেশের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিতেন বেশী। (৭) আলাউদ্দিনের হিন্দু-বিদ্বেষ, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, উর্ধ্বতন রাজপদ হইতে হিন্দুদের বঞ্চিত করা; গোঁড়া ফিরুজ তুঘলকের হিন্দু ধর্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন ও দেববিগ্রহের প্রতি অমর্যাদা এবং হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিয়াও হিন্দু নির্যাতন ও ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা স্বভাবতঃই হিন্দুদের মুসলমান ধর্মের প্রতি ভয় ও ঘৃণা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঁহারা রক্ষণশীল নীতি অবলম্বন করিয়া 'ম্লেচ্ছ' মুসলমানদের হাত হইতে ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতাকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। (৮) রঘুনন্দন, বিজ্ঞানেশ্বর, মাধবাচার্য প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কঠোর অনুশাসনে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের কঠোরতা 'ম্লেচ্ছদের' স্পর্শ হইতে নিরাপদ দূরত্বে অবিকৃত রাখার জন্য' বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (৯) মুসলমান শাসকগণ 'জিম্মি' তথা অ-মুসলমানদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় করা এবং কতকগুলি শর্তাধীনে বসবাস করার ইসলামীয় বিধি প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং স্বকীয়তা বজায় রহিল।

মুসলমান সুলতানদের হিন্দু-বিদ্বেষ

হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতার কারণ

কিন্তু গোড়ার দিকে এইসব বাধা-বিপত্তি থাকিলেও ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। দীর্ঘকাল একত্রে বাস করিবার ফলে, হিন্দুর সহনশীলতার গুণে এবং অর্থনৈতিক কারণে এই দুই জাতি ক্রমশঃ নিকটতর হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া একে অপরকে প্রভাবিত করিয়াছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের অগ্রদূত মুসলমান মনীষী আলবেরুনী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করিয়া মুসলমানগণকে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ধর্মীয় সমতা পরস্পরের মধ্যে সহিষ্ণুতা এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, মুসলমান হারেমের হিন্দু রমণীগণ অথবা ধর্মান্তরিত বেগমেরা উভয় ধর্মের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা পুরাপুরি পূর্বপুরুষের অভ্যস্ত জীবন বাতিল করিয়া দিতে পারিত না। ফলে উভয় ধর্মের সংমিশ্রণে সৃষ্ট বৈপরীত্যের সমন্বয়কারীরূপে তাহারা সমাজে বিরাজ করিত। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী এবং মুসলিম ফকির দরবেশ ও সুফী সাধকদেরও এই ধর্ম সমন্বয়ে অবদান রহিয়াছে। এই যুগে আবির্ভূত রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য এবং নানক ও নামদেব হিন্দু ধর্মকে উদার করিবার জন্য ধর্মনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ফলে, হিন্দু-

আলবেরুনী

ধর্মান্তরিত নারীগণ

উভয় ধর্মের সাধুসন্তগণের অবদান

মুসলমানের ধর্ম সমন্বয়ে নব ধর্মের উদ্ভব ভারতবর্ষে হইয়াছিল। এদের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী লোক ছিল। 'সত্যপীরের পূজা' হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মনৈতিক সমন্বয়ের আর একটি উদাহরণ। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানদের 'পীরের' প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই মিশ্র দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল।

সত্যপীর ঠাকুর

বাংলার হুসেন শাহ এবং কাশ্মীরের জৈনুল আবিদিন প্রভৃতি সুলতানদের মত উদারচেতা এবং হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক মুসলমানগণের জন্যও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হইয়াছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের নিকট হইতে একেশ্বরবাদ এবং সাম্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ হিন্দুদের মধ্যে একতাবোধের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানগণ হিন্দুদের কিছু কিছু সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় উৎসব যথা, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করিতেন। মুসলমান পরিবারের মত হিন্দু পরিবারের মহিলারাও পর্দানশীন হইয়াছিলেন। হিন্দুরা ওলাবিবি, ওলাইচণ্ডী প্রভৃতি মিশ্র দেবীর পূজা প্রচলন করিয়াছিলেন। মুসলমান সাধুসন্তদের দরগায় নিয়মিত পূজা-উপাসনা করিতেন।

উদারনৈতিক সুলতান-দের পৃষ্ঠপোষকতা

সামাজিক প্রভাব

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে 'ভক্তিবাদ' নামে মধ্য যুগের ইতিহাসে একটি ধর্মীয় মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। হিন্দু ধর্মের ভাগবত ধর্ম এবং ভক্তিবাদ, ইসলাম ধর্মের সুফীবাদ, একটি সাধারণ মানব ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিল। এই মতবাদের মূল কথা হইল ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। অবশ্য হিন্দুদের ভক্তি আন্দোলন ইতিপূর্বেই দক্ষিণ-ভারতে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জ্ঞান ও কর্মযোগের ভূমিকা ছিল এবং হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী পালনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান শাসনকালে উত্তর-ভারতের আউল-বাউল-সহজিয়া দরবেশ প্রভৃতির ভক্তিদের মিশ্রণ ঘটিল। মুসলমানদের উদারনৈতিক সুফী মতবাদ নিজামউদ্দিন আউলিয়া, মুইনুদ্দিন চিস্‌তি সুফী সাধুসন্ত ও ধর্মনেতাদের দ্বারা প্রচারিত হইল। রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম সংস্কারকগণের ভগবৎ প্রেমের প্রতিচ্ছবি পড়িল সুফী ধর্মমতের মধ্যে। ভগবৎ প্রেমের বন্যায় বহিয়া গেল সারাদেশ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দীক্ষিত হইল এই ধর্মে।

ভক্তিবাদ

সুফীমত

সংমিশ্রণ

ভক্তিবাদী আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ঃ

রামানন্দ ঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে রামানন্দ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মানুষে মানুষে প্রভেদ অস্বীকার করিয়া ভক্তির দ্বারা ভগবৎ উপাসনার ধর্মাদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষিণ-ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক রামানুজের প্রধান শিষ্য। মুচি,

মেথর, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই তিনি জাতি, ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে এই নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট 'ঈশ্বর' এবং 'আল্লা' এক ও অভিন্ন। সুতরাং একই উপায়ে উপাসনা করিয়া হিন্দুর 'ঈশ্বর' ও মুসলমানের 'আল্লা' লাভ হইতে পারে।

কবীর : রামানন্দের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুসলমান জোলা কবীর। তাঁহার জন্ম পরিচয় সম্বন্ধে এখনও সঠিক তথ্যের অভাব আছে। অনেকে বলেন তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। জন্ম তাঁহার যেখানেই হউক না কেন, তাঁহার আত্মিক সমৃদ্ধি সহজ সরল ভাষায় উদার ধর্মমতের প্রচার অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। কবীর হিন্দু অথবা মুসলমানদের নৈতিক অনুষ্ঠানগুলিতে আস্থাহীন ছিলেন। তাঁহার মতে আত্মশুদ্ধি এবং ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। রাম ও রহিমে, কৃষ্ণ ও করিমে এবং হরি ও হজরতে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম হইল একই ঈশ্বরের উপাসনার দুইটি পৃথক পথ মাত্র। এক বৃন্তে দুইটি ফুল—হিন্দু-মুসলমান....."তিনি সহজ সরল ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। এইগুলিকে কবীরের 'দোঁহা' বলে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান ছিল।

কবীর

শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্য : পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ (১৪৮৫-১৫৩৫ খ্রীঃ) হইতে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যিনি প্রেম ও ভক্তির ভাবরসে আচণ্ডালে অবগাহন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্য। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত নবধর্মের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজে এই উদারনৈতিক

ধর্মমত নব প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে সুদূর বৃন্দাবন, পূর্বে আসাম, দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত এই ধর্মমত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র করিয়া উপেক্ষিত মুচি, মেথর, চণ্ডাল পর্যন্ত এবং মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার শিষ্য ছিলেন। যবন হরিদাস তাঁহার অন্যতম প্রধান মুসলমান শিষ্য ছিলেন। বাংলাদেশের গৌরবময় যুগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার এই উদার ধর্মমতের প্রচার হইয়াছিল। রূপ ও সনাতন নামে হুসেন শাহের দুইজন কর্মচারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চৈতন্য জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের বাল্যের নাম ছিল 'নিমাই'। জন্মস্থান—নবদ্বীপধাম। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র—জাতিতে ব্রাহ্মণ। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশের সর্বত্র জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভক্তিবাদের ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভগবৎ প্রেমের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায়। তিনি শাস্ত্রীয় জটিলতা এবং ধর্মীয় আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। ভগবৎ নাম-সঙ্কীর্তন ও ভজন-সাধনের দ্বারাই মানুষের মুক্তির উপায় ছিল তাঁহার ধর্মমত। কি ধর্মে, কি সাহিত্যে চৈতন্য জীবনী ও ধর্মমত সমান উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি অনুসারে পুরী তথা নীলাচলে মহাপ্রভুর তিরোধান ঘটিয়াছিল।

নানক

নানক ঃ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক। তিনি লাহোরের এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার ধর্মমতে জাতিভেদ প্রথার কোন স্থান ছিল না, যেমন ছিল না চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মে। তিনি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধন করাই ছিল তাঁহার ধর্মমতের প্রধান উদ্দেশ্য। 'নাম' (ঈশ্বরের নাম-সঙ্কীর্তন), 'দান' (জীবে সেবা) এবং 'মান' (দৈহিক পরিচ্ছন্নতা) হইল নানকের প্রধান উপদেশ। তাঁহার উপদেশসমূহ 'গ্রন্থসাহেব' নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোক ছিল।

হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধন

নামদেব ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাষ্ট্রে নামদেব নামে জনৈক ধর্ম প্রচারক ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। ইনিও বাহ্যিক আচারে, আড়ম্বরে এবং তথাকথিত আনুষ্ঠানিক ভগবৎ উপাসনায় বিশ্বাস করিতেন না। ভক্তির দ্বারা

ভগবানকে লাভ করাই ছিল তাঁহার ধর্মনৈতিক মত ও পথ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিল।

মীরাবাঈ : কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা রাঠোর রাজকন্যা মীরাবাঈ প্রেমভক্তি ও গানের দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন। ব্রজবুলীতে রচিত গানগুলি 'মীরার ভজন' নামে সুপরিচিত। এইগুলি হিন্দী সাহিত্যের পরম সম্পদ বলিয়াও বিবেচিত হয়। তাঁহার কৃষ্ণভক্তি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির পথ দেখাইয়াছিল। এই নব উপাসনা পদ্ধতি খুব বেশী প্রসার লাভ করে নাই।

মীরাবাঈ ছিলেন মেবারের রাণা কুম্ভের সহধর্মিণী। শাক্ত রাণা রাণীর কৃষ্ণ প্রেমের জন্য তাঁহাকে নির্বাসন দিয়াছিলেন। তীর্থ পর্যটন কালে মথুরায় তাঁহার দেহাবসান ঘটিয়াছিল।

উপরি-উক্ত ধর্ম সংস্কারকগণ ছাড়াও আরও অনেক সাধু, সন্ত ও সুফী ফকির হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভাষা ও সাহিত্য : তুর্কী সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় উর্দু (হিন্দী ও ফারসীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট) ও ফারসী ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটিলেও প্রাচীন ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত এবং হিন্দী, বাংলা গুরুমুখী ও মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

আমীর খসরু

এই যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি ছিলেন আমীর খসরু। তিনি গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বের শেষভাগ হইতে আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল পর্যন্ত ফারসী ভাষায় কাব্য ও গদ্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বরণী এবং সামস-ই-সিরাজ ও সিরহিন্দই এই যুগের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ

আলবেরুনী

আলবেরুনী সুলতানী আমলের পূর্বেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ইসলামের ধর্মমতের সঙ্গে উপনিষদের একেশ্বরবাদের তুলনামূলক আলোচনা এবং অনেক সংস্কৃত পুঁথির ফারসী ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি সমন্বয়মূলক সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য

এই যুগে হিন্দী ভাষারও যথেষ্ট প্রসারলাভ হইয়াছিল। রামানন্দ, কবীর, চাঁদ বরদৌ, আমীর খসরু, মালিক মহম্মদ জাসী প্রভৃতি ধর্মগুরু এবং হিন্দু-মুসলমান কবিগণ হিন্দী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মীরাবাঈ-এর ভজন হিন্দী ভাষার আর একটি সম্পদ। সেই সময় হিন্দী এবং ফারসীর সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

এই আমলে বাংলা ভাষার বিপুল উন্নতি ও প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহ ও তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহ প্রভৃতি বাংলার মুসলমান শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর, কৃত্তিবাস, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি বঙ্গভাষার আদিযুগের পণ্ডিতগণ কাব্য-সাহিত্যে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। আজও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণবকাব্যগুলি

এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও রূপ ও সনাতন গোস্বামীর চৈতন্য চরিতমূলক গ্রন্থাবলী বাঙ্গালী পাঠকের প্রতি ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। সেই যুগের বিখ্যাত মুসলমান সৈয়দ আলাওল মহম্মদ জয়সীর 'পদ্মবৎ কাব্যের' অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে পাঞ্জাবের গুরুমুখী এবং মহারাষ্ট্রের মারাঠী ভাষার প্রসার ঘটিয়াছিল। গুরু নানক ও ধর্ম প্রচারক নামদেব এই দুই ভাষায় তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

শিল্প ঃ শিল্প ও স্থাপত্যেও হিন্দু-মুসলমান শিল্প-রীতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এই শিল্প-রীতিকে বলা হয় ইন্দো-ইসলামিক বা ইন্দো-সেরা সৈনিক তথা হিন্দু-মুসলমান শিল্প-রীতি। অনেক মুসলমান শাসক ছিলেন হিন্দুদের দেব মন্দির ধ্বংসকারী। তাঁহারা হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষের উপরেই মসজিদ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কোথাও বা আবার হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। যেমন—দিল্লীর কুতুব মসজিদ, আড়াই দিনকা ঝোপড়া প্রভৃতি। এইরূপে মসজিদে রূপান্তরিত হিন্দু মন্দিরগুলি, হিন্দু-মুসলিম শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সমন্বয়ের প্রথম ধাপ রচনা করিয়াছিল ; দ্বিতীয় ধাপ রচিত হয়, মুসলমান রীতিতে হিন্দু কারিগরের দ্বারা প্রস্তুত সৌধগুলি তৈয়ারী হওয়ার ফলে।

সমন্বয়ের ক্রমবিকাশ

দিল্লীতে ইন্দো-সেরা সৈনিক শিল্প-রীতিতে নির্মিত 'কুতুব-মিনার', 'আলাই-দরওয়াজা', 'জমায়েৎখানা মসজিদ', 'ফিরোজ শাহের সমাধি সৌধ' ইত্যাদি এখনও সে যুগের শিল্প-রীতির-সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

দিল্লীর শিল্পরীতি

এই যুগের শিল্প-রীতির কয়েকটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। এইগুলির মধ্যে জৌনপুর, বাংলাদেশ, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের শিল্প-রীতি লক্ষণীয়। জৌনপুরের অধিকাংশ মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। সেইজন্য সেখানকার স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু প্রভাব বেশী পরিমাণে দেখা যায়। অটলা মসজিদ জৌনপুরী শিল্প-রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাব পদ্ম এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সূচিত হয়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল ইত্যাদি সে যুগের মিশ্র স্থাপত্য রীতির নিদর্শন বহন করিতেছে। বাংলাদেশে পাথর কম ব্যবহার করা হইত, ইটের ব্যবহার ছিল বেশী। ইহা অন্যান্য প্রদেশের স্থাপত্য-রীতি হইতে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। গুজরাটের শিল্পীরা অপরপক্ষে, কাঠ ও পাথরের উপর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য মণ্ডিত শিল্পকলা রচনা করিতেন। গুজরাটের বহু পুরাতন মন্দির এবং গৃহ মসজিদে রূপান্তরিত হইয়াছিল। গুজরাটের জাম-ই-মসজিদ ও আহম্মদনগরের সিদি সৈয়দের মসজিদের সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং পাথরের উপর নকশার কাজ স্থানীয় শিল্প প্রভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আঞ্চলিক শিল্প-রীতি

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায় (মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—(ক) আলবেরুনীর ঐতিহাসিক পুস্তকের নাম কি ? (খ) তবাকাৎ-ই-নাসিরি কাহার রচনা ? (গ) জিয়াউদ্দীন বরণীর রচনার নাম কি ? (ঘ) ফিরোজ শাহের ঐতিহাসিক সঙ্কলনের নাম কি ? (ঙ) আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় সিন্ধুদেশের রাজা কে ছিলেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : (ক) মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের তিনজন সমসাময়িক ঐতিহাসিকের নাম কর ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ? (খ) আমীর খসরু কে ছিলেন এবং কবে ভারতে আসিয়া ছিলেন ? (গ) জিয়াউদ্দীন বরণীর সম্বন্ধে কি জান ? (ঘ) মিনহাজ-উদ্দীনের রচনা হইতে কোন্ বিষয়ের তথ্য জানা যায় ? (ঙ) মীরকাশিমের সিন্ধুদেশ বিজয় সম্বন্ধে কি জান ?

৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণনামূলক উত্তর দাও : (ক) 'মুসলমান যুগ' না বলিয়া মধ্য যুগ বলার যৌক্তিকতা দেখাও। (খ) মধ্য যুগের ঐতিহাসিক উপাদান কি কি ? (গ) আলাউদ্দীন খিলজী এবং মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বকালের সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী দুইজন ঐতিহাসিকের বিবরণ আলোচনা কর। (ঘ) আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয়ের ফলাফল আলোচনা কর। এই বিজয়কে 'নিষ্ফল বিজয়' বলা হয় কেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায় (সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও : (ক) গজনী শহর কোথায় অবস্থিত ? (খ) সুলতান মামুদ কে ছিলেন ? (গ) সুলতান মামুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন ? (ঘ) সোমনাথের মন্দির কোথায় অবস্থিত ? (ঙ) সুলতান মামুদের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন্ রাজপুত রাজবংশ বাধা দিয়াছিলেন ? (চ) আলবেরুনী কে ছিলেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : (ক) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? (খ) সুলতান মামুদের প্রধান দুই-তিনটি অভিযান সম্বন্ধে লিখ। (গ) সুলতান মামুদের অভিযানের কারণ কি কি ?

৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণনামূলক উত্তর দাও : (ক) সুলতান মামুদের অভিযানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (খ) সুলতান মামুদ কি নিছক লুণ্ঠনকারী ছিলেন ?

তৃতীয় অধ্যায় (সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও : (ক) মহম্মদ ঘুরী কে ছিলেন ? (খ) তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে কয়টি যুদ্ধ এবং কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (গ) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ? (ঘ) জয়চন্দ্র কে ছিলেন ? (ঙ) ভারতে মুসলমান শাসন কে প্রতিষ্ঠা করেন ? (চ) ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ছ) দিল্লীর প্রথম সুলতান কে ছিলেন ? (জ) দাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ঝ) দাস রাজা বলিতে কোন্ কোন্ সুলতানকে বুঝায় ? (ঞ) বাংলায় মুসলমান অধিকার প্রথম কে এবং কবে প্রতিষ্ঠা করেন ? (ট) কুতুব মিনার কে নির্মাণ করেন ? (ঠ) ইলতুৎমিস কে ছিলেন ? (ড) বন্দেগান-ই-চাহেলগান কি ? (ঢ) বলবনের পূর্বনাম কি ছিল ? (ণ) সিজদা ও পাইবস কি ? (ত) চেঙ্গিস খাঁর প্রকৃত নাম কি ? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও : (ক) তরাইনের যুদ্ধের ফলাফল উল্লেখ কর ? (খ) ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (গ) ইলতুৎমিসকে একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যায় কি ? (ঘ) বলবনের নরপতিত্বের আদর্শ কি ছিল ? (ঙ) বলবনের সীমান্ত প্রতিরক্ষার নীতি কি ছিল ?

৩। বিবরণমূলক উত্তর দাও : (ক) ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব আলোচনা কর, তাঁহাকে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন ? (খ) সুলতানী সাম্রাজ্যের সংহতির জন্য বলবন কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনি কতদূর সফল হইয়াছিলেন ? (গ) বলবনের শাসন সংস্কার নীতি আলোচনা কর এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশ কর।

চতুর্থ অধ্যায় (খিলজী সাম্রাজ্যবাদ)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও : (ক) খিলজী বিপ্লব কাহাকে বলে ? খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন (মাঃ ১৯৮৪) ? (খ) আলাউদ্দীন খিলজীর চিতোর আক্রমণের সহিত কোন্ উপাখ্যান জড়িত আছে ? (গ) গুজরাট অভিযানের দ্বারা কাহাদের সেখান হইতে দিল্লীতে আনিয়াছিলেন ? (ঘ) মালিক কাফুর কে ছিলেন ? (ঙ) কোন্ সুলতান প্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন ? (চ) কোন্ সুলতান প্রথম জিনিসপত্রের দাম বাঁধিয়া দেন ? (ছ) আলাই-দরওয়াজা কাহার দ্বারা নির্মিত হয় ? (জ) আলাউদ্দিনের সময় দক্ষিণ-ভারতের চারিটি হিন্দু রাজ্যের নাম কর। (ঝ) দেবগিরি কোথায় ? সেখানে কোন্ বংশ রাজত্ব করিত ? (ঞ) 'দাগ ও হুলিয়া' ব্যবস্থা কি ছিল ? (ট) 'নব-মুসলমান' কাহাদের বলা হইত ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও: (ক) আলাউদ্দিনের মেবার ও গুজরাট বিজয় সম্বন্ধে আলোচনা কর। (খ) আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য-বিজয় নীতি আলোচনা কর এবং উত্তর-ভারত বিজয়ের সঙ্গে পার্থক্য দেখাও। (গ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য আলাউদ্দিন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঘ) আলাউদ্দিনকে কেন "দুঃসাহসিক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ" বলা হয় ? (ঙ) আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি আলোচনা কর। (চ) আলাউদ্দিনের হিন্দুদের প্রতি আচরণ কেমন ছিল ? (ছ) আলাউদ্দিনের রাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনা কর। (জ) আলাউদ্দিনের সামরিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ? (ঝ) আলাউদ্দিনের মোঙ্গল নীতি সম্বন্ধে কি জান ? (ঞ) আলাউদ্দিনের শাসন-ব্যবস্থা কেন স্থায়ী হয় নাই ?

৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণমূলক উত্তর দাও: (ক) আলাউদ্দিনের রাজ্য-বিজয় নীতি আলোচনা কর। (খ) আলাউদ্দিনের শাসন সংস্কার এবং মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (গ) আলাউদ্দিন খিলজীকে কি একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা যায় ? যুক্তি সহকারে তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(তুঘলক রাজত্ব)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও: (ক) তুঘলক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (খ) কোন্ সুলতান দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করিয়াছিলেন ? (গ) কোন্ সুলতান প্রথম ভারতে তামার নোট প্রচলন করিয়াছিলেন ? (ঙ) খোরাসান এবং কারাজল প্রদেশ কোথায় অবস্থিত ? (চ) কোন্ সুলতানকে 'পাগলা রাজা' বলা হয় ? (ছ) ফিরোজ তুঘলকের জনকল্যাণমূলক সংস্কারের দুই-একটির নাম কর। (জ) কোন্ সুলতান প্রথম **কর্মপরিষদ (Employment Bureau)** গঠন করেন ? (ঝ) ফিরোজ তুঘলক স্থাপিত নূতন শহরের নাম কি ? (ঞ) ফিরোজ তুঘলকের নির্মিত কয়েকটি রাজপথের নাম কর। (ঝ) কোন্ সুলতানকে **সুলতানী যুগের আকবর** বলা হয় ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও: (ক) মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের যৌক্তিকতা দেখাও। (খ) তাঁহার ব্যর্থতার কারণ কি ? (গ) তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতামত আলোচনা কর। (ঘ) সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মহম্মদ-বিন্-তুঘলক এবং ফিরোজ তুঘলকের দায়িত্ব আলোচনা কর। (ঙ) ফিরোজ তুঘলকের **ধর্মান্ধ** নীতি আলোচনা কর।

৩। সংক্ষেপে বর্ণনা মূলক উত্তর দাও ঃ (ক) মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের অভ্যন্তরীণ সংস্কার নীতি আলোচনা কর। সংস্কারগুলির ব্যর্থতার কারণ কি? (খ) মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। তাঁহাকে 'পাগলা রাজা' বলা যুক্তিসঙ্গত কি? (মাঃ ১৯৭৮) (গ) ফিরোজ তুঘলককে প্রকৃত প্রজাকল্যাণকামী স্বৈরাচারী শাসক বলা যায় কি? তাঁহার প্রজাকল্যাণকর ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

(তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ এবং সৈয়দ ও লোদী বংশ)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) তৈমুরলঙ্গ কত খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন? (খ) তৈমুরের ভারত আক্রমণকালে দিল্লীতে কোন্ বংশের সুলতান রাজত্ব করিতেন? (গ) সৈয়দ বংশের দুইজন সুলতানের নাম কর। (ঘ) লোদী বংশের শেষ সুলতান কে ছিলেন?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ (ক) সুলতানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের জন্য তৈমুর-লঙ্গের আক্রমণ এবং সৈয়দ ও লোদী বংশের দায়িত্ব নিরূপণ কর। (খ) ইব্রাহিম লোদীর সহিত বাবরের সংঘর্ষের আলোচনা কর। (গ) তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল?

৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণমূলক উত্তর দাও ঃ (ক) সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি কি? (খ) লোদী বংশের রাজত্বকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(বঙ্গদেশ, বিজয়নগর ও বহ্মনী রাজ্য)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) বঙ্গদেশে মুঘল শাসন প্রথম কে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কত খ্রীষ্টাব্দে? (খ) বঙ্গদেশে ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (গ) ইলিয়াসশাহী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? (ঘ) পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ কোন্ সুলতানের রাজত্বকালে নির্মিত হয়? (ঙ) রাজা গণেশ কে

ছিলেন ? (চ) 'বাংলার আকবর' কাহাকে বলা হয় ? শ্রীচৈতন্য কোন্ সুলতানের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ? (ছ) বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মহম্মদ জয়সীর কাব্যগ্রন্থের নাম কর। (জ) পুরন্দর খাঁ কে ছিলেন ? (ঝ) মালাধর বসু কি রচনা করিয়াছিলেন ? (ঞ) পরাগল খাঁ কে ছিলেন ? (ট) মামুদ গাওয়ান কে ছিলেন ? বহ্‌মনী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (ঠ) বহ্‌মনী হইতে কয়টি রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল ? (ড) তালিকোটের যুদ্ধ কবে এবং কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ঢ) বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (ণ) কৃষ্ণদেব রায় কে ছিলেন ? তাঁহার রাজত্বকালে কোন্ বিদেশী পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন ? (ত) কৃষ্ণদেব রায় রচিত একটি গ্রন্থের নাম কর। (থ) বিজয়নগরের দুইটি বিখ্যাত মন্দিরের নাম কর। (দ) বিজয়নগর ও বহ্‌মনী রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ কি ছিল ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ (ক) হুসেন শাহের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (খ) বিজয়নগর ও বহ্‌মনী রাজ্যের সংঘর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা কর। (গ) কৃষ্ণদেব রায়কে বিজয়নগর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয় কেন ? (ঘ) বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ দাও। (ঙ) হুসেন-শাহী বংশের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কেন ?

৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণমূলক উত্তর দাও ঃ (ক) ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী সুলতানদের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক, স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কি উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটিয়াছিল আলোচনা কর। (খ) বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (গ) বিজয়নগর রাজ্য সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকরা কি লিখিয়া গিয়াছেন ?

সপ্তম অধ্যায়

(সুলতানী আমলে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইসলামীয় প্রভাব)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ (ক) ভক্তি আন্দোলন কাহাকে বলে ? (খ) ভক্তি আন্দোলনের দুইজন নেতার নাম কর। (গ) নানক কে ছিলেন ? (ঘ) নানক কোন্ ধর্মের প্রচার করেন ? (ঙ) কবীরের ভজন সঙ্গীতকে কি বলা হয় ? (চ) তিনি কোন্ ধর্মের লোক ছিলেন ? (ছ) শ্রীচৈতন্যের বাল্য নাম কি ছিল ? (জ) তিনি কোথায় এবং কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঝ) তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমতের নাম কি ? (ঞ) তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্যে প্রধান সহচরদের দুইজনের নাম কর। (ট) 'সুফী' কাহাদের বলা হয় ? (ঠ) দুইজন সুফী সাধু-সন্তের নাম কর। (ড) উর্দু

সাহিত্য কিভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল ? (ঢ) বৈষ্ণব সাহিত্যের দুইজন শ্রীচৈতন্য জীবনীকারের নাম কর। (ঠ) হিন্দু-মুসলমান মিশ্র দেবতার নাম কি ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ (ক) ইসলামীয় একেশ্বরবাদের সহিত হিন্দু একেশ্বরবাদের মিলন কাহারা আনেন ? (খ) সুলতানী যুগে বাংলা সাহিত্যে পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য রচনার কি কাজ হয় ? (গ) সুফী সাধু-সন্তদের দর্শন কি ছিল ? (ঘ) ভক্তিবাদ বলিতে কি বুঝায় ? কাহারা এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন ? (মাঃ ১৯৭৯) (ঙ) শ্রীচৈতন্যের অবদান আলোচনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণমূলক উত্তর দাও ঃ (ক) সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলমান সভ্যতার সমন্বয়মূলক ফলাফল আলোচনা কর। (খ) ভক্তিবাদী আন্দোলন কাহাকে বলে ? কবীর ও শ্রীচৈতন্যের এই আন্দোলন গঠনে কি ভূমিকা ছিল ? (মাঃ ১৯৭৬) (গ) কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্যের কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ঘ) বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর।

———

মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ)
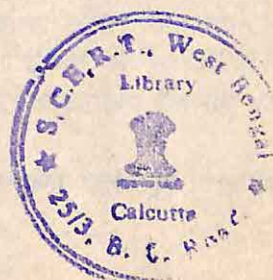
প্রথম অধ্যায়

মুঘল যুগের বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান

মুঘল যুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি ছিল উন্নত ও বহুমুখী। ঐতিহাসিক সাহিত্য যথা—জীবনচরিত ও আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ, সভা—ঐতিহাসিক এবং সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, শিখ, মারাঠা ও রাজপুত ঐতিহাসিক এবং সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা—মুদ্রা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, বিভিন্ন ধরনের সনন্দ ও তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ দানপত্র এই যুগের মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১) এই যুগে লিখিত আত্মজীবনী ও জীবন চরিতগুলির মধ্যে বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী গ্রন্থদ্বয়, জৌহর-রচিত হুমায়ুনের জীবনচরিত, হুমায়ুনের ভগিনী গুলবদন-রচিত 'হুমায়ুননামা' মূল্যবান ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থরূপে স্বীকৃত।

(২) সভা ঐতিহাসিকদের দ্বারা ইতিহাস রচনার শৈলী মুঘল আমলে ভারতে প্রচলিত হয়। আকবরের সভা ঐতিহাসিক আবুল-ফজল-রচিত **আইন-ই-আকবরী** ও **আকবরনামা** গ্রন্থদ্বয় সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ বিশদ ঐতিহাসিক উপাদান। মধ্য যুগের লেখকদের মধ্যে আবুল-ফজলই সর্বপ্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। রাজনৈতিক বিবরণ ছাড়াও ভারতীয় জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মনোজ্ঞ বিবরণের সমাবেশ ঘটাইয়া আবুল-ফজল ইতিহাসের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছেন। বদাউনী-রচিত **মুন্তাখাব উৎ তোখারিখ** গ্রন্থটিও আকবরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। শাহজাহানের রাজত্বকালের সম্বন্ধে আবদুল হামিদ লাহোরী-রচিত **পাদশাহনামা**, ঔরঙ্গজেবের সম্বন্ধে কাফি খাঁর—**মুনতাখানার উল-লুবাক** উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান।

(৩) বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে ইংরেজ-ফরাসী-দিনেমার ও পোর্তুগীজ পর্যটকগণের যথাক্রমে র‍্যালফ ফিচ, টেরী, তেভারণিয়ার, বার্ণিয়ার, মানুচি প্রভৃতি পর্যটকদের বিবরণ হইতে মুঘল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়।

(৪) শিখ, মারাঠা ও রাজপুত লেখক, কবি সাহিত্যিক এবং সভা ঐতিহাসিক যথা—মারাঠা সভাসদের বাখর গ্রন্থ রচনা হইতে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া, মুঘল যুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে এখনও বিরাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সূচনা : খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী পৃথিবীর ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। এই সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এক একটি বিশেষ শক্তিশালী রাজবংশ—যেমন, ইংলণ্ডে টিউডর, ফ্রান্সে বুরবোঁ, পারস্যে সাফাবী, চীনে মিঙ্ এবং ভারতে মুঘল। এই সময়েই ঘটিয়াছিল ভৌগোলিক আবিষ্কার, আসিয়াছিল ধর্মবিপ্লব আর মনোরাজ্যে আসিয়াছিল নূতন চিন্তাধারা। সেই আলোড়নের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছিল ভারতবর্ষের মুঘল যুগের রাজনৈতিক পটভূমিকায়।

মোগল বা মুঘল শব্দটি 'মোঙ্গল' হইতে উদ্ভূত। বর্তমান মঙ্গোলিয়ায় মোঙ্গল জাতির আদি বাসভূমি ছিল। ইহারা ছিল ভারতের মোগল বংশের পূর্ব-পুরুষ। তাহারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত ছিল। তেমুচিন—যিনি চেঙ্গিজ খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন—তাহাদের একত্রে সংগঠন করিয়া একটি বিরাট শক্তিশালী দলের সৃষ্টি করেন এবং রাজ্যজয়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি সিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। তৈমুরই ছিলেন প্রথম মুঘল নেতা যিনি দিল্লী পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পিতৃসূত্রে তৈমুরের এবং মাতৃসূত্রে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর ছিলেন। এই দুই দুর্ধর্ষ বীরের রক্ত শরীরে ধারণ করিয়া তিনি নিজেকে মোঙ্গল বা মুঘল বলিয়া পরিচয় দিতেন। এইজন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইতিহাসে মোগল বা মুঘল বংশ নামে পরিচিত।

মুঘলদের উৎপত্তি

বাবর : তুর্কীস্থানের ফরগণা নামক এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন ওমর শেখ মীর্জা। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৪৯৪ খ্রীঃ) মাত্র এগার বৎসর বয়সে বাবর এই পিতৃরাজ্যের অধিপতি হন। পূর্ব-পুরুষের রাজ্য সমরখন্দ অধিকার করাই ছিল তাঁহার জীবনের স্বপ্ন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই রাজ্য তিনি পর পর দুইবার জয় করিয়াও রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি যখন সমরখন্দে তখন ফরগণা রাজ্যে তাঁহার আত্মীয়েরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। বাবর সমরখন্দ ত্যাগ করিয়া ফরগণা গিয়া সেখান হইতেও বিতাড়িত হইলেন। এইভাবে স্বীয় পিতৃরাজ্য ও বিজিত রাজ্য দুই-ই হারাইয়া তিনি ভাগ্যবিড়ম্বিতের মত কিছুদিন সুযোগের অপেক্ষায় ও আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—"দাবা খেলার রাজার মত এক ঘর হইতে আর এক ঘরে তাঁহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল।" এই সময় তিনি আর একবার পিতৃরাজ্য জয়ের চেষ্টা করিয়া বিফল হন, তখন পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার অসম্ভব মনে করিয়া তিনি পূর্বে হিন্দুস্থানের দিকে মনোযোগ দেন। ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার তাঁহার অধিকারে আসে।

এই সময় ভারতের সর্বত্র অসন্তোষের ঘনমেঘ দেখা দিয়াছিল। দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরদের মধ্যেও অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। দরিয়া খাঁ লোহানীর নেতৃত্বে অযোধ্যা, জৌনপুর ও বিহারেও বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ও ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাবর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে লাহোর গমন করিলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁ মনে করিয়াছিলেন তৈমুরের মত বাবর শুধু লুণ্ঠন করিয়াই দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন। কিন্তু লাহোর ও দীপালপুর বাবরের দখলে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের ভুল ভাঙিল। তাঁহারা মিলিতভাবে বাবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে বাবর কাবুলে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। পর বৎসর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে কামান, বন্দুক ও মাত্র বার হাজার সৈন্য লইয়া পাঞ্জাব দখল করিলেন ও দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহিম লোদী লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া দিল্লীর নিকটবর্তী পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে বাবরের সৈন্যের মুখোমুখি হইলেন। কিন্তু সুনিপুণ রণপরিচালনা ও পশ্চিম এশিয়ায় আনীত ইউরোপের সদ্য আবিষ্কৃত আগ্নেয়াস্ত্র বন্দুক ও কামানের সাহায্যে বাবর অসতর্ক ও শৃঙ্খলাবিহীন সেই লক্ষাধিক দিল্লীবাহিনীকে পরাজিত ও ধূলিসাৎ করেন। এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ)

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থান জয় করা তাঁহার পক্ষে তত সহজসাধ্য ছিল না। একদিকে আফগান নায়ক ও ওমরাহরা নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প, অপরদিকে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ উত্তর-ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর। তিনি ইব্রাহিম লোদী ও তাঁহার ভ্রাতা মাহমুদ লোদী এবং অন্যান্য সমর্থক বহু আফগান নায়ককে লইয়া বাবরকে বাধা দিবার জন্য খানুয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ (খানুয়ার যুদ্ধ) করিয়াও রাজপুত বাহিনী মুঘলের গোলন্দাজ বাহিনীর নিপুণতর সমর-কৌশলের নিকট টিকিতে পারিল না। সংগ্রাম সিংহ পরাজয়ের গ্লানি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন। দুই বৎসর পরে তিনি ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। অতঃপর বাবর ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য ভারতের অন্তর্গত চান্দেরী দুর্গ অধিকার করিয়া পাটনার নিকটে ঘর্ঘরা নদীর তীরে বাংলাদেশ ও বিহারের দুর্দান্ত আফগান সর্দারদের পরাজিত করেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হইতে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী তিরিশ বৎসরকে মুঘল-আফগান সংঘর্ষের যুগ বলা হয়। ঘর্ঘরা (বা গোগরা) যুদ্ধে মুঘল-আফগান সংঘর্ষের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে বলা যায়।

বাবর ও রাজপুত বীর সংগ্রাম সিংহ

আফগান সর্দারগণের সহিত ঘর্ঘরার যুদ্ধ

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে বাবরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁহার রাজ্য অক্ষু নদীর তীর হইতে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, বাবর পুত্র হুমায়ুনের আরোগ্য লাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হুমায়ুন ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করেন আর বাবর মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন। এইভাবে বাবরের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে (১৫৩০ খ্রীঃ)।

মৃত্যুর কিংবদন্তী

মধ্য যুগের ইতিহাসে বাবর এক অসাধারণ চরিত্র। কেবল বীর যোদ্ধা হিসাবেই তিনি ইতিহাসে পরিচিত নন। অসামান্য কর্মশক্তি, অপরিসীম উদ্যম ও অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্রিয়াতে তাহার মূল্যও কিছু কম নয়। অবশ্য জীবনের বেশীর ভাগ সময় তাঁহাকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাঁহার বিজিত সাম্রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বা শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়া তেমন সুদৃঢ় করিয়া যাইতে পারেন নাই। তুর্কী ভাষায় লিখিত বাবরের বিখ্যাত 'তুজক' বা আত্মজীবনী হইতে যতদূর জানা যায় যে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বাবর বিজেতা হিসাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দেশকে ও তাহার অধিবাসীদের তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি তাঁহার দোষ-ত্রুটি সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানের অসহ্য গরম, দারিদ্র্য, ধূলিমলিন ধূসরতা ও দেশের লোকের অপরিচ্ছন্নতা তাঁহাকে পীড়া দিত। তাঁহার নিকট হিন্দুস্থানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে একটি বিশাল দেশ এবং এখানে সোনা-রূপা অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাবরের আত্মজীবনী

প্রবল আত্মবিশ্বাস ও অসীম কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন বাবর। দৈহিক শ্রমের কার্যে তিনি কখনও বিমুক্ত ছিলেন না। সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার দিকেও তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। বিজিত স্থানগুলির উদারতা, দানশীলতা, বন্ধু ও স্বজনপ্রীতি, সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ বাবরের চরিত্রকে অসামান্য বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। শাসক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য নয়; কারণ পৌত্র আকবরকেই আবার নূতন করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু স্টেনলি লেন পুল প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে তাঁহার বংশের শান্তি সমৃদ্ধি কালের ইতিহাস অবলুপ্ত হইয়া গেলেও তাঁহার কালজয়ী জীবনস্মৃতির আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ আছে। মানুষ হিসাবে বাবরের পরিচয় চিরকাল মনে রাখিবার মত।

২-ক : মুঘল-আফগান সংঘর্ষের বিভিন্ন পর্যায় :

শের শাহের আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা : ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর বাবর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও আফগানদের সহিত

সংঘর্ষ পরবর্তী তিরিশ বৎসর (১৫২৬-৫৬ খ্রীঃ) ধরিয়া চলিয়াছিল। মুঘল-আফগান সংঘর্ষের এই ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারেঃ (১) ১৫২৬-৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাথমিক যুগে বাবর দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করার পর পূর্ব-ভারতের (বাংলা ও বিহারের) সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে গোগরা বা ঘর্ঘরা নদীর তীরে পরাজিত করেন। (২) ১৫৩০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হওয়ার পর হইতে গুজরাট এবং বাংলা ও বিহারের আফগান শাসকগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত বিহারের ভাগ্যান্বেষী পাঠান বীর শের খাঁর হস্তে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হন। ফলে আফগান সাম্রাজ্য শের শাহের নেতৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাঁচ বৎসরের (১৫৪০-৪৫ খ্রীঃ) জন্য সংঘর্ষের বিরতিকাল। (৩) ১৫৪৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের যুগে শের শাহের অযোগ্য ও দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সহিত হুমায়ুনের সংঘর্ষ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মহামতি আকবর কর্তৃক পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগান সুলতান (শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র) আদিল শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

শের শাহ ঃ মধ্য যুগের ভাগ্যান্বেষী বীরদের মধ্যে যাঁহারা সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন, শের শাহ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি জাতিতে ছিলেন পাঠান। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল ফরিদ খাঁ। পিতা হাসান খাঁ শূর ছিলেন বিহারের একজন জায়গিরদার। এখানেই ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৮৬ খ্রীঃ) ফরিদের জন্ম হয়। কিন্তু বিমাতার চক্রান্তে অল্পদিনের মধ্যে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছিল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁ লোহানীর অধীনে কর্মগ্রহণ করিলেন। এই সময় একটি বাঘকে তিনি হত্যা করায় প্রভু তাঁহাকে 'শের' অর্থাৎ 'ব্যাঘ্র' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এখন হইতে ফরিদ খাঁ 'শের খাঁ' নামে পরিচিত হইলেন। আবার সম্রাট হওয়ার পর তাঁহার নাম হইয়াছিল 'শের শাহ'।

বহর খাঁ লোহানীর নিকট চাকরি
'শের খাঁ উপাধি লাভ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের পর তিনি আগ্রায় গিয়া বাবরের নিকট কর্মগ্রহণ করিলেন। বাবর শের খাঁর কর্মদক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার সাসারামের জায়গিরটি ফিরাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বিহারে ফিরিয়া আসিয়া নাবালক সুলতান জালাল খাঁর অভিভাবক হিসাবে বিহারের শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব লাভ করেন। শের খাঁ এই সুযোগে স্বীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠিলেন। এই সময় তিনি চুনার দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গাধিপতি তাজ খাঁকে নিহত করিলেন। তাজ খাঁর বিধবা পত্নী মালিকাকে তিনি

চুনার দুর্গ লাভ

বিবাহ করিলেন এবং চুনার দুর্গটি লাভ করিলেন। শের খাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে বিহারের ওমরাহগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সহিত একযোগে শের খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন। শের খাঁ সুরজগড়ের যুদ্ধে তাঁহাদের পরাজিত করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন (১৫৩৪ খ্রীঃ)।

সূরজগড়ের যুদ্ধে জয়লাভ

হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তার : বাবরের মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতের আফগানগণ মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, শের খাঁ তাহাতে যোগ দেন নাই সত্য ; কিন্তু হুমায়ুনের দুর্বলতার সুযোগে তিনি শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। হুমায়ুন শের খাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আতঙ্কিত হইয়াছিলেন চুনার দুর্গ জয়লাভের পর হইতে। তিনি ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান পাঠাইলে সুচতুর শের খাঁ বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং হুমায়ুন তাঁহাকে চুনার দুর্গ প্রত্যর্পণ করেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সুযোগে শের খাঁ পূর্ব-ভারতে নির্বিবাদে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন। তিনি বাংলার মামুদ শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নিরুপায় বঙ্গসুলতান হুমায়ুনের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। হুমায়ুন গুজরাট অভিযান অসমাপ্ত রাখিয়া শের খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি সরাসরি শের খাঁকে বাধাদান না করিয়া চুনার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। ছয় মাস অবরোধের পর দুর্গটি যখন অধিকৃত হইল, শের খাঁ তখন বিনা বাধায় রোটাস দুর্গটি জয় করিয়া গৌড় পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তার করিলেন এবং হুমায়ুন যখন গৌড় অভিমুখে অগ্রসর হইলেন শের খাঁ সুরক্ষিত রোটাস দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হুমায়ুন আট মাস কাল গৌড়ে অবস্থান করিলেন। এই সুযোগে শের খাঁ পশ্চিমদিকে অভিযান চালনা করিয়া জৌনপুর, বারাণসী, কনৌজ প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া লইলেন। হুমায়ুনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে চৌসা নামক স্থানে (বক্সারের নিকটে) শের খাঁর বাহিনী মুঘল সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিল (১৫৩৯ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে শের খাঁ বাংলা, বিহার এবং জৌনপুরের স্বাধীন শাসক হইলেন। এখন হইতে তিনি 'শের শাহ' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সমকক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হুমায়ুন পর বৎসর সসৈন্যে শের শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কনৌজের অনতিদূরে বিল্বগ্রাম নামক স্থানে মুঘল ও পাঠান বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ হইল। হতভাগ্য হুমায়ুন পুনরায় পরাজিত হইলেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান এবং শূর বংশের রাজত্বের সূচনা হইল। হুমায়ুন হৃত রাজ্য

শের খাঁর বঙ্গদেশ অভিযান

রোটাস দুর্গ জয়

চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়

শের শাহ উপাধি ধারণ

বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের পুনরায় পরাজয়

পুনরুদ্ধার করিবার জন্য ভ্রাতাদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু সাহায্য দেওয়া দূরের কথা, কেউ আশ্রয় পর্যন্ত পলাতক বাদশাহকে দিলেন না। এই দুঃসময়ে অমরকোটের হিন্দু রাজার আশ্রয়ে থাকাকালে তাঁহার বিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হইয়াছিল (১৫৪২ খ্রীঃ)।

হুমায়ুনের পলাতক জীবন

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিবার পর শের শাহ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিয়া ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে মালব জয় করিলেন। অতঃপর মুলতান তাঁহার অধিকারে আসিল। মারবাড়ের রাজা মালদেবকে পরাজিত করিয়া রাজপুতানায়ও তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। শেষ পর্যন্ত বুন্দেলখন্ডের বিখ্যাত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ চালাইবার কালে বোমা বিস্ফোরণের ফলে শের শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৪৫ খ্রীঃ)।

শের শাহের পলাতক জীবন

শের শাহের শাসন-ব্যবস্থা : শের শাহ মাত্র পাঁচ বৎসর (১৫৪০-'৪৫ খ্রীঃ) দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেও তাঁহাকে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি যেভাবে শাসনদক্ষতা, সংগঠনের শক্তি ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সত্যিই বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব। তিনি পূর্বসূরী হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া সময়োচিত ও কার্যকরী উন্নত শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভাবন এবং প্রচলন করিয়াছিলেন। শুধু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নয়, ইংরেজ ঐতিহাসিক কীন (Keene) ও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংরেজ শাসকগণও এই আফগানের মত সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ডঃ কানুনগো, ডঃ ত্রিপাঠী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার মৌলিকত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত, কিন্তু প্রজাবৎসল। শের শাহ সে যুগের অন্যান্য রাজার মত স্বৈরাচারী ছিলেন না। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার শাসন-ব্যবস্থাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। এইদিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রজাবৎসল বা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের সহিত তাঁহার তুলনা করা চলে।

শের শাহ সমগ্র রাজ্যটিকে সাতচল্লিশটি সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এইগুলি যেন এক একটি প্রদেশ। তিনি প্রতিটি সরকারকে আবার কতকগুলি 'পরগনায়' বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরগনায় আমিন, শিকদার, খাজাঞ্চী, মুনসী প্রভৃতি কর্মচারী ছিল। আমিনের কাজ ছিল ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ এবং সংগ্রহ করা ; শিকদারদের উপর ভার ছিল শান্তি রক্ষা করা ; খাজাঞ্চীর কাজ ছিল টাকাকড়ি রাখা এবং মুনসীর কাজ ছিল হিসাব লেখা। মুন্সেফগণ বিচারকার্য সমাধা করিতেন। প্রত্যেক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন 'শিকদার-ই-শিকদারান' এবং 'মুন্সেফ-ই-মুন্সেফান'। রাজকর্মচারিগণ যাহাতে এক জায়গায় বেশীদিন থাকিলে দুর্নীতিগ্রস্ত না হইয়া পড়েন, সেইজন্য তিনি কয়েক বৎসর অন্তর তাঁহাদের বদলীর ব্যবস্থা করেন।

শাসন বিভাগ

কৃষি ও ভূমি-রাজস্ব সংস্কার শের শাহের শাসন সংস্কারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সংস্কার। প্রত্যেক জমি জরিপ করিয়া এবং জমির উর্বরতা
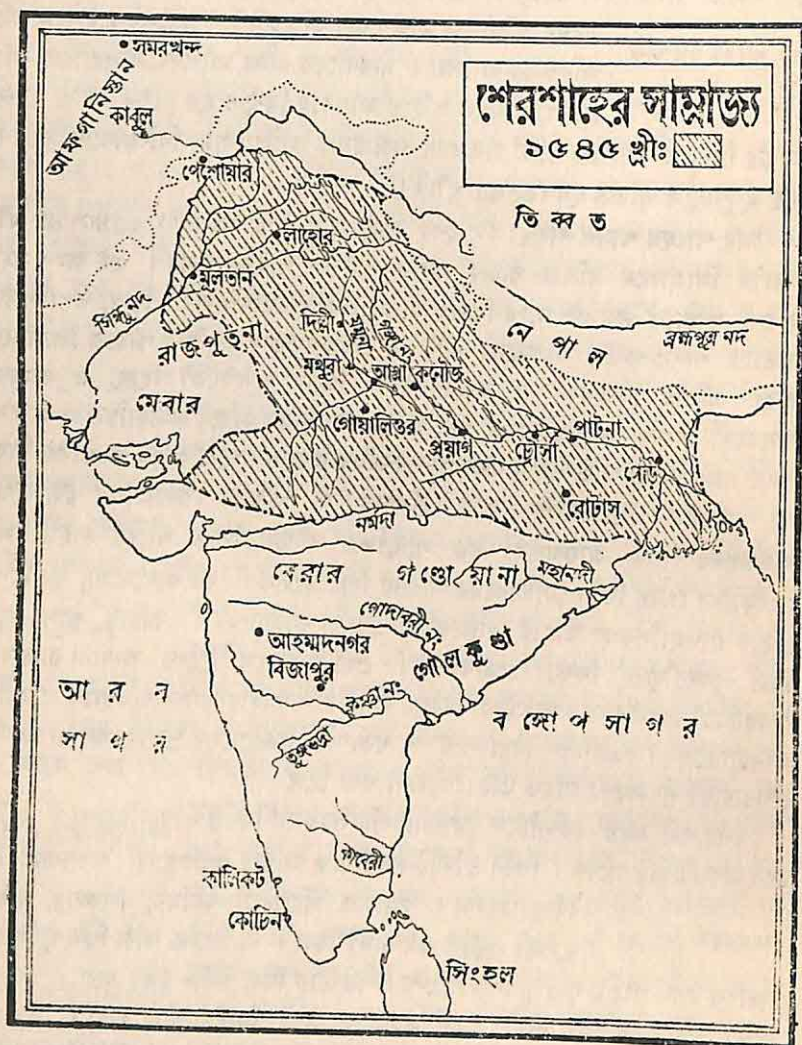
অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়া উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি তিনি প্রচলন করিয়াছিলেন। উৎপাদিত ফসল কিংবা সেই ফসলের মূল্য রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। জমির উপর চাষীর স্বত্ব এবং রাজস্ব হিসাবে সরকারকে দেওয়ার শর্ত সম্বলিত দলিলে চাষী স্বাক্ষর করিয়া দিত। ইহাকে বলা হইত 'কবুলিয়ৎ'। সরকার

ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংস্কার

প্রজাদের দিত 'পাট্টা'। ইহাতে রাজার পক্ষ হইতে জমির উপর চাষীর অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। রাজা এবং চাষীর মধ্যে এরকম সরাসরি পাকা বন্দোবস্ত শের শাহের পূর্বে অন্য কেহ চালু করেন নাই। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ হইলে অথবা অন্য কোন কারণে শস্যহানি ঘটিলে খাজনা কিছুটা মকুব করা হইত এবং চাষীদের কৃষিঋণও দেওয়া হইত।

শের শাহ মুদ্রা ব্যবস্থারও সংস্কার করিয়াছিলেন। মুদ্রার বিশুদ্ধতা এবং মূল্য সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। রাজকর্মচারীদের নগদ অর্থে মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। শুল্ক-নীতি সম্বন্ধেও তিনি আধুনিক নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সুন্দর সুন্দর রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমে সিন্ধুতীর পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এই রাস্তাটির গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড্' (Grand Trunk Road) নাম ছিল। বর্তমানে শের শাহ্ পথ বলা হয়। তাহা ছাড়া, আগ্রা হইতে চিতোর, যোধপুর এবং লাহোর হইতে মুলতান পর্যন্ত বিভিন্ন রাজপথও তাঁহার সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের নানা স্থানে দ্রুত সংবাদ সরবরাহের জন্য তিনি ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার জন্য তিনি বহু গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি প্রত্যেক গ্রামের মোড়ল বা পাটেলের উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাস্তা খুব নিরাপদ ছিল। দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফৌজদারদের অধীনে 'ফৌজ' থাকিত নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য।

ধর্মীয় উদারতা

শের শাহের কোন ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিল না। মধ্য যুগের ইতিহাসে ধর্মীয় গোঁড়ামী সাধারণ নিয়ম ছিল। শের শাহের উদারতা এবং আধুনিক মনোবৃত্তি মধ্য যুগের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রম, যাহা আকবরের মধ্যেও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার ও সমান ব্যবহার করিতেন। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে সকলকেই তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার একজন সেনাপতি ছিলেন ব্রহ্মাজিৎ নামে এক হিন্দু।

কৃতিত্ব

শের শাহের মত রাষ্ট্র প্রতিভাসম্পন্ন শাসক মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসে আকবরের রাজত্বকালের পূর্বে নিতান্তই বিরল। প্রজার কল্যাণ, শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা এবং দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনা, কৃষকদের অধিকার রক্ষা, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র নাশ, হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার প্রভৃতি গুণাবলী ভারত-ইতিহাসে তাঁহাকে এক অক্ষয় ও চিরস্মরণীয় আসন দান করিয়াছে। আকবরের কৃতিত্বের মূলে শের শাহের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শের শাহের উত্তরাধিকারিগণ : মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন : ঐতিহাসিক ডক্টর স্মিথ বলিয়াছেন যে শের শাহ আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে মুঘল সম্রাট আকবরের (তথা মুঘলদের) পুনরুত্থান সম্ভব হইত না।[১] এই উক্তি যথার্থই সত্য। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারিগণ গৃহবিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহাদের মধ্যে শের শাহের প্রতিভার লেশমাত্র ছিল না। অধিকন্তু হিংসা-দ্বেষ, রেষারেষি প্রভৃতির ফলে শাসন-ব্যবস্থা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িল।

সিকন্দর শূর নামে শেষ শূরবংশীয় শাসক কিছুদিনের জন্য নামেমাত্র দিল্লী ও আগ্রা শাসন করিয়াছিলেন। শূর শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে হুমায়ুন পারস্য সম্রাটের সাহায্য লইয়া কাবুল ও কান্দাহার জয় করিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিরহিন্দের যুদ্ধে সিকন্দর শূরকে পরাজিত করিয়া বিনা বাধায় দিল্লী-আগ্রা পুনরধিকার করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করিলেন। কিন্তু পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইল। অতঃপর তাঁহার পুত্র মাত্র তের বৎসর বয়স্ক আকবরের উপর তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার পড়িল।

(২-খ) : মহামতি আকবর : মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সংহতি সাধন : হুমায়ুন মৃত্যুর পূর্বে পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি পুনরায় অধিকার করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বালক আকবরকে বৈরাম খাঁ নামক তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচরের অভিভাবকত্বে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র অভিজ্ঞ বৈরাম খাঁ বালক আকবরকে দিল্লীর বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)। নিজে নাবালক বাদশাহের অভিভাবকরূপে সমস্যাসঙ্কুল মুঘল সাম্রাজ্যের কর্ণধার হইলেন।

জন্ম, বাল্যকাল ও সিংহাসন লাভ

বালক আকবরের রাজত্বকালের শুরু হইতেই দেখা দিয়াছিল নানা সমস্যা। হুমায়ুন শের শাহের বংশধরগণের হাত হইতে মুঘল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য তখন দিল্লী, আগ্রা এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সঙ্কীর্ণ এই সাম্রাজ্যে না ছিল শৃঙ্খলা, না ছিল সংহতি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই তখন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল এবং তাহারা নাবালক বাদশাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। শূর বংশীয় আফগানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মহম্মদ আদিল শাহ আকবরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। এককথায়, আকবরের সিংহাসনারোহণ কালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল ছিল।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং আকবরের সমস্যা

---

(১) "If Sher Shah had been spared, he would have established his dynasty and the great Mughals would not have appeared on the stage of history."

বালক আকবর তাঁহার অভিজ্ঞ অভিভাবক বৈরাম খাঁর সুপরিচালনায় প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি হইতে মুক্ত হন এবং সামরিক অভিযান, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, হিন্দু রাজপুত রাজন্যবর্গের সহিত বৈবাহিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং উদার ও সহনশীল হিন্দু নীতির মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সংহতি সাধন করেন।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ আকবরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিল শাহ আকবরকে দিল্লীর বাদশাহরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহার হিন্দু মন্ত্রী হিমুকে দিল্লী এবং আগ্রা অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। হিমু বিক্রমজিৎ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর মসনদে বসিলেন। নাবালক বাদশাহকে পানিপথের বিখ্যাত রণক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইল (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর)। হিমু পরাজিত ও নিহত হইলেন। দুর্বল মুঘল সাম্রাজ্য আসন্ন পতনের হাত হইতে রক্ষা পাইল। আকবরের জয়লাভের ফলে সিকন্দর শূর, ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতি আফগানদেরও ক্ষমতার পতন ঘটিল।

হিমুর পরাজয়

আফগানদের পরাজয় ও পতন

অতঃপর আকবর বৈরাম খাঁর প্রভাবমুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন। একদিকে তিনি নিজ হস্তে ক্ষমতালাভের জন্য বৈরাম খাঁর পতন ঘটাইতে সচেষ্ট হইলেন, অপরদিকে বালক বাদশাহের মাতা হামিদা বানু, ধাত্রীমাতা মহোম্ আনাগা প্রভৃতি 'হারেমের' ক্ষমতালোভী মহিলাগণ বৈরামের পতন ঘটাইবার জন্য আকবরকে উস্কানি দিতে লাগিলেন। বৈরাম খাঁ বিদ্রোহ করিলে আকবর তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু পথে শত্রুর হাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৫৬০ খ্রীঃ)।

বৈরাম খাঁর পতন

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ আকবর ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক অখন্ড সাম্রাজ্য স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল নিরবচ্ছিন্নভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি মনে করিতেন শক্তিশালী রাজার পক্ষে দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প গ্রহণ করা অপরিহার্য। অন্যথায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র দুর্বল মনে করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবে।[১] তাহা ছাড়া, সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে নিয়োজিত না করিলে তাহারা অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে। আকবর নিছক সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করিয়া একটি জাতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আকবর রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যজয়ের নীতি ও কারণ

বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি শুরু হইয়াছিল।

(১) A monarch should ever be intent conquest, otherwise his neighbour rise in arms against him.

পানিপথের যুদ্ধের পরবর্তী চারি বৎসরের মধ্যে গোয়ালিয়র, জৌনপুর ও আজমীর প্রভৃতি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বৈরাম খাঁর পদচ্যুতির পর আকবরের সেনাবাহিনী মালব রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। এই অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ধাত্রীমাতা মহোম্ আনাগার পুত্র আদম খাঁ এবং আকবরের বিশ্বস্ত অনুচর পীর মহম্মদ। ইহার অল্পকাল পরে আকবর সেনাপতি (কারা রাজ্যের শাসনকর্তা) আসফ খাঁর নেতৃত্বে বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডোয়ানা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মালব অধিকার

আকবর

সেই সময় গণ্ডোয়ানা রাজ্যের নাবালক রাজা বীর নারায়ণের পক্ষে রাজত্ব করিতেন তাঁহার মাতা রাণী দুর্গাবতী। এই বীরাঙ্গনা সহজে মুঘল বাহিনীর নিকট বশ্যতা স্বীকার না করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছিলেন। বীর নারায়ণও মাতার পথ অনুসরণ করিয়া বীরের মত জীবনদান করিলেন। মুঘল বাহিনী গণ্ডোয়ানা অধিকার করিয়া লইল। প্রভূত ধনরত্ন তাহাদের হস্তগত হইল।

গণ্ডোয়ানা জয়

অতঃপর রাজপুতানার অম্বরের রাজা বিহারীমল নিজের কন্যার সহিত আকবরের বিবাহ দিলেন। ইহার ফলে পুত্র ভগবানদাস এবং পৌত্র মানসিংহ মুঘল দরবারে বিশেষ আসন লাভ করিলেন। কিন্তু মেবারের রাজধানী চিতোর সহজে বশ্যতা স্বীকার না করায় আকবর চিতোর আক্রমণ করিলেন এবং জয় করিয়া লইলেন। মেবারের রাণা উদয়সিংহ পলাইয়া গিয়া উদয়পুর নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। এক বৎসর পরে আকবর রণথম্ভোর অধিকার করিয়া লইলেন। একে একে মারওয়াড়, বিকানীর, যয়শলমীর, বুন্দী প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। আকবর রাজপুতানার অধিকাংশ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের স্বাধীনতার সংগ্রাম ইতিহাসে চির ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয়ের পরও দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই রাজপুত স্বাধীনতা সংগ্রামী আমৃত্যু মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিলেন।

রাজপুতানা জয়

পশ্চিম-ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য আকবর গুজরাট আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর কোন যোগ্য শাসক গুজরাটের সিংহাসনে

আরোহণ করেন নাই। সেইহেতু সেখানে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। এই প্রদেশটি ছিল সম্পদশালী ও শস্য সমৃদ্ধ। ইহার পশ্চিম উপকূলে ছিল অনেক পোতাশ্রয়। সেইজন্য আকবরের নিকট ইহা ছিল খুব লোভনীয় স্থান। তিনি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে একটি অভিযান প্রেরণ করিলেন এবং তৃতীয় মুজাফর শাহকে পরাজিত করিয়া রাজ্যটি অধিকার করিলেন। পরের বৎসর তিনি সুরাট বন্দর অধিকার করিলেন।

গুজরাট জয়
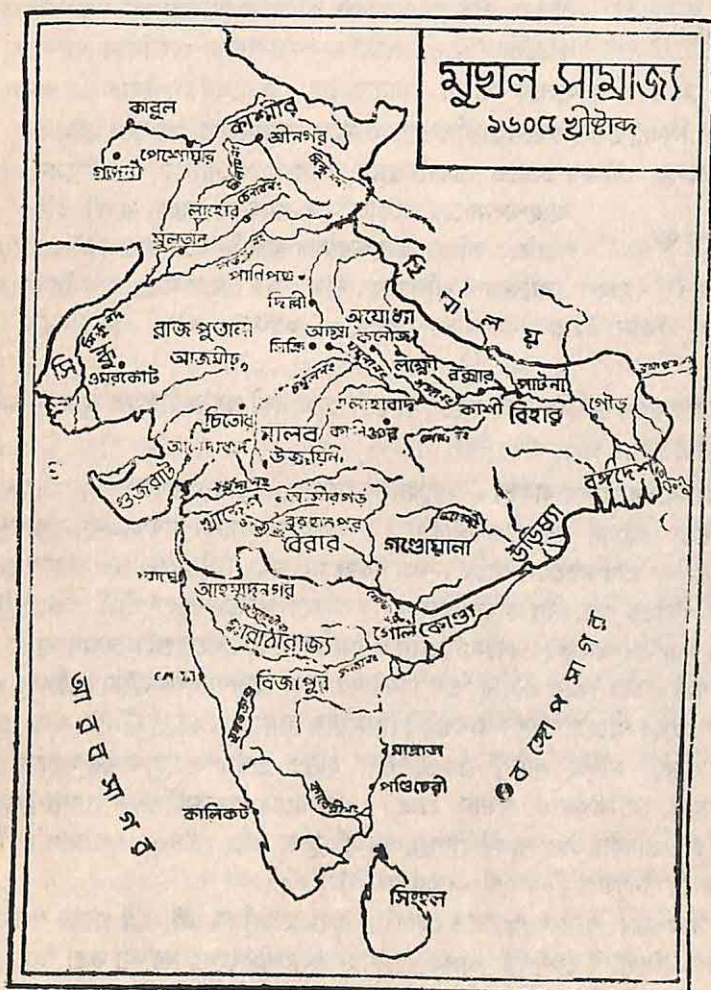
অতঃপর আকবর বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান দাউদ খাঁকে দমন করিয়া বঙ্গদেশ দখল করিবার জন্য মুনিম খাঁর অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। প্রথমে

উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং পরে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিল। বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসিল; কিন্তু 'বার ভূঁইঞা' নামে বাংলার স্বাধীন জমিদারগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে উড়িষ্যাও মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা মহম্মদ হাকিম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আকবর তাঁহাকে পরাজিত করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন (১৫৮১ খ্রীঃ)। পাঁচ বৎসর পরে মির্জা মহম্মদের মৃত্যু ঘটিলে আকবর কাবুলকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান প্রভৃতি রাজ্যও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

বঙ্গদেশ অধিকার

কাবুল অধিকার

অতঃপর দক্ষিণ-ভারতে রাজ্যবিস্তারে আকবর মনোনিবেশ করিলেন। তিনি আহম্মদনগরের তৎকালীন শাসনকর্ত্রী বিধবা রাণী চাঁদ বিবিকে পরাজিত করিয়া আহম্মদনগর রাজ্যটি ছলে-বলে-কৌশলে অধিকার করিলেন। খান্দেশ রাজ্যের অসিরগড় দুর্গ জয় আকবরের রাজ্যবিজয়ের শেষ অধ্যায়। তিনি ইহার অল্পদিন পরে (১৬০৫ খ্রীঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

দাক্ষিণাত্য জয়

এইভাবে উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আকবরের রাজ্যসীমা প্রসার লাভ করিয়াছিল।

আকবরের শাসন-ব্যবস্থা ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের ন্যায় মুঘল শাসন-ব্যবস্থারও প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন মহামতি আকবর। আকবরের শাসন-ব্যবস্থা নূতন ব্যবস্থা ছিল কিনা সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বলা হইয়া থাকে যে তিনি শের শাহ কর্তৃক প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন। আবার অনেকে বলেন, তিনি আলাউদ্দিনের শাসন পদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন। আকবর নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান শাসক ছিলেন বলা যায়। তবে তিনি তাঁহার পূর্বগামীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিতে পারেন। আকবর শের শাহের রাজস্ব ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে আকবরের শাসন পদ্ধতিতে মৌলিকতার অভাব ছিল। আকবরের শাসননীতির মূলকথা ছিল উদার-নৈতিক প্রজাকল্যাণকর শাসন-ব্যবস্থা, ধর্মসহিষ্ণুতা এবং প্রতিভা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে রাজকার্যে নিয়োগ ('career open to talent')।

আকবরের শাসন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক এই দুই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার তথা সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তিনি ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, একাধারে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ অধিনায়ক। সম্রাট স্বৈরাচারী হইলেও স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন না।

সম্রাটকে শাসন-ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য অনেক বিভাগ ছিল। কয়েকজন মন্ত্রীর উপরে এই সকল বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল। (১) সম্রাটের নীচেই ছিলেন ভকিল বা 'ওয়াজীর'। তিনিই ছিলেন প্রধান মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান। আর চারিজন মন্ত্রী হইলেন যথাক্রমে (২) দেওয়ান বা রাজস্ব আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী (৩) মীর-বকসী বা সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী এবং (৪) মীর সামান বা সম্রাটের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনের নিমিত্ত রাজকারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি বাদশাহী গার্হস্থ্য বিভাগেরও সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন। (৫) সদর-উস্-সদর ছিলেন ইসলামধর্মীয় ব্যাপারসমূহের বিচার বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী।

উপরি-উক্ত ঊর্ধতন কর্মচারীদের নীচে ছিলেন 'দারোগায়ে ডাকচৌকি' এবং মীর আরজ। ইঁহারা ছিলেন যথাক্রমে গুপ্তচর বিভাগ এবং প্রজাসাধারণের আবেদন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

রাজস্ব নীতি ঃ আকবর রাজা টোডরমলের সাহায্যে রাজস্ব নীতির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। টোডরমলের রাজস্ব নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ঃ (১) আবাদী জমির নির্ভুল জরিপ করা, (২) প্রতি বিঘা জমির উৎপন্ন শস্যের গড় নির্ণয় করা এবং (৩) সেই অনুপাতে প্রতি বিঘা জমির রাজস্বের হার নির্ধারণ করা।

সাধারণতঃ, তিন প্রকারের রাজস্ব নীতি অনুসারে আদায় হইত—(১) **গাল্লাবক্স্** বা শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা ; (২) **জাবৎ** বা শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী 'পোলজ' (সম্বৎসর চাষের জমি), পরৌটি (বৎসরের কিছু সময়ে চাষের জমি), 'চাচর' (যে জমি তিন বৎসরের জন্য পতিত থাকিত) এবং বনজর (যে জমি পাঁচ বৎসরের জন্য পতিত থাকিত) এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইত। এই ব্যবস্থা গুজরাট, বিহার, মালব ও রাজপুতানায় প্রচলিত ছিল। (৩) **নসক** প্রথানুসারে জমি জরিপ করিয়া উহার উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী কর ধার্য করার পরিবর্তে একটা মোটামুটি অনুমানের উপর রাজস্ব নির্ধারিত হইত। এই প্রথা অনেকটা জমিদারি প্রথার অনুরূপ। ইহা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল।

রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজধানীতে প্রধান দেওয়ান এবং প্রত্যেক সুবায় বা প্রদেশে একজন প্রাদেশিক দেওয়ান নিযুক্ত করা হইত। প্রত্যেক সরকারে একজন আমিন এবং প্রত্যেক পরগনায় কানুনগো ও মুকদ্দম রাজস্ব আদায় এবং রাজকোষে তাহা প্রেরণ করিতেন। দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিলে রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকিত।

প্রাদেশিক শাসন ঃ আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুবাদার ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি। দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। অন্যান্য

প্রাদেশিক কর্মচারীর মধ্যে কাজী, আমিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি সুবা কতকগুলি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগনায় ও মহালে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি সরকারের ভার ছিল একজন করিয়া ফৌজদারের উপর। গ্রামাঞ্চলে কানুনগো, মুকদ্দম ও পাটোয়ারী ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারী।

মনসবদারী ও জায়গিরদারী প্রথা ঃ 'মনসব' কথাটির অর্থ হইল পদমর্যাদা। সামরিক এবং বেসামরিক উভয় বিভাগেই মনসবদারগণ নিযুক্ত হইতেন। তবে সাধারণতঃ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরই মনসবদার পদমর্যাদা দেওয়া হইত। মনসবদারগণ **তেত্রিশটি** শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সৈন্যসংখ্যার ভিত্তিতে এই বিভাগ করা হইত। **সর্বনিম্ন** মনসবদারের অধীনে ১০ জন এবং সর্বোচ্চ মনসবদারের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য থাকিত। আট-হাজারী, দশ-হাজারী প্রভৃতি মনসব সাধারণতঃ রাজকুমারগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত।

মনসবদারগণকে সামরিক এবং বেসামরিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইত। তাহাদের পদমর্যাদা সম্রাটের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে ইহা প্রদত্ত হইত না। নগদ অর্থে এবং জায়গিরের মাধ্যমে মনসবদারদের মাহিনা দেওয়া হইত। বংশানুক্রমিকভাবে নৃপতিগণ যে জায়গির ভোগ করিতেন তাহাকে বলা হইত 'ওয়াতন জায়গির'।

মনসবদারগণের উপর তাহাদের নির্দিষ্ট সৈন্য ছাড়াও 'দাখিলী' নামক সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার ছিল। তবে এই সৈন্যগণ রাজকোষ হইতে বেতন পাইত। 'আহদী' নামে অপর একটি সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার আমীরগণের উপর ন্যস্ত ছিল।

আকবরের ধর্মমত ঃ ভারতবর্ষের মুসলমান শাসকদের মধ্যে আকবর সর্বাপেক্ষা উদার ধর্মনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় আকবর **একেশ্বরবাদ** এবং **সর্বধর্মীয় সমন্বয়ের** আদর্শ প্রচার **করিয়া উদার মনোভাব** এবং গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন। মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ঐশ্লামিক তথা উলেমাদের প্রভাবমুক্ত রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ দূর করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি সাধন করিতে হইবে। সেইজন্য প্রয়োজন একটি সর্বভারতীয় ধর্মের। এই কারণে সর্ব-ধর্মের সমন্বয় 'দিন-ইলাহি' নামক এক ধর্মমতের তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন (১৫৮১ খ্রীঃ)।

উদার ধর্মমত

রাজনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও তাঁহার উদার ধর্মমতের আরও কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জন্মসূত্রে পিতা ও পিতামহের সুফী মতবাদ, মাতার উদার শিয়া মতবাদ এবং বাল্য শিক্ষক আবদুল লতিফের 'সুল-ই-কুল' বা উদার ও সহিষ্ণু নীতি তাঁহার মনে গভীর

জন্মগত শিক্ষা

বাল্যশিক্ষা

রেখাপাত করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, স্বীয় রাজপুত মহিষীদের প্রভাব এবং সমকালীন হিন্দু ধর্ম-আচার্যদের উদার ধর্ম আন্দোলন তাঁহার উদার ধর্মমত গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সেখ মুবারক এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় ফৈজী এবং আবুল ফজলের সহিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ফলে তিনি ঐশ্লামিক গোঁড়ামীর প্রতি এবং উলেমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্দেশের প্রতি বিশেষভাবে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসার বশবর্তী হইয়া ধর্মালোচনার জন্য ফতেপুর সিক্রিতে একটি 'ইবাদৎখানা' বা উপাসনা মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় হিন্দু, জৈন, পারসী, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের পণ্ডিতগণের ধর্মালোচনা শুনিয়া তিনি বিভিন্ন ধর্মের মূলকথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল যে, সকল ধর্মের সারকথা এক এবং অভিন্ন। এই উপলব্ধিই তাঁহাকে 'স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ' (Divine monotheism) বা সর্বধর্ম সমন্বয় 'দিন-ইলাহি প্রবর্তন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

হিন্দু মহিষীগণ

ইবাদৎখানা প্রতিষ্ঠা

স্বর্গীয় একেশ্বরবাদ

আকবরের ধর্মীয় জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি অনুসারে বলা যায়, ইবাদৎখানায় নানা ধর্মের আলোচনা শুনিবার পর এবং বিভিন্ন ধর্মের ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসিবার পর তিনি ইসলাম ধর্মের উলেমা সম্প্রদায়ের গণ্ডির বাহিরে আসিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি ধর্মান্ধ মুসলমান পুরোহিত অপসারণ করিয়া নিজেই ফতেপুর সিক্রির মসজিদে প্রধান পুরোহিতের আসন দখল করিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মীয় ক্ষেত্রেও অনুরূপ একাধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সেক মোবারকের সাহায্যে ও পরামর্শক্রমে একটি দলিল প্রস্তুত করিয়া ঘোষণা করিলেন যে তিনি নিজে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ব্যাপারের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এই দলিলকে 'অভ্রান্ত আদেশ জারীর ঘোষণা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই আদেশ জারীর ফলে ইসলাম জগতে আকবরকে ইসলাম-বিরোধী আখ্যা দেওয়া হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকবর তখনও ইসলাম-বিরোধী ছিলেন না। তিনি উলেমাদিগের কর্তৃত্ব নাশ করিয়া ইসলাম ধর্ম সংস্কারের জন্য সমকালীন ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের 'এ্যাক্ট অফ সুপ্রিমেসি'র (Act of Supremacy) মত সর্বময় কর্তৃত্বের আইন করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। ধর্মীয় মতান্তরের ক্ষেত্রে সম্রাটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইলে এই ধর্ম সকলের নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে। রাজার ধর্ম প্রজার ধর্ম হইলে রাষ্ট্রের সংহতি ও ঐক্য বৃদ্ধি পাইবে।

অভ্রান্ত আদেশ জারীর ঘোষণা

অতঃপর আকবরের ধর্ম জীবনের তৃতীয় এবং শেষ পর্যায় শুরু হইল। তিনি দিন-ইলাহি নামক তাঁহার একেশ্বরবাদী, সর্বধর্ম সমন্বয়মূলক ধর্মমত প্রবর্তন করিলেন। ইহাতে সকল ধর্মের সারমত স্থান পাইয়াছিল, যেমন— 'জীবে দয়া', নিরামিষ ভোজন, সম্রাটের জন্য ধন, মান, প্রাণ বিসর্জনের শপথ গ্রহণ ইত্যাদি। এই ধর্মের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে ইসলামীয়,

দিন-ইলাহি

হিন্দু এবং পারসী প্রভৃতি ধর্মের অনেক অনুষ্ঠান স্থান পাইয়াছিল। বদাউনী আকবরের ধর্মমতের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন।

সমালোচনা ঃ দিন-ইলাহির সমালোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করিয়াছেন। জেসুইটদের সমালোচনা অনুসরণ করিয়া স্মিথ মন্তব্য করিয়াছেন যে, দিন-ইলাহি আকবরের নিবুর্দ্ধিতার একটি বিরাট স্তম্ভস্বরূপ।[১]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিন-ইলাহিকে একটি সর্বভারতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া আকবর হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সকলের গ্রহণীয় একটি জাতীয় ধর্ম সারা দেশে প্রসারলাভ করিলে ভারতের অখন্ডতা এবং জাতীয় সংহতি কখনও বিনষ্ট হইত না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য লোককে প্রাণ হারাইতে হইত না। কিন্তু আকবর কাহারও উপর বলপূর্বক এই ধর্ম চাপাইতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে রাজসভার মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে একমাত্র হিন্দু ছিলেন বীরবল। ভননোর নামক জনৈক জার্মান দেশীয় ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'মানবজাতির হিতসাধনকারী, পরধর্মসহিষ্ণু মহান্ ব্যক্তিদের মধ্যে আকবরের সৃষ্ট এই ধর্মমত চিরদিনই একটি বিশেষ স্থান দখল করিয়া থাকিবে।'

আকবরের রাজসভা ঃ আকবরের রাজদরবারে আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, তানসেন প্রভৃতি যথাক্রমে ঐতিহাসিক, কবি, রাজস্ব সংক্রান্ত পন্ডিত,হাস্যরসিক, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। আকবরের জ্ঞান-পিপাসা ছিল অপরিসীম। তিনি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের রাজসভায় সাদরে আমন্ত্রণ জানাইতেন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য। পারস্যদেশীয় হাকিম হুমায়ুন এবং সুফী বহুভাষাবিদ ভক্তকবি আবদুর রহিম তাঁহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে খ্রীষ্টান পাদ্রী ধর্মযাজক, হিন্দু ও জৈন পন্ডিতগণও তাঁহার রাজসভায় আহূত হইতেন ধর্মীয় আলোচনার জন্য।

স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ঃ আকবরের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার আমলে নির্মিত প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ, স্মৃতিসৌধ, দুর্গ ইত্যাদির পরিকল্পনা ছিল তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার গভীর শিল্পানুরাগ ফতেপুর সিক্রির নির্মাণ-কৌশল ও সৌন্দর্যের মধ্যে চিরকালের মহিমায় ভাস্বর। হিন্দু ও পারসিক রীতির সংমিশ্রণে এই প্রাসাদের স্থাপত্য শৈলীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ্ দরওয়াজা, যোধবাঈ প্রাসাদ, 'সেলিম চিস্তির সমাধি-সৌধ', 'পাঁচমহল' হুমায়ুনের সমাধি তাঁহার শিল্প প্রীতি ও ভাবনার নিদর্শন। স্থাপত্য সমালোচক ফার্গুসনের মতে, "ফতেপুর সিক্রির সৌধগুলি তাঁহার মহৎ শিল্পভাবনার ফলশ্রুতি।" ডঃ স্মিথের মতে "ফতেপুর সিক্রি হইল প্রস্তরে নির্মিত কাব্য।" সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি অপর একটি উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন।

আকবরের স্থাপত্য কীর্তি

১. 'The divine faith (Din-Ilahi) was a movement of Akbar's *folly*.'

(২-গ) জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) ও শাহজাহান (১৬২৭-৫৮ খ্রীঃ)

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম **জাহাঙ্গীর** উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন (১৬০৫ খ্রীঃ)। তিনি ২২ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিংহাসন আরোহণ করিবার পর তিনি প্রথমে বিচার বিভাগীয় সংস্কার করেন। আগ্রার দুর্গ এবং যমুনা তীরে এক প্রস্তর স্তম্ভের মধ্যে 'ন্যায়-শৃঙ্খল' টাঙাইয়া দিয়া তিনি বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিকে ঘণ্টা বাজাইয়া বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইবার নির্দেশ দেন। তিনি বারটি আইন বা 'দস্তুর-উল-আমল' প্রণয়ন করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র উক্ত আইনগুলির পালনের জন্য নির্দেশ দেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রার প্রচলন করেন। তামগা, মীর-বারী নামক কয়েকটি অতিরিক্ত কর রহিত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য অবাধে পণ্যদ্রব্য চলাচলের অনুমতি দান করেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত সুরা প্রস্তুত এবং বিক্রয় বন্ধ করিলেন। নিষ্ঠুর দণ্ডবিধি রহিত করেন।

জাহাঙ্গীরের খামখেয়ালী চরিত্র, অত্যধিক মদ্যপান, শাসনক্ষেত্রে নূরজাহানের অপরিসীম প্রভাব এবং পাঞ্জাবের শিখ গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ড দান বাদশাহী শাসন-নীতিতে দুর্বলতা আনিয়াছিল।

নূরজাহানের প্রভাব ঃ জাহাঙ্গীর বাদশাহের সহিত রূপসী নূরজাহানের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া আছে। নূরজাহানের পূর্বনাম ছিল মেহের-উন্নিসা। তাঁহার পিতার নাম মির্জা গিয়াস বেগ। নূরজাহান শব্দের অর্থ জগতের আলো। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের রূপের আলোয় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পূর্ব-স্বামী বর্দ্ধমানের জায়গিরদার আলিকুলি বা শের আফগানকে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে হত্যা করিয়া মেহেরুন্নিষাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন এবং প্রধানা মহিষী করিয়া নূরজাহান নামকরণ করেন।

নূরজাহান কেবল অপরূপ রূপসী ছিলেন না, অসামান্যা বিদুষী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। রাজ্য শাসনে স্বামীর সহযোগী হইয়া তিনি সাহস, ধৈর্য এবং প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মুঘল দরবারে জাঁকজমক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐতিহাসিক স্মিথ তাঁহাকে 'সিংহাসনের পশ্চাতে শক্তি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণের পরেই তিনি প্রথমে দ্বিতীয় পুত্র পরভেজের নেতৃত্বে এবং পরে সেনাপতি মহাবৎ খাঁর অধীনে তৃতীয় পুত্র খুররমের নেতৃত্বে মেবারের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করিলেন।

রাণার সহিত সন্ধি

মেবারের রাণা অমরসিংহ বাধ্য হইয়া ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে—(১) মুঘল সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে এবং (২) এক হাজার অশ্বারোহী রাজধানীতে প্রেরণ করিতে রাণা স্বীকৃত হইলেন, (৩) রাণার পুত্র

যুবরাজ করণ সিংহ পাঁচ-হাজারী মনসবদার নিযুক্ত হইলেন, (৪) চিতোর রাণাকে প্রত্যর্পণ করা হইল।

আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে মুঘল প্রভুত্ব স্থাপিত হইলেও বাংলার কয়েকজন শক্তিশালী ভৌমিক জমিদার (বার ভূঁইয়া) এবং আফগান সামন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় অপ্রতিহত অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ধর্মগুরু সেলিম চিসতির পুত্র এবং অন্যতম মুঘল সেনাপতি ইসলাম খাঁকে বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের রাজা প্রতাপাদিত্য, মুসা খাঁ, উসমান খাঁ প্রভৃতি ভূঁইয়া জমিদারগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে একে একে মুসা খাঁ, প্রতাপাদিত্য ও উসমান খাঁ পরাজিত হইলেন। বঙ্গদেশে মুঘল প্রভুত্ব পুরাপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

বঙ্গদেশে মুঘল প্রভুত্ব স্থাপন

অতঃপর ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বাহিনী দুর্ভেদ্য কাংড়া বা নগরকোট রাজ্যটি অধিকার করিল। দুর্গের অধিপতি রায় বিক্রমজিৎ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি আহম্মদনগরের স্বাধীন রাজ্যটিকে মুঘল শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। যুবরাজ খুররমের আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে জয় লাভের জন্য জাহাঙ্গীর তাঁহাকে শাহজাহান (দুনিয়ার রাজা) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের সাফল্য বেশীদিন স্থায়ী হইল না। মুঘল বাহিনীর মধ্যে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া আহম্মদনগরের বিচক্ষণ মন্ত্রী মালিক অম্বর সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া মুঘল সম্রাটের সহিত পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুবরাজ খুররম্ পুনরায় সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া মালিক অম্বরকে পরাজিত করিলেন। বিজাপুর, আহম্মদনগর এবং গোলকুণ্ডার দক্ষিণী সুলতানগণ দিল্লীর বাদশাহকে বার্ষিক নজরানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময় শাহজাহান বিদ্রোহী হইয়া মালিক অম্বরের সহিত যোগ দিলে জাহাঙ্গীর পরভেজ এবং মহাবৎ খাঁকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। শাহজাহান বশ্যতা স্বীকার করিলে মালিক অম্বরও যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন। অতঃপর জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আর চেষ্টা করা হয় নাই।

শাহজাহানের বিদ্রোহ এবং মালিক অম্বরের সঙ্গে যোগদান

১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উড়িষ্যা, কামরূপ (পশ্চিম আসাম) প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কান্দাহার অধিকার করেন। জাহাঙ্গীর কান্দাহার পুনরুদ্ধার করার জন্য পুত্র শাহজাহানকে সৈন্যবাহিনীসহ প্রেরণ করিবার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু নূরজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারকে

সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। শাহজাহান পিতার আদেশ অমান্য করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং মালিক অম্বরের সহিত যোগ দিলেন। ফলে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে শাহজাহান দিল্লীর বাদশাহী তখ্‌তে বসেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ জাহাঙ্গীরের 'আত্ম-চরিত' হইতে তাঁহার চরিত্রের নানা দিক সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি নিরপেক্ষ বিচারকরূপে ইতিহাসে সুনামের অধিকারী। বিচারপ্রার্থী লোকেরা সব সময় তাঁহার নিকট বিচার পাইত। রাজ্য বিস্তার নীতিতে (রাজস্থানে এবং দাক্ষিণাত্যে) তিনি পিতার অনুগামী ছিলেন। তিনি গুণের সমাদর করিতেন এবং দয়া-দাক্ষিণ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। নূরজাহানের প্রভাবে অনেক সময় তাঁহার হিতাহিত জ্ঞানের লোপ পাইয়াছিল। অত্যধিক মদ্যপানও তাঁহার অন্যতম দুর্বলতা ছিল। এই কারণে তিনি অকর্মণ্য এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এই বিপরীত গুণান্বিত বাদশাহকে প্রতিভাবান মদ্যপ (talented drunkard) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পোর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজগণ ভারতে আসিয়াছিল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স এবং ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ টমাস্ রো (Sir Thomas Roe) ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূতরূপে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্য করিবার সুবিধার জন্য জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট সুযোগ আদায় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পোর্তুগীজদের বিরোধিতা সত্ত্বেও টমাস রো ইংরেজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরে "বণিকের এই মানদণ্ড ভারতে রাজদণ্ড" রূপে দেখা দিয়াছিল। এই যুগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করিতে শুরু করে। পোর্তুগালের রাজার নিকট হইতে ইংরেজ সরকার বোম্বাই লাভ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহা বাণিজ্যিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করে।

ইউরোপীয় বণিকগণের আগমন —স্যার্ টমাস্ রো

শাহজাহান ঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র শাহজাহান উত্তরাধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত ও নিহত করিয়া (১৬২৮ খ্রীঃ) সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার ত্রিশ বৎসর রাজত্বকাল (১৬২৮-৫৮ খ্রীঃ) নানা কারণে মুঘল যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাল বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। কি সাম্রাজ্য বিস্তারে, কি শিল্প-সংস্কৃতি-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার রাজত্বকালে অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, 'শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির

যুগ ছিল, সিংহাসনে বসিবার পর শাহজাহান বুন্দেলখণ্ডে জুঝর সিংহ ও দাক্ষিণাত্যে খান জাহান-লোদীর বিদ্রোহ দমন করেন। পোর্তুগীজ জলদস্যুরা বাংলাদেশে লুঠতরাজ, নারীহরণ, স্থানীয় লোকদের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল এমনকি সম্রাজ্ঞী মমতাজের দুইজন বাঁদীকে পোর্তুগীজরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। বাদশাহের আদেশে সেনাপতি শেখ আলি হুগলী আক্রমণ করিয়া তাহাদের দমন করেন।

বিদ্রোহ দমন

রাজ্য বিস্তার ঃ পিতা ও পিতামহের নীতি অনুসরণ করিয়া শাহজাহানও মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্যেও তিনি দাক্ষিণাত্য নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান, আর দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিয়া সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করাই ছিল তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতির লক্ষ্য। তিনি প্রথমে আহম্মদনগর দখল করেন।

আহম্মদনগর জয় করিবার পর শাহজাহান গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। শাহজাহান গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের সুলতানগণকে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে চুক্তিবদ্ধ হইতে আদেশ দান করিলেন। গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতান ভীত হইয়া শাহজাহানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কর প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বিজাপুরের সুলতান সহজে মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। শাহজাহান ক্রুদ্ধ হইয়া বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

গোলকুণ্ডার বশ্যতা স্বীকার

শাহজাহান দাক্ষিণাত্যের এক বৃহৎ অংশে মুঘল প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি নব বিজিত এই রাজ্যগুলির শাসনভার তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেবের উপর ন্যস্ত করিলেন। ঔরঙ্গজেব আট বৎসর কাল (১৬৩৬-৪৪ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের হস্তক্ষেপের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। আর্থিক ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করিবার জন্য তিনি নানা প্রকার কৃষি ও রাজস্ব বিষয়ক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

স্থাপত্যরীতি ঃ শাহজাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা ঃ শাহজাহানের রাজত্বকাল ছিল মুঘল স্থাপত্য ও শিল্পকলার চরম উৎকর্ষের যুগ। সম্রাট জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। আকবর এবং

জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত প্রাসাদগুলিতে সাধারণতঃ লাল রঙের প্রস্তর ব্যবহার করা হইত। কিন্তু শাহজাহানের আমলে নির্মিত সৌধগুলিতে প্রায়শই মর্মর প্রস্তর ব্যবহৃত হয়। পূর্বে স্থাপত্যশিল্পে হিন্দু-মুসলমানের রীতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু শাহজাহানের আমলে নির্মিত সৌধগুলিতে ইন্দো-পারসিক রীতির ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি 'তাজমহল' মর্মরপ্রস্তরে গাঁথা একটি স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। দেশী-বিদেশী বহু শিল্পীর সহযোগিতায় ইহা নির্মিত হইয়াছিল। বহু অর্থব্যয়ে এবং বহু বৎসরের পরিশ্রমে তাজমহলের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তেভার্নিয়ের মতে, মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত এই সমাধি মন্দিরটি নির্মাণ করিতে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত।

তাজমহল ছাড়া দিল্লীতে 'মোতিমহল', 'খাসমহল', 'শিশমহল', 'দেওয়ানী-আম', 'দেওয়ানী-খাস' এবং 'জুম্মা-মসজিদ', আগ্রায় 'মোতি-মসজিদ' প্রভৃতি সৌধাবলী তাঁহার অপূর্ব স্থাপত্য পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন বহন করিতেছে। তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে নূতন নগরীর নামকরণ করিয়াছিলেন শাহজাহানাবাদ। তিনি মণি-মুক্তায় খচিত ময়ূর সিংহাসন নামে একটি সোনার সিংহাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন।

শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী নাদির সমরকান্দি শাহজাহানের রাজসভায় ছিলেন। ইতিহাস রচনার প্রতিও শাহজাহান পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। আব্দুল হামিদ নামক ঐতিহাসিক তাঁহার আমলেই 'বাদশাহ-নামা' গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

চিত্রশিল্প ও ইতিহাস রচনা

মুঘল রাজত্বের স্বর্ণযুগ বলিয়া খ্যাতি, জাঁকজমক এবং বিলাস-ব্যসনে মত্ত শাহজাহানের আমলে ঐশ্বর্যের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হইতেছিল সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের, অভাব-অনটনের ক্লেদাক্ত জীবন ধারা। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মত সমাজের উচ্চস্তরে ছিল প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, আর নিম্নস্তরের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন।

ঐশ্বর্যের অন্তরালে দুঃখ-কষ্ট

শাহজাহানের রাজত্বকালে একাধিক ইউরোপীয় পর্যটক ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তাঁহারা মনোজ্ঞ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ে ও তেভার্নিয়ে, ইংরেজ বণিক পিটার ম্যান্ডি, ইতালীয় পর্যটক মানুচি সমকালীন যুগে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বার্নিয়ে বাংলার অর্থ-সম্পদ ও খাদ্যমূল্যের স্বল্পতার কথার সহিত কৃষকদের নিকট হইতে জোরপূর্বক অর্থ সংগ্রহের কথা উল্লেখ

ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ

করিয়াছেন। কিন্তু তেভার্নিয়ে শাহজাহানকে প্রজাকল্যাণকর শাসক বলিয়াছেন। পিটার ম্যান্ডি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের বিবরণ দিয়াছেন।

২-(ঘ) ঔরঙ্গজেব : মুঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ও অবক্ষয় :

শাহজাহানের চারিপুত্র ছিলেন—দারাশিকো, সুজা, ঔরঙ্গজেব এবং মুরাদ। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রগণ সিংহাসনে বসিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। দারা, সুজা ও ঔরঙ্গজেব যথাক্রমে পাঞ্জাব, বাংলাদেশ, দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৃদ্ধ বাদশাহ জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়াছিলেন। চারিত্রিক গুণাবলীর বিচারে দারাই ছিলেন ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্ম সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেইজন্য সুন্নী মুসলমানগণের তিনি চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা দারাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন বিলাসী ও আরামপ্রিয়। দারার মত তিনিও শিয়া মতবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সুন্নী সম্প্রদায় তাঁহাকে পছন্দ করিত না। তাহা ছাড়া, তিনি দিল্লী হইতে দূরে বঙ্গদেশে ছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করারও সুযোগ ছিল।

তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজেব ছিলেন বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন, কূটনৈতিক, বিচক্ষণ এবং সৈন্য পরিচালনায় ও শাসনকার্যে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। চতুর্থ পুত্র মুরাদ ছিলেন অত্যন্ত মদ্যপ। সেইজন্য তাঁহার সমস্ত গুণ লোপ পাইয়াছিল। শাহজাহানের দুই কন্যা—জাহানারা এবং রোশেনারার মধ্যে জাহানারা ছিলেন পিতার প্রিয় পাত্রী এবং ভ্রাতা দারাশিকোর সিংহাসনারোহণের পক্ষে। রোশেনারা ছিলেন তৃতীয় ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের পক্ষে। ঔরঙ্গজেব নিজে গোঁড়া সুন্নী ছিলেন বলিয়া অন্যান্য সুন্নী মুসলমান তাঁহার সমর্থক ছিলেন। দারার দুর্বলতা এবং অন্যান্য ভ্রাতার মদ্যপানে আসক্তি ও বিলাসপ্রিয়তা ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনলাভের সহায়ক হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের দূরদর্শিতা, সামরিক প্রতিভা ও দলগঠনের ক্ষমতা 'ভ্রাতৃবিরোধ' দ্বন্দ্বে তাঁহার সাফল্যের পথ সুগম করিয়াছিল।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব : ঔরঙ্গজেবের সাফল্যের কারণ

শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রই চারি পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হইল। একমাত্র দারাশিকোই তখন আগ্রায় পিতার নিকট উপস্থিত ছিলেন। পিতা কর্তৃক তাঁহাকে সিংহাসনে মনোনয়ন এবং পিতার গুরুতর অসুখের কথা সর্বপ্রকারে তিনি গোপন রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়া সঙ্কট ঘনীভূত করিলেন। অন্যান্য ভ্রাতা মনে করিলেন যে পিতার মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং দারা নির্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য সেই সংবাদ গোপন রাখিতেছেন। তাঁহারা

কালবিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে সুজা এবং মুরাদ নিজেদের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব মুরাদের সহিত এক গোপন সন্ধি স্বাক্ষরিত করিয়া উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ধর্মাটের যুদ্ধে (১৬৫৮ খ্রীঃ) বাদশাহী বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। রাঠোররাজ যশোবন্ত সিংহ এই যুদ্ধে বাদশাহী বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ইতিমধ্যে বারাণসীর নিকটবর্তী বাহাদুরপুর নামক স্থানে শিকোর হস্তে সুজা পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ধর্মাটের যুদ্ধ বিজয়ী ঔরঙ্গজেব এবং মুরাদ সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আগ্রার নিকটে সামুগড় নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। ঔরঙ্গজেব সহজে জয়লাভ করিলেন। দারার পরাজয়ের পর ঔরঙ্গজেব বিজয়গর্বে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। দারা পাঞ্জাবে পলায়ন করিলেন। ঔরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ ও অসুস্থ পিতাকে বন্দী করিলেন। পিতার অনুনয়-বিনয় ঔরঙ্গজেবকে বিচলিত করিতে পারিল না। নীরবে বন্দীদশায় একমাত্র সঙ্গী কন্যা জাহানারার সাহচর্যে বৃদ্ধ সুলতান আট বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করিলেন।

ধর্মাটের যুদ্ধ

ঔরঙ্গজেব সাফল্যের ভ্রাতা মুরাদকে বন্দী করিয়া নির্বিঘ্নে দিল্লীর মসনদে বসিলেন। তিন বৎসর পরে (১৬৬১ খ্রীঃ) মিথ্যা অজুহাতে ঔরঙ্গজেব মুরাদকে হত্যা করিলেন। এইভাবে তাঁহার সমস্ত পথের কাঁটা দূর হইল। পলাতক দারা সপরিবারে ঔরঙ্গজেবের মারণযজ্ঞের বলি হইলেন। ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে গোঁড়া সুন্নী ধর্ম-প্রবর তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

ঔরঙ্গজেবের রাজ্যবিস্তার নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালের প্রথমার্ধ (১৬৫৮-৮১ খ্রীঃ) উত্তর-ভারতে এবং দ্বিতীয়ার্ধ (১৬৮১-১৭০৭ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিজয় ও বিদ্রোহ দমন করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তানের উপজাতিদের সহিত যুদ্ধ, জাঠ, বুন্দেলা, রাজপুত, শিখ জাতির সহিত যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

ঔরঙ্গজেব বাংলাদেশের শাসনকর্তা মীরজুমলাকে (১৬৬১ খ্রীঃ) কুচবিহার রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য প্রথমে পাঠাইলেন। অতঃপর মীরজুমলা অহোমদের পরাজিত করিয়া আসাম দখল করিয়া লইলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মীরজুমলার মৃত্যুর ফলে অহোমরা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিল। ঔরংজেব শায়েস্তা খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরাকান অঞ্চলের মগদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলটি মুঘল অধিকারে আনিয়াছিলেন এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের পরাজিত করিয়া সন্দীপ নামক দ্বীপটি দখল করিয়াছিলেন। ইহার ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্যবিস্তার

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী 'অগ্রসর নীতি' অবলম্বন করিতে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজ্যবিস্তার

বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতীয় দলগুলি সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহ করিত। 'ইউসুফাজাই' 'আফ্রিদি', 'খাটক' প্রভৃতি উপজাতীয় দলগুলি ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে শেষ পর্যন্ত সম্রাট

কুটনীতি যুদ্ধের দ্বারা তাহাদের পরাজিত করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজপুত, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি জাতিগুলির বিদ্রোহ ঘটিবার ফলে সীমান্তের উপজাতীয়েরা আবার বিদ্রোহ করার সুযোগ পাইল। মুঘল সাম্রাজ্য তখন প্রায় আসমুদ্রহিমাচল পরিব্যাপ্ত ছিল।

উত্তর-ভারতে ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহ : **(১) জাঠ, বুন্দেলা ও সৎনামীদের বিদ্রোহ :** ধর্মীয় গোঁড়ামীর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়াছিল সারাদেশে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দক্ষিণে মারাঠাগণ, রাজপুতানায় রাজপুতগণ এবং পাঞ্জাবের শিখগণের মত বৃহৎ শক্তিবর্গ ছাড়াও মথুরায় জাঠ, মালব ও বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলগণ এবং পাতিয়ালা ও আলোয়ার অঞ্চলে সৎনামীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গোক্‌লা নামক একজন নেতার অধীনে মথুরার জাঠগণ বিদ্রোহী হইয়া সেখানকার মুঘল ফৌজদারকে নিহত করিল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজারাম নামক এক নেতার অধীনে জাঠগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মুঘলবাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হইয়াছিল। অতঃপর ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে জাঠগণ পুনরায় চূড়ামন নামক এক নেতার অধীনে সঙ্ঘবন্ধ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল।

জাঠ বিদ্রোহ

প্রধানতঃ ঔরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংস করিবার নীতির বিরুদ্ধে বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলগণ মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বুন্দেলরাজ চম্পত রায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছত্রশাল এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আশা পোষণ করিতেন। ঔরঙ্গজেব এই বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। ছত্রশাল বুন্দেলখণ্ডে তথা পূর্ব মালবে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বুন্দেলাদের বিদ্রোহ

পাতিয়ালা ও আলোয়ার অঞ্চলে বসবাসকারী সৎনামী সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের বিদ্রোহও এই সময়ে ঘটিয়াছিল। সৎনামীরা ব্যবসায় এবং যুদ্ধবিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল। তাহারা কোন রকম অত্যাচার সহ্য করিত না। জনৈক মুঘল সৈন্য কর্তৃক একজন সৎনামী নিহত হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মুঘলবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল।

(২) শিখদের বিদ্রোহ : জাহাঙ্গীরের আমলে বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুকে আশীর্বাদ ও সমর্থন জানানোর অপরাধে বাদশাহ পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শিখ বিদ্বেষের বীজ তখন হইতে বপন করা হইয়াছিল বলা যায়। অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখ

জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। তিনি শাহজাহানের আমলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তেগ বাহাদুর

নবম গুরু তেগ বাহাদুরের আমলে মুঘল-শিখ সম্পর্ক চরম তিক্ততায় এবং বৈরীভাবে পর্যবসিত হয়। ঔরঙ্গজেবের সংকীর্ণ ও অসহিষ্ণু ধর্মনীতি তাহাদিগকে বিদ্রোহের পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া গুরু তেগ বাহাদুর বাদশাহের ধর্মনীতির বিরোধিতা করেন। বাদশাহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া মুঘল দরবারে আনিবার আদেশ দেন। ঔরঙ্গজেব শিখগুরুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার আদেশ দেন; অন্যথায় মৃত্যু তাঁহার অনিবার্য। তেগ বাহাদুর ধর্মান্তর অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় মনে করিয়া শহীদের মৃত্যু বরণ করেন (১৬৭৫ খ্রীঃ)। তাঁহার পুত্র নবম গুরু

গুরু গোবিন্দ সিংহ

গুরুগোবিন্দ সিংহ পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য শিখদিগকে সামরিক বাহিনী হিসাবে সঙ্ঘবন্ধ করিয়া 'খালসা' নামক একটি সংগঠন করিলেন। এই সংগঠনের নিয়মানুসারে শিখদের প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইতে হইত। তাহাদের পঞ্চ

পঞ্চ 'ক' ধারণ

'ক' অর্থাৎ কেশ, কংহ (চিরুনি), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (ছোট পরিধেয়) এবং কর (বা কড়া লোহার বালা) সর্বদা দেহে ধারণ করিতে হইত এবং দরিদ্র ও দুর্গতদের সাহায্য করা, যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার প্রতিজ্ঞা লইতে হইত।

এই অনন্যসাধারণ গুরুর অধীনে শিখজাতি অতিশয় শক্তিশালী হইয়া ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হইল। তিনি শিখজাতিকে ঐক্যবন্ধ হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দের আহ্বানে দেশ সাড়া দিয়াছিল। দুর্ধর্ষ শিখ জাতিকে অনুসরণ করিয়া একে একে রাজপুত এবং মারাঠাগণ ঔরঙ্গজেবকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

(৩) **রাজপুতদের সহিত সংঘর্ষ ঃ** একদা আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে যে রাজপুত জাতি মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিল, যাহাদের সামরিক পরাক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, অদূরদর্শী ঔরঙ্গজেব তাহাদের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবলতম শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন। অবশ্য রাজপুত জাতিরও তখন বাবর বা আকবরের আমলের গৌরব ছিল না। 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' শুরু হইয়াছিল বলা যায়।

ঔরঙ্গজেব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকাকালে মারোয়াড়রাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিতে এবং তাঁহার শিশুপুত্রকে মুঘল অন্তঃপুরে রাখিয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলে রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র ও বিধবা পত্নীকে উদ্ধার করিয়া আনেন এবং রাজপুতদের ঐক্যবদ্ধ হইয়া মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান জানান। নাবালক পুত্রের নাম অজিত সিংহ।

অজিত সিংহ

রাঠোর সর্দারগণ নাবালক অজিত সিংহকে মাড়বারের সিংহাসনে বসাইবার জন্য দাবি

জানান। ঔরঙ্গজেব এক বিরাট সৈন্যবাহিনী মাড়বারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া মাড়বার অধিকার করেন। কিন্তু অদম্য রাঠোর সর্দারগণ মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকিলেন। ইতিমধ্যে মেবারের রাণা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দুর্গাদাসকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কারণ অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবার রাজকন্যা। তাহা ছাড়া, মেবারের রাণা রাজসিংহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মারোয়াড় অধিকৃত হইলে মেবার বাদ পড়িবে না। সেইজন্য কালবিলম্ব না করিয়া রাজসিংহ দুর্গাদাসের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। মুঘল বাহিনী যুবরাজ আকবরের নেতৃত্বে চিতোর ও উদয়পুর দখল করিয়া লয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেব রাজপুতদের মনে আকবর মুঘলচর হিসাবে কাজ করিতেছে এই সন্দেহ উদ্রেক করিলেন। দুর্গাদাস ঔরঙ্গজেবের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন। তিনি আকবরকে ঔরঙ্গজেবের ক্রোধানল হইতে বাঁচাইবার জন্য মারাঠা নেতা শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। মেবারের উপর ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর স্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে মেবারের রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল। মুঘলরাও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সহিত মুঘলদের একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল (১৬৮১ খ্রীঃ)। ঔরঙ্গজেব জয়সিংহের নিকট হইতে কয়েকটি জেলা লাভ করিলেন। তাহার পরিবর্তে মেবারের উপর হইতে জিজিয়া কর তুলিয়া লইলেন। মুঘল সৈন্য মেবার ত্যাগ করিল। জয়সিংহ এই সন্ধির শর্তাবলী মানিয়া লইলেও রাঠোর সর্দার দুর্গাদাস তাহা মানিয়া লইলেন না। তিনি দীর্ঘকাল মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে অজিত সিংহ মাবাড় (মারোয়াড়) অর্থাৎ যোধপুরের রাণা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যায়' ও দুর্গাদাসের মত তারকার ঔজ্জ্বল্য রাজপুত জীবনাকাশকে এক মহিমাময় দ্যুতিতে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। টডের 'রাজস্থান কাহিনীতেও' এই বীরের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে।

দুর্গাদাস

মেবারের রাণা জয়সিংহের যোগদান

মেবারের সহিত সন্ধি (১৬৮১ খ্রীঃ)

রাজপুতদের সহিত যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের ব্যর্থতার ফলে মুঘল রাজশক্তির গৌরব ম্লান হইয়া গেল। মুঘল রাজশক্তি অপরাজেয় নহে, এই ধারণা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। মুঘল রাজকোষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইল। সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।

ফলাফল

দাক্ষিণী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ঃ শিবাজীর সহিত ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষের সূত্রপাত ঃ উত্তর-ভারতের রাজপুতগণের মতই দক্ষিণ-ভারতের মারাঠাগণ ঔরঙ্গজেবের তথা মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবল শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান, একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি সাধুসন্তের ভাব-বিপ্লব, সাহিত্যে জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা ইত্যাদি ঘটনাবলীর ফলে শিবাজীর নেতৃত্বে সেখানে উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং

রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহম্মদনগরের সুলতানী রাজবংশের অধীনে সামরিক বিভাগে নিযুক্ত থাকায় তাহারা শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাইয়াছিল। শিবাজীর পিতা শাহজী মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী হইতে মারাঠাগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজী তাঁহার অসাধারণ সংগঠনী শক্তি ও নেতৃত্ব দ্বারা মারাঠাদের একটি ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ফলে ঔরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা থাকাকালে শিবাজীকে দমন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি দিল্লী চলিয়া আসিলে এবং ভ্রাতৃবিরোধে ব্যাপৃত হইলে শিবাজী সেই সুযোগে দাক্ষিণাত্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। ঔরঙ্গজেব ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি শিবাজীর হস্তে নিহত হন। শায়েস্তা খাঁ প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করিলেও শিবাজীকে দমন করা বিশেষ সহজসাধ্য হয় নাই। তিনি শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ দখল করিয়া পুনায় অবস্থান কালে এক রাত্রিতে শিবাজী অতর্কিতে শায়েস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ করিলে শায়েস্তা খাঁ কোনক্রমে পলাইয়া যান। ঔরঙ্গজেব সেনাপতি দিলীর খাঁ ও অম্বররাজ জয়সিংহকে প্রেরণ করেন। জয়সিংহ শিবাজীকে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন।

১৬৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের সহিত শিবাজীর প্রথম পর্যায়ের সংঘর্ষে প্রমাণিত হইল যে শিবাজীকে দাক্ষিণাত্যে প্রতিরোধ করা মুঘল বাহিনীর পক্ষে সাধ্যাতীত। ঔরঙ্গজেব তাঁহার সহিত পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া (১৬৬৫ খ্রীঃ) প্রথম পর্যায়ের সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণ ক্রমে শিবাজী পুত্র সহ আগ্রায় বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইলে ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই বলিয়া শিবাজী প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিলেন। কৌশলী ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে স-পুত্র বন্দী করিলে সুচতুর শিবাজী চাতুরীর আশ্রয় লইলেন। তিনি অসুস্থতার ভান করিয়া দেব মন্দিরে পূজা দেওয়ার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টান্ন ও ফল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তিনি ও তাঁহার পুত্র দুইটি বৃহৎ ঝুড়ির মধ্যে বসিয়া প্রহরীদের অগোচরে মুঘল কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া রায়গড় দুর্গে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করিলেন (১৬৭৪ খ্রীঃ)।

মাত্র তিন বৎসর চলার পর মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের বিরতি হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্যস্ত। দাক্ষিণাত্যে মুঘল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গন

ধরিয়াছে। এই সুযোগে মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার হৃত রাজ্যের প্রায় সকল স্থান এবং দুর্গ পুনরায় অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর জিঞ্জি, ভেলোর ও মহীশূরের একাংশ তিনি নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। কয়েক বৎসর পরে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। সেই সময় মারাঠা সাম্রাজ্য উত্তরে সুরাটের নিকটবর্তী ধরমপুর হইতে দক্ষিণে কানাড়া জেলা, পূর্বে বাগনালা এবং পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

শিবাজীর শাসন-ব্যবস্থা ঃ ভারতের ইতিহাসে তথা মারাঠা জাতির ইতিহাসে শিবাজীর পরিচয় শুধু বিজেতা হিসাবেই নয়, শাসক হিসাবেও তাঁহার মৌলিকত্ব অনন্যসাধারণ ছিল। তিনি একটি বিশিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার শাসননীতির মূল লক্ষ্য ছিল প্রজাকল্যাণ। এইজন্য তিনি বিভিন্ন সংস্কারও প্রবর্তন করেন। শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শিখরে তিনি স্বয়ং ছিলেন। শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আটজন মন্ত্রী লইয়া অষ্টপ্রধান নামে একটি সভা বা

পরিষদ ছিল। এই আটজন মন্ত্রীর মধ্যে প্রধান মন্ত্রীকে বলা হইত 'পেশওয়া'। রাজস্ব মন্ত্রীকে বলা হইত 'অমাত্য' বা 'মজুমদার', প্রধান বিচারপতি 'ন্যায়াধীশ', রাজপুরোহিত 'পণ্ডিত রাও', পররাষ্ট্র-মন্ত্রী 'দবীর' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজকার্যের বিবরণ যিনি লিপিবদ্ধ করিতেন তাঁহাকে বলা হইত 'ওয়াকিনবীশ' এবং সেনাবাহিনীর প্রধানকে বলা হইত 'সেনাপতি'। রাজার পার্শ্বানুচর (বা বর্তমান কালের প্রাইভেট সেক্রেটারী) 'সুর্নিস' নামে পরিচিত ছিলেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি প্রান্ত কয়েকটি 'তরফ' বা 'পরগনায়' এবং প্রত্যেকটি পরগনা আবার কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রান্তের শাসনভার এক একজন রাজ-প্রতিনিধির উপর এবং গ্রামের শাসনভার গ্রাম-পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত ছিল। কয়েকটি গ্রামের শাসনভার পরিদর্শনের ভার ছিল 'দেশমুখ্য' বা 'দেশপাণ্ডে' নামক জনৈক কর্মচারীর উপর। অবশ্য এই শাসন-ব্যবস্থা শিবাজীর পূর্ববর্তী আমল হইতেই বলবৎ ছিল। শিবাজী শুধু উল্লিখিত কর্মচারিগণের স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াছিলেন।

তিনি প্রজাদের সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের দশভাগের চারিভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিতেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে মারাঠা সৈন্য আক্রমণ চালাইয়া পর্যুদস্ত করিবে না এই প্রতিশ্রুতিতে তাহাদের নিকট হইতে 'চৌথ' বা উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'সরদেশমুখী' বা এক-দশমাংশ উৎপন্ন ফসল হইতে কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন বণিকদের নিকট হইতে 'মহাতরফা' এবং বাজারের ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য প্রত্যেকটি সামগ্রীর উপর 'জাকাৎ' নামক একটি কর আদায় করা হইত।

সামরিক সংগঠন : শিবাজী সামরিক সংগঠনের ব্যাপারে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। দুর্ধর্ষ পার্বত্য মাওলী জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তিনি তাহাদের সাহস ও বীরত্বকে নিজের সামরিক সংগঠনের কাজে লাগাইলেন। রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। পূর্বে মারাঠা বাহিনীতে কোন স্থায়ী সৈন্য ছিল না। শিবাজী এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্থায়ী বেতনভুক্ সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। তিনি 'অশ্বারোহী' এবং 'পদাতিক' দুইভাগে সৈন্যবাহিনীকে ভাগ করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যগণ আবার 'বর্গী' এবং 'শিলাদার' নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্গী নামধারী সৈন্যগণ সরকার হইতে নিয়মিত বেতন ও অস্ত্রশস্ত্র পাইত। শিলাদারগণ শুধু যুদ্ধের সময় সরকার হইতে বেতন পাইত, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের যোগাড় করিয়া লইতে হইত। প্রতি পঁচিশ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর একজন করিয়া হাবিলদার থাকিত। প্রতি পাঁচজন হাবিল-

সৈন্যবাহিনী--অশ্বারোহী এবং পদাতিক

অশ্বারোহীর দুই ভাগ— বর্গী' এবং 'শিলাদার'

দারের উপর একজন করিয়া জুমলাদার থাকিত, প্রতি দশজন জুমলাদারের উপর একজন করিয়া 'হাজারী' থাকিত। তাহার উপরে থাকিত পাঁচ-হাজারী। অশ্বারোহী দলের সর্বাধিনায়ককে বলা হইত 'সরনোবৎ'। পদাতিক বাহিনীতে সর্বনিম্ন পদে ছিল 'পাইক'। তাহাদের উপর 'নায়ক' এবং নায়কদের উপর 'হাবিলদার', 'জুমলাদার' প্রভৃতি অশ্বারোহী বাহিনীর অনুরূপ কর্মচারিগণ। শিবাজী নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির কাজ করিতেন ; কিন্তু তাঁহার অষ্টপ্রধানের মধ্যে একজন ছিল 'সেনাপতি'।

অশ্বারোহী বাহিনীর সংগঠন পদাতিক বাহিনীর অনুরূপ

শিবাজীর সেনাবাহিনীর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। পার্বত্য প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কখনও পার্শ্বদেশ হইতে কখনও পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণের নীতি এই বাহিনী অনুসরণ করিত। ইহা অনেকটা আধুনিক 'গেরিলা' যুদ্ধের অনুরূপ। গ্রীসের স্পার্টা রাষ্ট্রের সৈন্যরা এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এই ধরনের নীতি অনুসরণ করিতেন। শিবাজী সৈন্যবাহিনীতে চরম শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করেন। তাঁহার শিবিরে স্ত্রীলোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কোন স্থান আক্রমণ বা লুণ্ঠনের সময় কোন স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ বা শিশুর উপর অথবা কোন ধর্মস্থানের উপর কোনরূপ অত্যাচার এবং আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ কৌশল এবং দক্ষতা

শিবাজীর সামরিক সংগঠনে দুর্গ ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তাঁহার মৃত্যুর সময় মারাঠাদের ২৪০টি দুর্গ ছিল। তিনি একটি নৌ-বাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর সৈন্যবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক কাঁফি খাঁর মত শিবাজী-বিদ্বেষীও তাঁহার সৈন্যবাহিনীর প্রশংসা করিয়াছেন। স্যার যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, মারাঠা হইল 'যুদ্ধরাষ্ট্র' অর্থাৎ যুদ্ধই ছিল রাষ্ট্রীয় নীতি।

শিবাজীর কৃতিত্ব ঃ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শিবাজী বহুধা বিভক্ত এবং বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ শিবাজীর অবদানকে অধিকাংশ অস্বীকার করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শিবাজী উৎসব" শীর্ষক কবিতায় বলিয়াছেন "বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস—।" তাঁহার ধর্মান্ধতা ছিল না বলা চলে। হিন্দুস্থানে হিন্দু রাজ্য স্থাপন তাঁহার গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে। তিনি মারাঠা জাতিকে নব প্রেরণায় আত্মবিশ্বাস এবং শক্তিতে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষ ঃ ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের দাক্ষিণাত্য নীতির প্রতিফলন মাত্র। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থাকাকালীন ঔরঙ্গজেবের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুইটিকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করার যে ইচ্ছা ছিল বাদশাহ হইয়া সেই ইচ্ছাকে কার্যকরী করার চেষ্টা

করিলেন। প্রথমেই তিনি বিজাপুর রাজ্যটি অধিকার করিলেন (১৬৮৬ খ্রীঃ)। অতঃপর তিনি গোলকুন্ডা অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। বিজাপুরের মত গোলকুন্ডা ছিল শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই দুইটি রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব মুঘল সাম্রাজ্যের নিকট বিপজ্জনক ছিল। সেইজন্য ছলে-বলে-কৌশলে ঔরঙ্গজেব গোলকুন্ডা অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপলীর হিন্দু রাজ্য দুইটিও অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে মুঘল সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, যাহা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। স্মিথ, এলফিনস্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডার বিলোপসাধন করিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অপরপক্ষে, স্যার যদুনাথ সরকারের মতে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য বিজয়ে পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। একথা অনস্বীকার্য যে ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ করার ফলে মুঘল রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঔরঙ্গজেব দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে থাকার ফলে উত্তর-ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, '**The Deccan was the grave of his body as well as of his empire.**' স্যার যদুনাথ সরকারের মতে '**The Deccan ulcer ruined Aurangzeb, as the Spainish ulcer ruined Nepoleon.**'

ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি ও উহার ফলাফল : ঔরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া, ধর্মান্ধ, সুন্নী মুসলমান। আকবরের আমল হইতে ইসলামের পবিত্রতা বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া বিকৃত হইয়াছে এই সন্দেহ তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি 'বিধর্মীদের দেশ' ভারতবর্ষকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ইসলামীয় অনুশাসন তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ধর্মের ক্ষেত্রে ত কথাই ছিল না। ইসলামীয় রীতি-নীতি তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। তিনি পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুদের প্রতি ছিল তাঁহার গভীর অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ। ধর্মযুদ্ধে বিধর্মী (কাফের) হিন্দুদের নিধন করা ঐশ্লামিক পবিত্র কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি নিজেকে 'গান্ধী' বা ধর্মযোদ্ধা বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। সিংহাসনারোহণের পরেই তিনি মক্কার সরিফ, পারস্য, বালখ, বুখারা আবিসিনিয়া, বসরা প্রভৃতি মুসলমান শাসকের সহিত যোগাযোগ করেন। অতঃপর মুঘল দরবারে প্রচলিত বহু রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের উচ্ছেদ করিয়া তিনি মুঘল শাসন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে কোরান এবং মহম্মদের অনুশাসনের উপর নির্ভরশীল করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের 'দশহারা' অনুষ্ঠানে সম্রাটের

যোগদানের প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, 'নওরোজ' নামক অনুষ্ঠানটিও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজদরবারে নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি সর্ব প্রকারে জেহাদ ঘোষণা করা হইল। মহরম নিষিদ্ধ করা হইল।

অ-মুসলমান, বিশেষ করিয়া হিন্দুদের প্রতি তিনি অনুদার ও অত্যাচারমূলক পীড়ন নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলপূর্বক নিজ ধর্মকে প্রজাদের উপর চাপাইতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দুরা এই বিষয়ে বাধা দান করিলে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া পীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করা হইয়াছিল। হিন্দু ব্যবসায়ীদের উপর মুসলমান ব্যবসায়ীদের দেয় দ্বিগুণ পরিমাণ বাণিজ্য-শুল্ক ধার্য করিলেন। হিন্দুর দেবমন্দির, বিদ্যালয় প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এবং সেইসব জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করাইয়া তিনি সংকীর্ণ ও অসহিষ্ণু ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের সামাজিক মর্যাদাও হ্রাস করা হইয়াছিল। বলপূর্বক বহু হিন্দু-পরিবারকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তকরণ তাঁহার ধর্মান্ধতার আর একটি প্রমাণ।

হিন্দু-বিদ্বেষ

বিভিন্ন জাতিধর্ম-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করিতে গিয়া তিনি মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন। সারাদেশে এই ধর্মান্ধ ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু নীতি হিন্দুবিদ্বেষের মূল কারণ হইয়াছিল। জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, শিখ, মারাঠা, রাজপুত প্রভৃতি হিন্দু জাতিগুলি এই গোঁড়া সুন্নী সুলতানের হিন্দু-বিদ্বেষপূর্ণ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের বিদ্রোহই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ঐতিহাসিক লেন পুলের মতে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার গোঁড়া ধর্মীয় নীতির কুফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, কিন্তু সুদৃঢ় ধর্ম বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি তাঁহার অনুসৃত পথ পরিবর্তন করেন নাই। আকবর ধর্মীয় উদারতা এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতা দেখাইয়া হিন্দুস্থানে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের ও স্থায়িত্বের জন্য হিন্দুদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিয়া যে রাষ্ট্রশাসন নীতির প্রচলন করিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজেব তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।

ধর্মনীতির ফলাফল

হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে নানাগুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি ছিলেন একাধারে সাহসী, বুদ্ধিমান, কূটকৌশলী, পরিশ্রমী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ন্যায়-অন্যায় নীতির তিনি ধার ধারিতেন না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করিতেন না। অপর দিকে তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সংযমী এবং ধর্মভীরু ছিলেন। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া তিনি শুধু

চরিত্র ও শাসকরূপে মূল্যায়ন

হিন্দুদের দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া এবং জিজিয়া কর স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের উপরেও নির্যাতন করিয়াছিলেন। বিলাসব্যসন, মদ্যপান, উৎসব আনন্দ প্রভৃতি মুঘল সম্রাটদের সবরকম জাঁকজমক তিনি বর্জন করিয়াছিলেন। যে শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য পূর্ববর্তী মুঘল বাদশাহগণ গুণীজনের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার সময়ে বিকাশ লাভ করে নাই। একমাত্র মুসলমান সুন্নী ছাড়া আর কাহারও শ্রদ্ধা তিনি অর্জন করিতে পারেন নাই। তাহারা তাঁহাকে 'জিন্দাপীর' অর্থাৎ 'জীবন্ত পীর' বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা এবং চির-সন্দিগ্ধ। পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি হিন্দুদের তথা মুঘল বাদশাহগণের স্তম্ভস্বরূপ রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা হারাইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার সাম্রাজ্যের পতনের পথ সুগম হইয়াছিল। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে ইহা খুবই বিপজ্জনক ছিল। একার পক্ষে বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন অসম্ভব জানিয়াও তিনি নিজ হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলে আমীর-ওমরাহগণ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার প্রতি সন্দেহ, অসন্তোষ এবং অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে কেহই সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব বহন করিবার মত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই।

(ঙ) **ইউরোপীয় বণিকগণের কার্যকলাপ :** অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্য যুগের শেষে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিল। জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইল, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রপথ ধরিয়া প্রাচ্যের দেশগুলির শোষণকার্যেরও পথ সুগম হইল।

পোর্তুগীজ বণিকদের আগমন : ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া জলপথে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ইহার দুই বৎসর পর পেড্রো আল্‌ভারেজ কাব্রাল নামে জনৈক পোর্তুগীজ নাবিক বারশত পোর্তুগীজ, তেরখানি জাহাজ ও প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য লইয়া কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে আরব বণিকগণকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। আল্‌ভারেজ জামোরিনের শত্রু কোচিনের রাজার সহিত যোগদান করিয়া ভারতীয় বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভাস্কো-ডা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কোচিন ও ক্যানানোরে পোর্তুগীজ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে তাঁহারা যখন কোন প্রকারে গায়ের জোরে এদেশে টিঁকিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সেই সময় আল্-ফোন্সো আল্‌বুকার্ক এদেশে পোর্তুগীজ গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন এবং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর সুলতানের নিকট হইতে গোয়া বন্দরটি লাভ করিয়া তাহার নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেন। তিনি গোয়াকেই পোর্তুগীজ শক্তির ও বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। অতঃপর পোর্তুগীজরা যথাক্রমে গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, ব্যাসিন, বোম্বাই, চৌহল সান্-টোম হুগলী প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইল। পোর্তুগীজ শাসকদের অদূরদর্শিতা বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ ও বাণিজ্যের নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভৃতি দুর্নীতির ফলে ভারতে পোর্তুগীজ প্রাধান্য বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারত সরকার গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি পোর্তুগীজ অধিকৃত কয়েকটি অঞ্চলকে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ভারতে পোর্তুগীজ অধিকারের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

গোয়া, দমন ও দিউতে পোর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠিস্থান

পোর্তুগীজদের অদূরদর্শিতা

ওলন্দাজ বণিকগণ: ওলন্দাজ বণিকগণ পোর্তুগীজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াই পোর্তুগীজদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। ফলে শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। ভারতের গুজরাট, করমন্ডল উপকূল, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি তাহারা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলেই তাহারা নিজেদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক কেন্দ্র গড়িয়া তুলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের সহিত তাহারা প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে পারে নাই।

ফরাসী বণিকগণ: ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফরাসী বণিকগণ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করে কিন্তু তাহাদের প্রাথমিক চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে অর্থমন্ত্রী কোলবার্ট ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং ভারতের সহিত বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার চেষ্টা করেন। সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে মসুলিপত্তম, পন্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্য কুঠি গড়িয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তীব্র বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

বাণিজ্য কুঠি স্থাপন ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূচনা

ইংরেজ বণিকগণ ঃ পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতির সহিত ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ও ভারতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় ছিল না। মুঘল আমলে র‍্যালফ ফীচ্ (১৫৯১ খ্রীঃ), হকিন্স (১৬০৮ খ্রীঃ), স্যার্ টমার্ রো (১৬১৫ খ্রীঃ) প্রভৃতি ইংরেজ দূতগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার প্রস্তাব লইয়া মুঘল দরবারে আসিয়াছিলেন। প্রাচ্যের ধন-সম্পদের লোভে, বাণিজ্যের অন্তরালে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকের মত ইংরেজ বণিকগণও ভারতবর্ষে আসিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে প্রাচ্যে বাণিজ্য করিবার জন্য East India Company নামে বাণিজ্য সংস্থাকে ব্রিটিশ সরকার সনন্দ দান করে। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে হকিন্সের দৌত্যের ফলে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ বণিকগণকে সুরাটে একটি কুঠি নির্মাণ করিবার অনুমতি দান করেন। ইংরেজগণ পোর্তুগীজদের সহিত দ্বন্দ্বে উপনীত হয়। ইহাতে ইংরেজদের নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল। অতঃপর স্যার্ টমাস্ রোর দৌত্যের ফলে ইংরেজ বণিকগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি পাইল। সুরাট ছাড়া আগ্রা, আহ্মেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হইল। ইংরেজগণ মসুলিপত্তম এবং অন্যান্য জায়গায়ও অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ পাইল। চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মাদ্রাজে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি তাহারা লাভ করিল। বোম্বাই শহরটি ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বিবাহ সূত্রে পোর্তুগালের রাজার নিকট হইতে পাইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তাহা বিক্রয় করিলেন। ফলে বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বণিকদের কুঠি স্থাপিত হইল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘলদের সহিত ইংরেজ বণিকগণের সংঘর্ষ হয়। ইংরেজ বণিকগণ ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা প্রার্থনা করে।

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন

বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন

ঔরঙ্গজেবের সহিত সংঘর্ষ

বাংলাদেশে শায়েস্তা খাঁর আমল হইতে ইংরেজ বণিকগণ অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় রাজকর্মচারিগণ এই অধিকার অস্বীকার করিয়া ইংরেজদের উপর বাণিজ্য-শুল্ক স্থাপন করিল। ভীত-সন্ত্রস্ত ইংরেজ বণিকগণ নিরাপত্তার জন্য তাহাদের বাণিজ্য কুঠিগুলিকে দুর্গে পরিণত করিতে লাগিল। জব চার্ণক নামক জনৈক দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ইংরেজ বণিক হুগলী হইতে কলিকাতার সুতানুটি গ্রামে (বর্তমানে কলিকাতার শোভাবাজার এলাকায়) বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে এই কুঠিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য তৎকালীন ইংলণ্ডের শাসক উইলিয়াম ও মেরীর নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি দুর্গ নির্মিত হইল। জব চার্ণকের মৃত্যুর পরে ইংরেজগণ কলিকাতা

বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকদের কুঠি স্থাপন

কলিকাতার পত্তন

(কালীঘাটা) সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করিল। এই তিনটি গ্রামের সমন্বয়ে কলিকাতা বাণিজ্য কেন্দ্রের সৃষ্টি হইল। নব গঠিত ব্রিটিশ কোম্পানীর কাউন্সিলের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল ফোর্ট উইলিয়াম। এইভাবে ধীরে ধীরে কলিকাতার প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন্ সার্ম্যান নামে জনৈক ইংরেজ দূত বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী ফারুকশিয়ারের রাজদরবারে প্রেরীত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে (১৭১৭ খ্রীঃ) তিনি মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে ফরমান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা ইংরেজ বণিকগণ বঙ্গদেশে, বোম্বাইতে এবং মাদ্রাজে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ পাইয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-সন্ধিক্ষণে ইংরেজগণ ভারতে বাণিজ্যের অন্তরালে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করিবার সুযোগ পাইল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ডরূপে"।

বাণিজ্যের অন্তরালে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন

তৃতীয় অধ্যায়
মুঘল যুগে ভারত

(রাজনৈতিক ঐক্যকরণ—কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস—মুঘল শাসকবর্গ ও জায়গিরদারগণ—ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা, বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে ভারতীয় শাসক-বর্গ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সাংস্কৃতিক জীবন ধারা, স্থাপত্য শিল্পকলা, চিত্রশিল্প, ঐতিহাসিক রচনা, সঙ্গীত, কয়েকটি আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য)

রাজনৈতিক ঐক্যকরণের প্রয়াস : মুঘল সাম্রাজ্য আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত হওয়ায় রাজনৈতিক ঐক্যকরণের প্রয়াস কার্যকরী হইয়াছিল। আকবরের ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান মর্যাদা ও অধিকার দান এবং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-সংস্কার ও হিন্দুদের প্রতি উদারতা, তীর্থকর, জিজিয়া কর, সতীদাহ, পণ-প্রথা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করার প্রয়াস ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সৃষ্টি করে। তাঁহার সর্বধর্ম সমন্বয়মূলক একেশ্বরবাদী ধর্মমত—**দিন-ইলাহি** ভারতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উল্লেখযোগ্য প্রয়াসরূপে চিহ্নিত রহিয়াছে। তিনি ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের মতই 'অভ্রান্ত আদেশ জারী' নামক বাদশাহের ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রাধান্যের আইন (Act of Supremacy) জারী করিয়া এবং সমন্বয়মূলক জাতীয় চার্চ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক জাতি, এক ধর্ম, এক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুফী সাধুসন্ত এবং নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ভক্তিমার্গী ও উদারনৈতিক সংস্কারকগণ জাতীয় ঐক গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন জাত-পাত-অস্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ দূরীভূত করিয়া। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো হিন্দু-মুসল-মানদের মধ্যে সমন্বয়ের অন্যতম সাধক ছিলেন। আকবর প্রবর্তিত রাজ্যশাসন ব্যবস্থাই মুঘল শাসন-ব্যবস্থার মূল কাঠামো ছিল। আকবর প্রজাবৎসল কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা—সুবাদারগণ, জায়গিরদার ও মনসবদারগণ সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হইতেন। ফলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাজস্ব নীতি : আকবর রাজা টোডরমলের সাহায্যে রাজস্ব নীতির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। টোডরমলের রাজস্ব নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল : (১) আবাদী জমির নির্ভুল জরিপ করা, (২) প্রতি বিঘা জমির উৎপন্ন শস্যের গড় নির্ণয় করা এবং (৩) সেই অনুপাতে প্রতি বিঘা জমির রাজস্বের হার নির্ধারণ করা।

সাধারণতঃ তিন প্রকারের রাজস্ব নীতি অনুসারে রাজস্ব আদায় হইত। (১) গাল্লাবক্স বা শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা ; (২) জাবৎ বা

শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকা রাজস্ব হিসাবে ধার্য করা এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী 'পোলজ' (সম্বৎসর চাষের জমি), পরৌটি (বৎসরের কিছু সময়ে চাষের জমি), 'চাচর' (যে জমি তিন বৎসরের জন্য পতিত থাকিত) এবং বনজর (যে জমি পাঁচ বৎসরের জন্য পতিত থাকিত) তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হইত। এই ব্যবস্থা গুজরাট, বিহার, মালব ও রাজপুতানায় প্রচলিত ছিল। (৩) নসক প্রথানুসারে জমি জরিপ করিয়া উৎপাদন শক্তি অনুযায়ী কর ধার্য করার পরিবর্তে একটা মোটামুটি অনুমানের উপর রাজস্ব নির্ধারিত হইত। এই প্রথা অনেকটা জমিদারি প্রথার অনুরূপ। ইহা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল।

রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজধানীতে প্রধান দেওয়ান এবং প্রত্যেক সুবায় বা প্রদেশে একজন প্রাদেশিক দেওয়ান নিযুক্ত করা হইত। প্রত্যেক সরকারে একজন আমিন এবং প্রত্যেক পরগনায় কানুনগো ও মুকাদ্দম রাজস্ব আদায় এবং রাজকোষে তাহা প্রেরণ করিতেন। দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিলে রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকিত। পরবর্তী কালে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব বিষয়ে নানা সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ টোডরমলের নীতি অনুকরণ করিয়াছিলেন। বাংলা-দেশের শাসনকর্তা হইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব নীতি সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

সামরিক ক্ষেত্রে সম্রাট স্বয়ং ছিলেন সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক। তাঁহার অধীনে একাধিক সমর অধিনায়ক এবং বিভাগীয় অধিনায়ক ছিলেন।

মুঘল শাসকবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্রাটকে সাহায্যকারী কেন্দ্রীয় কর্মচারিগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ। কেন্দ্রে সম্রাটের পরেই ভকিল বা ওয়াজীরের স্থান। তিনি ছিলেন বর্তমান কালের প্রধান মন্ত্রীর মত। দেওয়ান বা রাজস্ব বিভাগীয় প্রধান অর্থদপ্তর তথা আয়-ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন। মীরবকসী ছিলেন সামরিক বিভাগের কর্মচারী। সদর-উস-সদর ছিলেন ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান। ইহা ছাড়া, আরও বহুসংখ্যক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় বাদশাহকে সাহায্য করিতেন।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের অনুরূপ পদাধিকারিক কর্মচারী ছিলেন—যথা সুবাদার, প্রাদেশিক দেওয়ান, সদর-উস-সদর, কাজী, আমিন, ফৌজদার প্রভৃতি। সুবাদার সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে প্রদেশ শাসন করিতেন। দেওয়ান রাজস্ব ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ক্ষমতাবিভাজন করিয়া সংযত রাখার ব্যবস্থা ছিল।

আকবর জায়গির ব্যবস্থার পরিবর্তে মনসবদারী ব্যবস্থা তথা পদমর্যাদা জ্ঞাপক শ্রেণীবিন্যাস করিয়া রাজকর্মচারীদের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং নগদ অর্থে মাহিনা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুঘল আমলাতন্ত্র 'মনসবদার-ই নগদি'র স্থলে 'মনসবদার-ই তনায়া জায়গির' এবং 'ওয়াতন জায়গির'

প্রচলন করেন। পরবর্তী কালে পুরাপুরিভাবে জমিজায়গা ভোগী জায়গিরদার আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠে। জায়গিরদারগণ বংশানুক্রমিক জমি ভোগ করায় তাঁহারা সামন্ত প্রভু (Feudal lord) হইয়া উঠেন।

সামাজিক জীবন ঃ মুঘল যুগের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র সমকালীন ঐতিহাসিকদের বিবরণ এবং পর্যটকদের বর্ণনা হইতে জানা যায়।

ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ

মুঘল আমলে বহু ইউরোপীয় ভারতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন দুঃসাহসী, যেমন মানুচি (Manuchi) ছিলেন বণিক, যেমন তেভার্ণিয়ে, ছিলেন চিকিৎসক, যেমন বার্ণিয়ে, আবার কেহ ছিলেন ধর্মপ্রচারক, যেমন মনসেরেট, আবার কেহ বা ছিলেন রাষ্ট্রদূত, যেমন হকিন্স ও স্যার টমাস্ রো ইত্যাদি। ইঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে সে যুগের ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এতদ্ভিন্ন সমকালীন পারসিক গ্রন্থাদি হইতে কিছু কিছু তথ্যাদি পাওয়া যায়। র‍্যালফ্ ফিচ আসেন আকবরের রাজসভায় এবং স্যার টমাস্ রো আসেন ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের রাজত্বকালে জাহাঙ্গীরের সভায়, বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের আবেদন লইয়া বার্ণিয়ে ও তেভার্ণিয়ে নামে দুইজন ফরাসী পর্যটক শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে ভারতে আসেন। বার্ণিয়ের বর্ণনায় বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কথা জানা যায়। তেভার্ণিয়ের বর্ণনায় সে যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

সমাজ-জীবন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

তৎকালীন সমাজে জনজীবন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সম্রাট ও পরিবারবর্গ এবং অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাঁহারা ছিলেন পৃথিবীর সকল সুখ, সম্ভোগ ঐশ্বর্য ও বিলাস-ব্যসনের অধিকারী। ওলন্দাজ পর্যটক ফ্রান্সিস্কো পেলসার্ট অভিজাত শ্রেণীর বিলাস-ব্যসন ও লাম্পট্যের নিন্দা করিয়াছেন। আমোদ-প্রমোদ ও ব্যভিচারে তাঁহারা প্রচুর ব্যয় করিতেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলমান পরিবারের মত হিন্দু অভিজাত পরিবারেও পর্দা প্রথা এবং কিছু সামাজিক রীতি-নীতির প্রচলন হইয়াছিল। মুসলমানদের মত হিন্দু অভিজাত বিত্তবান পুরুষেরা বহু বিবাহ করিতেন। মুসলমান নারীদের মধ্যে নুরজাহান, মমতাজ বেগম, চাঁদবিবি, জাহানারা প্রমুখ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বেশভূষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল উহাদের প্রধান উপজীবিকা। সাধারণতঃ তাহারা সামাজিক রীতি-নীতি মানিয়া চলিত। তবে একেবারে দোষমুক্ত ছিল না। তাহাদের উপর সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত করভার চাপানোর জন্য তাহারা অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইত। কৃষক, শ্রমিক ও মজুর সম্প্রদায়ের লোক ছিল সর্বনিম্ন শ্রেণীভুক্ত। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে খাওয়াপরার অভাব না থাকিলেও কোন

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি বিপর্যয়ের কবলে পড়িয়া তাহারা কষ্ট পাইত সর্বাধিক। শ্রমিক ও ভৃত্য শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবন ক্রীতদাসের জীবন অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত ছিল না। দেশে ভিখারীর সংখ্যাও ছিল অগণ্য।

মুঘল আমলে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের মধ্যে এক গভীর সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠে। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার রীতি বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। মুঘল যুগেও তাহা অব্যাহত থাকে, মুঘল সম্রাট আকবর তাঁহার হিন্দু স্ত্রীদের নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী পূজা অর্চনা ও ধর্মচর্চার স্বাধীনতা দান করেন। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর-পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের ধর্মীয় আচরণে যোগদান করিতেন। ইউরোপীয় পর্যটকের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে পণপ্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীনদের বহু বিবাহপ্রথা ইত্যাদি বহু কুসংস্কার ছিল। সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

ব্যক্তিগতভাবে মুঘল সম্রাটগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাদের শিক্ষা ব্যাপারে তেমন মনোযোগী ছিলেন না। সে সময় রাষ্ট্র-পরিচালিত কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল না। তবে সম্রাট ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত দানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসা, মসজিদ ও হিন্দু শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে অনেকে ভূমিদান ও অর্থদান করেন। বাবরের আমলে স্থাপিত সুরহাতে-আম, হুমায়ুনের স্থাপিত দিল্লীতে একটি উচ্চ শিক্ষায়তন, আকবর কর্তৃক আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি ও অন্যান্য স্থানের বিদ্যালয়, হিন্দুর ছাত্রদের নিমিত্ত শিক্ষালয় স্থাপন এবং শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত সুবৃহৎ গ্রন্থাগার নির্মাণ এই সকলই মুঘল আমলে শিক্ষা বিস্তারের উপায়রূপে গৃহীত হয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ভারত ছিল প্রধানতঃ কৃষি নির্ভরশীল দেশ। খাদ্যশস্য ছাড়াও কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতি অর্থনৈতিক ফসলের চাষ হইত। কৃষি ব্যবস্থা বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

দেশের বেশ কিছু সংখ্যক লোক শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প যথা সূতীবস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রঙিন কাপড় ও পোশাকী কাপড় প্রস্তুত হইত। বিদেশীদের বর্ণনায় ভারতে প্রস্তুত সূতীবস্ত্র বিশেষতঃ ঢাকার মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। সরকার-পরিচালিত কতকগুলি কারখানায় সম্রাট ও অভিজাত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপন্ন হইত। বারাণসী, গুজরাট, বঙ্গদেশ প্রভৃতি অঞ্চল বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। লাহোর ও কাশ্মীরে উৎকৃষ্ট শাল ও গালিচা প্রস্তুত হইত।

শিল্পোৎপাদন

নীল, অহিফেন (আফিং), সুতীবস্ত্র, মসলিন, চিনি প্রভৃতি প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল। আমদানিকৃত দ্রব্যসমূহের মধ্যে চীনামাটির বাসন, রৌপ্য, অশ্ব, মূল্যবান মণিমুক্তা এবং কাঁচা মাল হিসাবে কাঁচা রেশমের নামই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সুরাট, বোম্বাই, কালিকট, কোচিন, চট্টগ্রাম, বালেশ্বর, মসুলীপত্তম ছিল বহির্বাণিজ্যের বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য জলপথে নদীবাহিত এবং স্থলপথে যথা গ্রাণ্ট ট্রাঙ্ক রোড (বাদশাহী সড়ক) দ্বারা চালিত। ভারতীয় বণিকেরা কম দক্ষ (বা সুচতুর) দালাল ছিল না। তাহাদের অনেকেরই একচেটিয়া কারবার ছিল। উচ্চপদস্থ আমলাগণ যথা মীরজুমলা ও শায়েস্তা খাঁর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজপরিবারের অনেকে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।

ভারতীয় ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইউরোপীয় পর্যটক সকলেই একমত ছিলেন। বাবর জীবনস্মৃতিতে যে কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন হকিন্সের বর্ণনাতে তাহার সমর্থন মিলে। তিনি বলেন—ভারত স্বর্ণে ও রৌপ্যে সমৃদ্ধ এবং বিদেশীদের কর্তৃক আনিত মুদ্রা ভারতে জমা থাকিত। স্যার টমাস্ রোর মতে "Europe bleedeth to enrich Asia"। তেভার্নিয়ে মুঘল রাজদরবারের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। হকিন্স মুঘল রাজদরবারের ব্যয়বহুল উৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে সমসাময়িক তুরস্ক বা পারস্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা মুঘল সাম্রাজ্যের আয় বহুগুণে বেশী ছিল। শুধু রাজস্ব হইতেই সম্রাটের পঞ্চাশ কোটি টাকা আয় হইত। তেভার্ণিয়ের মতে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও রাজদরবারে ঐশ্বর্য আড়ম্বর ছিল তুলনাহীন। মানুচির মতে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তি।

ইউরোপীয়দের অভিমত

কিন্তু দেশের এই বিপুল ধন-সম্পদ মুষ্টিমেয় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরার কোন অভাব না থাকিলেও তাহারা নিতান্ত অভাবের মধ্যেই দিনাতিপাত করিত।

অথচ বণিক সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন ছিল সীমাহীন। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য ইউরোপীয় পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রমিক বা শিল্পীদের নিকট হইতে জোর করিয়া কম মূল্যে জিনিস ক্রয় করা হইত। অল্পবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকিত না। শাহ্‌জাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল।

স্থাপত্য ঃ মুঘল সম্রাটগণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। স্থাপত্য-বিশারদ পণ্ডিত ফার্গুসনের মতে মুঘল স্থাপত্যে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু হ্যাভেলের মতে ভারতীয় শিল্পী ও স্থপতিদের প্রভাব বেশী ছিল। তবে এই যুগের শিল্প-রীতিতে যে পারসিক ও ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বাবর, হুমায়ুন ভারতীয় রীতির সহিত পারসিক রীতির মিশ্রণ ঘটাইয়া ফতেবাদের মসজিদ ও দিল্লীর দিন-পনেহ নির্মাণ

করাইয়াছিলেন। শের শাহের সাসারামের সমাধিতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামীয় রীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আকবরের নির্মিত স্থাপত্যের মধ্যে তাঁহার উদার মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। ফতেপুর সিক্রির রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, বুলন্দ দরওয়াজা তাঁহার স্থাপত্য রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জাহাঙ্গীর স্থাপত্যপ্রীতির বিশেষ পরিচয় দেন নাই সত্য, কিন্তু নূরজাহানের পিতার স্মৃতিসৌধ ইতিমাদ-উদ্-দৌলার সমাধিটি স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জাহাঙ্গীর স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন বেশী। মুঘল সম্রাট শাহ্‌জাহান ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার সময়ে নির্মিত দুর্গ, অট্টালিকা, সমাধি মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতিতে আলঙ্কারিক কারুকার্য ও চিত্রাঙ্কনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নির্মিত সৌধগুলি আজও টিকিয়া আছে। দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম্, দেওয়ান-ই-খাস্, জুম্মা মসজিদ, মোতি মসজিদ এবং তাজমহলের স্থাপত্য ও অলঙ্করণ কীর্তি জগদ্বিখ্যাত। মর্মর প্রস্তরে নির্মিত তাজমহল শাহজাহানের শিল্পকৃতির অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত। প্রেমিক সম্রাটের পত্নী প্রেমের অমর স্বাক্ষর। ইহা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সম্রাট বহু দেশী ও বিদেশী স্থপতির দ্বারা প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ইহার পরিকল্পনা এবং নির্মাণ কার্য করিয়াছিলেন। শাহজাহানের আমলে নির্মিত ময়ূর সিংহাসন তাঁহার শিল্প কীর্তির আর একটি দৃষ্টান্ত। নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনকালে এই বহুমূল্য সিংহাসনটি পারস্যে লইয়া যান। ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামীর ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়াছিল। তিনি অন্যান্য শিল্পের মত স্থাপত্য শিল্পের অনুশীলন নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

দেওয়ান-ই-খাস্, দেওয়ান-ই-আম্, মোতি-মসজিদ এবং তাজমহল

ময়ূর সিংহাসন

চিত্রশিল্পেরও এই যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বিদেশী বহু শিল্পরীতির (যথা—ইরাণী, তুরাণী, গ্রীক, চীনা, বৌদ্ধ) সহিত ভারতীয় শিল্পরীতির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হইয়াছিল। আকবরের দরবারে যে সমস্ত চিত্রশিল্পী ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। জাহাঙ্গীরের আমলেও চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শাহজাহানের আমলে চিত্রশিল্পের পরিবর্তে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতিতে বেশী উৎসাহ দেখা যায়। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার ফলে চিত্রশিল্পের অবনতি ঘটে। মানুচির বর্ণনায় জানা যায় ঔরঙ্গজেব অনেক চিত্রশিল্প নষ্ট করিয়াছিলেন।

চিত্রশিল্প

মুঘল যুগে রাজপুতদিগের মধ্যে এক আলাদা ধরনের চিত্র শিল্পরীতি পরিলক্ষিত হয়। তাহা কাংড়া রীতি নামে পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর ও সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ের উপর নানা রকম চিত্র তাঁহারা অঙ্কিত করিতেন। রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজপুত চিত্রাঙ্কন রীতির প্রসার ঘটিয়াছিল। পাহাড়ী অঞ্চলে কাংড়া উপত্যকায় এই চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

সঙ্গীত

মুঘল সম্রাটগণ সঙ্গীতেরও বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লেন পুলের মতে বাবর সঙ্গীত পছন্দ করিতেন এবং সঙ্গীতের উপযোগী কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের প্রিয় ছিলেন। আকবরের সঙ্গীত-প্রীতি সর্বজন-বিদিত। তানসেনের মত প্রখ্যাত সঙ্গীতসাধক তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। হিন্দু, ইরাণীয়, তুরাণীয়, কাশ্মীরী প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্গীত বিশারদ তাঁহার দরবারে ছিলেন। পিতার ন্যায় জাহাঙ্গীরও সঙ্গীতসাধক ছিলেন। নিজে বহু হিন্দী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। শাহজাহানও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতায় মুঘল সঙ্গীত-চর্চায় ছেদ পড়িয়াছিল। তিনি রাজসভা হইতে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি প্রভৃতিকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই সঙ্গীত শিল্পধারা তখনও টিকিয়াছিল। এখন সে যুগের সঙ্গীতের কিছু কিছু নজির পাওয়া যায়।

সাহিত্য

সাহিত্য : সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুঘল যুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা ছাড়াও এই যুগে হিন্দী ও ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বাবরের জীবন-স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আবুল ফজল, ফৈজী, বদাউনী, আব্দুল হামিদ, লাহোরী, কাঁফি খাঁ প্রভৃতি সকলেরই সে যুগের সাহিত্যে বিরাট দান রহিয়াছে। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী', বদাউনীর 'মন্তাখাব-উল্-তোয়ারিখ', ফৈজীর 'লীলাবতী' প্রভৃতি আকবরের যুগের অমর সাহিত্য সৃষ্টি। থিজলী ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী এবং তাঁহার আমলে আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহ্‌নামা' এবং শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো কর্তৃক উপনিষদ্ ও বেদের পারসিক অনুবাদ মুঘল যুগের সাহিত্য ভান্ডারকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন, সংস্কৃত ভাষাতেও বহু গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করা হয়। হিন্দী সাহিত্যও কিছু কম পশ্চাৎপদ ছিল না। বীরবল, ভগবানদাস, টোডর

মল, মানসিংহ প্রভৃতি হিন্দী কবিতা রচনা করিয়া হিন্দী সাহিত্যকে উৎকর্ষতা দান করেন। চৈতন্য-চরিতামৃত, মঙ্গলকাব্য গ্রন্থ কাশীদাসের মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সে যুগের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, মারাঠী ও উর্দু সাহিত্যও যথেষ্ট বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

অনুশীলনী

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) বাবরের পৈত্রিক রাজ্যের নাম কি ? বাবর শব্দের অর্থ কি ? (খ) খানুয়ার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (মাঃ ১৯৭৬, '৭৭, '৮২) (গ) কোন্ যুদ্ধে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় ? (ঘ) শের শাহ কাহাকে কোথায় এবং কবে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন ? (ঙ) কে প্রথম ঘোড়ায় বাহিত ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন ? (চ) পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথা কে প্রথম চালু করেন ? (ছ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হয় এবং কত খ্রীষ্টাব্দে ? (জ) হলদিঘাটের যুদ্ধ কাহার কাহার মধ্যে হয় ? (মাঃ ১৯৮০, '৮৩) (ঝ) ইবাদৎখানা কি এবং কে নির্মাণ করেন ? (ঞ) আকবরের প্রবর্তিত ধর্মমতের নাম কি ? (ট) জাহাঙ্গীরের আমলে কোন্ বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন ? (ঠ) তাজমহল কাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং কে নির্মাণ করেন ? (ড) তেগ বাহাদুর কাহার আদেশে নিহত হন ? (ঢ) কোন্ মুঘল সম্রাট দাক্ষিণাত্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ? (ণ) মুঘল যুগে ভারতে আগত তিনজন ইউরোপীয় পর্যটকের নাম কর। (ত) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কবে হইয়াছিল ? (থ) 'অষ্টপ্রধান' বলিতে কি বুঝায় ? (দ) চৌথ কি ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (ক) খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। (খ) হুমায়ুন ও শের শাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংক্ষেপে আলোচনা কর। (গ) শের শাহের রাজস্বনীতি আলোচনা কর। (ঘ) আকবরের সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কি কি ? (ঙ) আকবরের ধর্মনীতির বৈশিষ্ট্য কি ? (চ) শাহজাহানের রাজত্বকাল কি সত্যই গৌরবময় মুঘল যুগ ? (ছ) ঔরঙ্গজেবের রাজপুত নীতি কি ছিল ?

৩। সংক্ষেপে আলোচনা কর : মুঘল যুগের ঐতিহাসিক উপাদান কি কি ?

(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হইতে বাংলা জয় পর্যন্ত বাবরের রাজ্য জয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। তাঁহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা বলা যায় কি? (মাঃ ১৯৭৯) (খ) বাবরের সামরিক প্রতিভার কি পরিচয় পাওয়া যায়? তাঁহার কৃতিত্ব আলোচনা কর। (গ) হুমায়ুনের সহিত শের শাহের দ্বন্দ্ব অথবা মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। (মাঃ ১৯৮৩) হুমায়ুনের পতনের জন্য হুমায়ুন নিজে কতটা দায়ী ছিলেন? (ঘ) শের শাহের শাসন-ব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (ঙ) আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (চ) আকবরের রাজপুত নীতি কি ছিল? ঔরঙ্গজেব ইহাতে কি পরিবর্তন আনেন তাহা সংক্ষেপে দেখাও। (ছ) আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (জ) আকবরের ধর্মমত ও হিন্দুনীতি আলোচনা কর। বদাউনী এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহা লিখ। (ঝ) আকবরকে জাতীয় সম্রাট কেন বলা হয়? (ঞ) আকবরের শাসন নীতি ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। ইহাতে শের শাহের কোন প্রভাব ছিল কি? (ট) জাহাঙ্গীরের চরিত্র আলোচনা কর। তাঁহার উপর নূরজাহানের কি প্রভাব দেখা যায়? (ঠ) শাহজাহানের রাজত্বকালে শিল্পকলার কি উৎকর্ষ দেখা যায়? তাঁহার রাজত্বকালকে 'সুবর্ণ যুগ' বলা যায় কি? (মাঃ ১৯৮০) (ড) ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি কি ছিল? ইহার কি ফল দেখা যায়? (ঢ) ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি কি ছিল? ইহার কি ফল দেখা যায়? (ণ) ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ত) মুঘল যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিবরণ দাও। (থ) মুঘল যুগে ভারতের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য কি ছিল এবং কোন্ কোন্ দেশের সহিত তাহারা বাণিজ্য করত? (দ) মুঘল যুগের কয়েকজন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের সাহিত্যকীর্তি উল্লেখ করিয়া আলোচনা কর। (ধ) মুঘল যুগের সঙ্গীত, চিত্রশিল্প এবং স্থাপত্যরীতি আলোচনা কর।

১৭০৭ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ
(আধুনিক যুগ)

প্রথম অধ্যায়

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস

মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন : ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যায়। মুঘল যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব কোন নূতন ঘটনা নহে। তবে অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশক হইতে দিল্লীর সিংহাসনে বসিবার জন্য ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছিল তাহা কেবল রাজপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ভাগ্যান্বেষী অভিজাত বর্গ এবং ষড়যন্ত্রকারী কূটকৌশলী ব্যক্তিগণও এই দ্বন্দ্বে যোগদান করেন। তাঁহাদের সাহায্যে অযোগ্য ও অপদার্থ যুবরাজগণ সিংহাসনে বসিয়া ক্রীড়নকে পরিণত হন। ফলে মুঘল দরবার নানা দল-উপদলের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় শাসন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ স্বাধীন হইয়া যান। মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙনের পথে ধাবিত হয়। বৈদেশিক আক্রমণ প্রায় ছিন্নমূল মুঘল সাম্রাজ্যরূপ তরুর মূলে কুঠারাঘাত হানিলে তাহা খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব : শাহজাদাদের মধ্যে সংঘর্ষ

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাদাদের মধ্যে মোয়াজ্জেম ছিলেন কাবুলের শাসক, আজ্‌ম গুজরাটে এবং কামবক্স ছিলেন বিজাপুরে। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পূর্বে উইল দ্বারা তাঁহার এই তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু পুত্রগণ সেই উইলের নির্দেশ অমান্য করিয়া নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। মোয়াজ্জেম এবং আজ্‌ম উভয়েই সৈন্যসামন্ত লইয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। আগ্রার অনতিদূরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আজ্‌ম নিহত হইলেন। কামবক্স বিজাপুরেই নিজেকে সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বিজয়ী মোয়াজ্জেম দাক্ষিণাত্যে যাইয়া কামবক্সকে পরাজিত এবং নিহত করিলেন। মোয়াজ্জেম 'প্রথম বাহাদুর শাহ' (শাহ আলম) নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৭০৮ খ্রীঃ)। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ, সকলের প্রতি অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হইয়াছিল ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। তাহা রোধ করা দুর্বল উত্তরাধিকারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর প্রথম বাহাদুর শাহের চারিপুত্র জাহান্দার শাহ্‌, আজিম্‌-উস্‌-শান, রফি-উস্‌-শান এবং জাহান শাহের মধ্যে সিংহাসন লইয়া পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হইল। জাহান্দার

প্রথম বাহাদুর শাহ

শাহ অপর তিন ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু আজম্-উস-শানের পুত্র ফারুকশিয়ারের চক্রান্তে তিনি নিহত হইলেন। ফারুকশিয়ার হুসেন আলি এবং আবদুল্লা নামে দুই হিন্দুস্থানী সৈয়দ বংশীয় ভ্রাতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফারুকশিয়ার ক্ষমতায় আসিয়া এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। ফারুক তাঁহাদের হাত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিলে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অতঃপর তাঁহারা যথাক্রমে রফি-উস্-শানের পুত্রদ্বয়কে সিংহাসনে বসান। শেষে তাঁহারা জাহান শাহের পুত্র রোশন আখতারকে সিংহাসনে বসাইলেন। রোশন 'প্রথম মহম্মদ শাহ্' নাম ধারণ করিলেন। মহম্মদ শাহ্ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রাধান্য তাঁহার নিকট বিষময় মনে হইয়াছিল। তিনি সৈয়দ বিরোধী দাক্ষিণাত্যের শাসক নিজাম-উল্-মুল্কের সাহায্য লইয়া সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করাইলেন। অতঃপর নিজাম-উল্-মুল্ক হইলেন বাহাদুর শাহের প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীতে মুঘল দরবারের আবহাওয়া তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন এবং নামেমাত্র মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই হইল দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্য।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খ্রী)

মহম্মদ শাহ্ ছিলেন বিলাসী এবং অকর্মণ্য। ফলে একে একে অযোধ্যা, বাংলাদেশ এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল মুঘল সম্রাটের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতে লাগিল। জাঠ, রোহিলা প্রভৃতি জাতি দিল্লীর স্বাধীনতা অস্বীকার করিল, পাঞ্জাবে শিখ জাতির অভ্যুদয় হইল; মারাঠারা অধিকার বিস্তার করিল। অবশেষে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ্ ছিন্নমূল মুঘল সাম্রাজ্যের মূলে তাঁহার অভিযানের দ্বারা কুঠারাঘাত হানিলেন। তাঁহার অনুচরগণ আহম্মদ শাহের রাজত্বের শেষভাগে ভারত অভিযান করিয়াছিলেন। ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইল এবং পতনের পথ সুগম হইল।

মহম্মদ শাহে' দুর্বলতা ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ

পরবর্তী সম্রাট্ আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪ খ্রীঃ) ছিলেন অযোগ্য ও অকর্মণ্য। তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া জাহান্দার শাহের এক পুত্রকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়া সিংহাসনে বসান হইল। তিনি দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর সম্রাট হইলেন দ্বিতীয় শাহ আলম্। তিনি ইংরেজ বণিকদের দেওয়ানী দান করিয়াছিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ) এবং তাহাদের প্রদত্ত অর্থে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় আকবর শাহ এবং সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের সময় নামেমাত্র মুঘল সম্রাট। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়।

আহম্মদ শাহ

ভ্রাতৃবিরোধ এবং ক্রমাগত আত্ম-বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের ব্যয়বহুল যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং তাঁহার পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যের আয় হ্রাস এবং ব্যয় বৃদ্ধি ঘটার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় রাজস্বের হ্রাসপ্রাপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যথেচ্ছভাবে অভিজাত আমলাতন্ত্রকে জায়গির জমি দান। ঔরঙ্গজেব দক্ষিণী অভিজাতদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথেচ্ছ জায়গির জমি দিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ জায়গির জমির পরিমাণ ছিল স্বল্প। জায়গির জমি হইতে সরকারের আয় হইত নামমাত্র—কখনও একেবারেই নয়। ফলে জায়গির বৃদ্ধির ফলে সঙ্কট দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, জায়গির ও দরবারে নিয়োগ লইয়া অভিজাতদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় তাহাতে জাতি-গোষ্ঠীর ও দল-উপদলীয় বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। ইরাণী, তুরাণী, হিন্দুস্থানী বিভিন্ন দলভুক্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের ধুরন্ধর ব্যক্তিগণ রাজদরবারে দলাদলি করিতে থাকেন।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ (১৭৩৮-৩৯ খ্রীঃ)ঃ ঔরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগ লইয়া মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। পারস্য কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্য হইতে কান্দাহার দখল নাদির শাহ্‌কে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করে। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ পারস্যের সিংহাসন দখল করেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ প্রথমে কান্দাহার দখল করিলেন এবং কান্দাহারের আফগানগণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহার প্রতিবাদে তিনি মুঘল দরবারে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার দূত মুঘল রাজদরবারে বন্দী হওয়ায় ক্রুদ্ধ নাদির শাহ্‌ ভারত আক্রমণ করিলেন। তিনি কাবুল ও গজনী জয় করিয়া পেশোয়ার ও লাহোর দখল করিলেন। তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া গোড়ার দিকে কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে এইরূপ একটি মিথ্যা গুজব দিল্লীতে রটনা হইলে দিল্লীর নাগরিকদের হস্তে বহু পারসিক সৈন্য নিহত হয়। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির শাহ দীর্ঘ সাতঘণ্টা ধরিয়া নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন ও পৈশাচিক অত্যাচার চালান। অবশেষে মহম্মদ শাহের সনির্বন্ধ অনুরোধে এই অত্যাচার বন্ধ হয়। কিন্তু নাদির শাহ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাওয়ার পূর্বে মহম্মদ শাহের নিকট হইতে প্রচুর ধনরত্ন, মুঘলদের ময়ূর সিংহাসন ও দুষ্প্রাপ্য কোহিনূর মণি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। এতদ্ভিন্ন সন্ধির শর্তানুযায়ী নাদির শাহ্‌ সিন্ধু নদের পশ্চিমাঞ্চল দখল করেন। আফগানিস্তান মুঘল সাম্রাজ্যচ্যুত হইল এবং লাহোরের শাসনকর্তা নাদির শাহকে বাৎসরিক ২০ লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আক্রমণের কারণ

নাদির শাহের এই আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত

হইয়াছিল। এই সুযোগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আফগানদিগের এবং দক্ষিণ দিক হইতে মারাঠাদিগের আক্রমণ শুরু হয়। পাঞ্জাব বিধ্বস্ত হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া যায় এবং নাদির শাহের এই সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া আহম্মদ শাহ আবদালীও ভারত আক্রমণে উৎসাহিত হন।

ফলাফল

উপরি-উক্ত ঘটনাপরম্পরা এবং কার্যকারণ সম্বন্ধ আলোচনা করিলে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও পতনের কারণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যের বিশালতাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত এত বড় বিশাল সাম্রাজ্যের পরিচালনা করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব ছিল না।

সাম্রাজ্যের বিশালতা

দ্বিতীয়তঃ, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যুদ্ধ-নীতির উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। রাজ্যের সংগঠন এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ব্যাপারে তাঁহারা ততটা আগ্রহী ছিলেন না, যতটা ছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে। মহামতি আকবর ব্যতীত রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে অন্যান্য বাদশাহের তেমন যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সমর-স্পৃহা ও তাহার উপর অধিক গুরুত্ব স্থাপন

তৃতীয়তঃ, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃতি ছিল স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র, এইরূপ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রাজাদের ব্যক্তিগত কর্মনিষ্ঠা ও সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। আকবর ও জাহাঙ্গীর ব্যতীত অন্যান্য মুঘল সম্রাট প্রজাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করার চেষ্টা করেন নাই। বরং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও হিন্দু-বিদ্বেষ স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটিগুলিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের আরামপ্রিয়তা ও শৈথিল্যের ফলে স্বৈরতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে।

স্বৈরতন্ত্রের ত্রুটি

চতুর্থত, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে যেহেতু কোন নির্দিষ্ট আইন ছিল না ; সেইহেতু প্রত্যেক সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া প্রায়শই বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইত। শাহজাহানের এবং ঔরঙ্গজেবের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহাতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী আমীর-ওমরাহগণ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। আবদুর রহমান, মহবৎ খাঁ, সাদুল্লা, মীরজুমলা প্রভৃতি অভিজাত আমলা মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী কালে অভিজাত শ্রেণীর আমলাদের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ছিল না। তাঁহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের অভাব

ঔরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে অভিজাততন্ত্রের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। ইহারা ইরাণী, তুরাণী ও হিন্দুস্থানী এই তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সম্রাট ও সাম্রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতা এবং দ্বন্দ্ব-কলহ সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল্-মুল্‌ক প্রভৃতি অভিজাতদের সাম্রাজ্য-বিরোধী কার্যকলাপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের আত্মকলহ ও মন্ত্রিগণের স্বার্থপরতা

ষষ্ঠতঃ, মুঘলদের সামরিক বাহিনীর ত্রুটিও এই সাম্রাজ্যের পতনের আরও একটি কারণ। বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন জাতি হইতে মুঘল সেনাবাহিনী সংগৃহীত হওয়ার জন্য তাহারা কোনরূপ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই। এই বাহিনী মিশ্রিত বাহিনী হওয়ায় ইহাদের রণ-পদ্ধতিও এক ছিল না। সৈন্যবাহিনী সরাসরি সম্রাটদের অধীন না থাকিয়া সেনানায়ক ও মনসবদারদের আদেশাধীন থাকায় সম্রাট বা সাম্রাজ্যের প্রতি তাহাদের কোন আনুগত্য বা আন্তরিকতা ছিল না। ইহা ব্যতীত, মুঘল সৈন্যবাহিনী নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যসম্ভার ব্যতীত বিলাস-ব্যসনের সকল ভ্রাম্যমাণ উপচারসহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করায় স্বল্প সজ্জিত, ক্ষিপ্রগতি মারাঠা সৈন্যের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।

সামরিক বাহিনীর ত্রুটি

সপ্তমতঃ, আকবরের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক নীতির ফলে সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে এই নীতির অবনতি ঘটে। কৃষক, শিল্পী, বণিক প্রভৃতি সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়। মুঘল দরবারের ব্যয়বহুল জাঁকজমক, মুঘল হারেমের ব্যয়বহুল জীবনযাপন, নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহ এবং জায়গির বৃদ্ধি হেতু রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি প্রভৃতি নানা কারণে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এই দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক অবক্ষয়

অষ্টমতঃ, ঐতিহাসিক স্মিথের মতে সুগঠিত নৌ-বাহিনীর কোন প্রয়োজনীয়তা মুঘল সম্রাটগণ উপলব্ধি করেন নাই। বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ধত আক্রমণ এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। ইহার ফলে তাঁহাদের পক্ষে সুশিক্ষিত নৌবলে বলীয়ান ইউরোপীয় জাতিসমূহকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই।

নৌ-বাহিনীর অভাব

নবমতঃ, ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল। দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত যুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের যে শুধু প্রভূত অর্থ ও লোক ক্ষয় হইয়াছিল তাহা নহে, ইহার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন অবহেলিত হয় ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাহা ছাড়া, এই যুদ্ধের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার কার্যও অবহেলিত হয়। উত্তর-ভারতে রাজপুত, শিখ প্রভৃতি জাতির বিদ্রোহ জোরদার হয় এবং শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্য বিজয় ও মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করাও ঔরঙ্গজেবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এই দাক্ষিণাত্যের ক্ষতই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হইয়াছে।[১]

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

দশমতঃ, ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষী নীতিকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করা হয়। রাজপুত জাতির শৌর্য, বীর্য, আনুগত্য এবং সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া আকবর যে এত বড় বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সেই হিন্দু জাতিকে নানাদিকে উৎপীড়িত করিয়া ঔরঙ্গজেব নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার এই হিন্দু-বিদ্বেষী নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সকল বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি কুরিয়া কুরিয়া খাইতে থাকে।

ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ-নীতি হিন্দু-বিদ্বেষ

একাদশ ও সর্বশেষ কারণ মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভাঙনের সর্বশেষ ধাপে পা দিয়া একটি শেষ এবং চরম আঘাতের জন্য অপেক্ষমান সেই সময়ে নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যকে সেই চরম আঘাতই হানিয়াছিল। এই আঘাত হইতে মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার শক্তি সেদিন আর কাহারও অবশিষ্ট ছিল না।

নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ

(১) The Deccan was the grave of his body as well as of his empire.

দ্বিতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক শক্তিসমূহের অভ্যুত্থান

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে একাধিক স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ হইতে। এই সকল নূতন রাজ্যের ক্ষমতাশালী আঞ্চলিক শক্তিরূপে প্রাধান্য স্থাপনের পশ্চাতে ছিল প্রধানতঃ ভাগ্যান্বেষী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রচেষ্টা—যথা বঙ্গদেশে মুর্শিদকুলী খাঁ ও আলিবর্দী খাঁ, হায়দ্রাবাদে নিজাম-উল্-মুল্‌ক, মহীশূরে হায়দর আলি প্রমুখ। মহারাষ্ট্রে শিবাজীর উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে পেশওয়াদের নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থান এবং পাঞ্জাবে শিখ শক্তির প্রাধান্য স্থাপন এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে ক্ষমতাশালী ইংরেজ ও ফরাসীদের সহিত উক্ত আঞ্চলিক শক্তিবর্গের সংঘর্ষ দেখা দেয়। বঙ্গদেশে ইংরেজদের সহিত নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সংঘর্ষ, মহীশূরে হায়দর আলি এবং মারাঠাদের সহিত পরবর্তী কালের সংঘর্ষ ভারতে ইংরেজ শক্তি বিস্তারের পথে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল।

(ক) নিম্নে বঙ্গদেশ, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, অযোধ্যা এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ শক্তি অভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

বঙ্গদেশ ঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশে মুর্শিদকুলী খাঁ প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে ইংরেজ বণিকগণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। মুর্শিদকুলীর বলপূর্বক খাজনা আদায়ের ভয় পাইয়া ইংরেজরা মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের নিকট হইতে 'ফরমান' আনিয়াছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ইংরেজগণ নিরুপায়। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিন (১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ) ছিলেন মুর্শিদকুলীর জামাতা। সুজাউদ্দিন আলিবর্দী খাঁ নামক জনৈক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হইলেন। তিনি দুর্বলচেতা নবাব ছিলেন। তৎকালীন অরাজকতা এবং নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণজনিত গোলযোগের সুযোগে আলিবর্দী খাঁ ঘেরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করিয়া বাংলার মসনদে বসিলেন।

সুজাউদ্দিন খাঁ

মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর হইতে আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত ইংরেজ বণিকগণ অবাধে বাণিজ্যিক ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিল। কিন্তু আলিবর্দী ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষমূলক ব্যবহার না করিলেও তাহাদের ক্ষমতা বিস্তারের পথে বাধার সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার আমলে মারাঠা বর্গীদের বঙ্গদেশ আক্রমণ বাৎসরিক ঘটনা হইয়াছিল। তিনি তাহাদের অর্থ দিয়া দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিতেন। তিনি ইংরেজদের মধুচক্রের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

সরফরাজ খাঁ
আলিবর্দী খাঁ

হায়দ্রাবাদ ঃ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম-উল্-মুল্ক আসফ-জাহ্ হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল দরবারে নিজাম-উল্-মুল্ক ছিলেন একজন ক্ষমতাহীন অভিজাত। সৈয়দ ভ্রাতাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার চেষ্টায় সৈয়দ ভ্রাতাদের পতন ঘটিয়াছিল। পুরস্কারস্বরূপ মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ নিজাম-উল্-মুল্ককে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৭২০ হইতে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিজাম-উল্-মুল্ক দাক্ষিণাত্যে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী শক্তিবর্গকে দমন করিয়া একটি দক্ষ প্রশাসন গড়িয়া তুলেন। দুই বৎসর পরে (১৭২৪ খ্রীঃ) তিনি মুঘল সম্রাটের উজীরের পদে উন্নীত হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সম্রাটের সহিত মতান্তর ঘটে। সম্রাট ও দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাতদের বিরোধিতায় তিনি অতিষ্ঠ হইয়া মুঘল দরবার ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান ও সেখানে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে থাকেন। যদিও তিনি দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সুলতানের মতই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি ধর্মসহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেন। তাঁহার দেওয়ান ছিলেন পুরণ-চাঁদ নামক জনৈক হিন্দু। তিনি দিল্লীর অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করিতেন। রাজকর্মচারীদের মধ্যে জায়গির বিতরণ করিতেন। প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার করিয়া রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠে।

মহীশুর ঃ মহীশুরের হায়দর আলির নেতৃত্বে স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ও ইংরেজ শক্তির সহিত সংঘর্ষ দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে অতি সাধারণ এক পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম ফতে মহম্মদ। তিনি মহীশুরে ও আর্কটে সৈনিকরূপে কাজ করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর হায়দর ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরূপে জীবন শুরু করেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না ; কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। মহীশুরের তৎকালীন হিন্দু রাজাদের প্রধান সেনাপতি নঞ্জরাজের অধীনে সামান্য 'নায়ক'রূপে সৈনিকের জীবন শুরু করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিন্দিগুলের ফৌজদার নিযুক্ত হন। ইহার পর হইতে হায়দরের ক্ষমতা ও প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। মহীশুরের রাজপরিবার সেই সময় নঞ্জরাজ ও তাঁহার ভ্রাতা দেবরাজের হস্তে প্রায় বন্দী ছিলেন এবং হিন্দু রাজা নামেমাত্র শাসন করিতেন। নঞ্জরাজের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তিনি শাসন কার্যে অযোগ্য ছিলেন। সেই সুযোগে হায়দর সৈন্যবাহিনীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া নঞ্জরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং নিজে রাজ্যের সর্বেসর্বা হন (১৭৬০ খ্রীঃ)। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে একদা অনুগত খন্ডরাও মারাঠাদের সাহায্য লইয়া হায়দরকে শ্রীরঙ্গপত্তম হইতে বিতাড়িত করিলে তিনি বাঙ্গালোরে আশ্রয়

লইয়া শেষ পর্যন্ত খণ্ডরাওকে পরাস্ত করেন এবং পুনরায় মহীশূরের ক্ষমতা হস্তগত করেন (১৭৬১ খ্রীঃ)। অতঃপর তাঁহার মারাঠা শক্তির সহিত সংঘর্ষ ঘটে রাজ্য বিস্তারের কারণে। তিনি ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদনুর, সুন্ডা, সিরা কানারা, হরপনালি, সাভানুর, চিতলদুর্গ প্রভৃতি স্থানগুলি দখল করেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরের সহিত ইংরেজ শক্তির সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

শিখ শক্তির অভ্যুত্থান ঃ গুরু নানকের প্রবর্তিত ধর্মমতের নাম শিখ ধর্ম। তাঁহার ধর্মমত পাঞ্জাবের ইতিহাসের উপর গভীর প্রভাব ফেলিয়াছিল। তাঁহার উত্তর-সাধকদের আমলেই শিখদের ধর্মীয় সংগঠন গড়িয়া উঠে। গুরু নানকের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোক ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি শিখদের স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ঘটাইয়াছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই পরবর্তী কালে শিখদের মধ্যে রাজনৈতিক সত্তার স্ফুরণ ঘটায়। তবে পরবর্তী গুরু গুরু অঙ্গদ হইতে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীঃ) পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুইশত বৎসরের মধ্যে শিখ সম্প্রদায় নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে সংগ্রামশীল ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল মুঘল বাদশাহগণের প্রতিশোধাত্মক ও দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য। গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২ খ্রীঃ) হুমায়ুনের সময় শিখ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেন। পরবর্তী গুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪ খ্রীঃ) ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে 'লঙ্গরের' সংস্কার করিয়া ধর্মজগৎকে ভাগ করেন। এইগুলি মণ্ডিলে নামে পরিচিত। গুরু রামদাস (১৫৭৫-৮২ খ্রীঃ) সম্রাট আকবরের নিকট হইতে পাঁচ শত বিঘা জমির উপর 'অমৃতসর' নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন এবং তৎসংলগ্ন হরমন্দির বা হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া অমৃতসর শহর গড়িয়া উঠে। ইহা **শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল।** গুরু রামদাসের পুত্র গুরু অর্জুন অমৃতসরকে ধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করেন। ইহা শিখদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ইহার মধ্যস্থলে 'দরবার সাহেব' নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার নির্মাণ কার্যে স্বেচ্ছাশ্রম ও অন্যান্য দানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি প্রথম শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' সঙ্কলন করেন। ইহার নামকরণ করা হয় 'আদি গ্রন্থ'। ইহাতে পূর্বসূরীদের ধর্মীয় উপদেশ সন্নিবেশ

করা হয়। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুকে আশ্রয় দানের অভিযোগে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরবর্তী গুরু হরগোবিন্দের সময় হইতে শিখ শক্তি সামরিক সংগঠনে মনোযোগী হয়। জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার শত্রুতার ফলে তিনি মুঘলদের হস্তে বন্দী হন। কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালে পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। তিনি পরাজিত হইয়া পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবম গুরু তেগ বাহাদুর আনন্দপুর শাহীতে তাঁহার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেন। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শিখ সম্প্রদায়কে 'খালসা' বাহিনীতে পরিণত করেন। (পূর্বে আলোচিত)। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মারাঠা সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি ও পতন

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ ঃ শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী মারাঠা রাষ্ট্রের সিংহাসনে বসিলেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব বিদ্রোহী শম্ভুজীকে শাস্তিদানের জন্য দাক্ষিণাত্যে আসেন। শম্ভুজী মুঘল বিরোধী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুজী মুঘল বাহিনীর হস্তে বন্দী হইলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অতঃপর মুঘলবাহিনী একে একে বহু মারাঠা দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। মারাঠাদের রাজধানী রায়গড় অধিকার করিবার কালে শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু ও পরিবারের অন্যান্য সকলে মুঘলদের হস্তে বন্দী হইলেন। মহারাষ্ট্রের এই দুর্দিনে শম্ভুজীর ভ্রাতা রাজারাম শাসনভার গ্রহণ করিয়া লড়াই চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

মারাঠা শক্তির পূর্ব বিক্রম নষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনও তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই। শিবাজীর স্বাধীনতা ও জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষিত মারাঠা জাতি পুনরায় মুঘলদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইল। রামচন্দ্র পন্থ, শঙ্করজী মলহর, পরশুরাম ত্রম্বক, নিরাজী প্রভৃতি মারাঠা সর্দারগণ মুঘলদের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। নূতন করিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া তিনি খান্দেশ এবং বেরার হইতে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করিতে লাগিলেন। রুস্তম খাঁ নামক জনৈক মুঘল সেনাপতি

রাজারামের সহিত মুঘলদের সংঘর্ষ

রাজারামের হস্তে বন্দী হইলেন। ঔরঙ্গজেবকে বহু অর্থ, সৈন্য ও শ্রমের বিনিময়ে দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকার টিকাইয়া রাখিতে হইল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে ঔরঙ্গজেব পুনরায় মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু মারাঠা 'জাতীয় যুদ্ধ' তখনও চলিতে লাগিল। রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার নামে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তারাবাঈ প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না এবং সাহসী মহিলা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইয়া মালব, গুজরাট, বেরার লুণ্ঠন করিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াও মারাঠাদের দমন করিতে পারিলেন না। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে মারাঠা শক্তি একরূপ অপরাজেয় রহিয়া গেল।

তারাবাঈয়ের অধীনে মারাঠা শক্তি

মারাঠা শক্তি অজেয়

আলমগীরের মৃত্যুর পর মুঘল শাহজাদাদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃযুদ্ধ শুরু হওয়ার সুযোগে শাহু মুক্তিলাভ করিলেন। তারাবাঈ তখন স্বীয় শিশুপুত্রের নামে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। শাহু মুক্তি পাইয়া সিংহাসন দাবি করিলেন। তিনি এই সময় দ্বিতীয় শিবাজী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলেন। ফলে মারাঠাদের মধ্যে গৃহবিবাদ শুরু হইল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু মারাঠাদের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সাতারা দুর্গে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। কিন্তু তারাবাঈ তখনও শাহুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাইতে লাগিলেন। শাহুর প্রধান সমর্থক বালাজী বিশ্বনাথের কূটনীতির ফলে তারাবাঈ-এর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তারাবাঈ-এর মৃত্যু ঘটিল। রাজারামের অন্যতম পত্নী রাজসবাঈ-এর পুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজী এবং শাহুর মধ্যে শেষ পর্যন্ত মারাঠা সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া গেল। শাহুর সমর্থক ও পরামর্শদাতা বালাজী বিশ্বনাথ 'পেশওয়া' বা প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন।

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল এই পেশওয়াদের অধীনে। পেশওয়া পদের স্রষ্টা বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন একজন কোঙ্কণ দেশীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। মারাঠা জাতি যখন আত্মকলহে লিপ্ত, তাহাদের জাতীয় গৌরব বিপর্যস্ত, তখন এই কূটকৌশলী, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ রাষ্ট্রনেতা শাহুকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মারাঠা জাতিকে নবশক্তিতে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে মারাঠা রাজ্যের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী এবং সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহু তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন।

বালাজী বিশ্বনাথ প্রথম পেশওয়া (১৭১৩-২০ খ্রীঃ)

বালাজীর চেষ্টায় শাহু দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মুঘল সুবা হইতে 'চৌথ' এবং 'সরদেশমুখী' আদায় করিবার অধিকার অর্জন করেন। ইহার বিনিময়ে মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারকে দশলক্ষ টাকা বাৎসরিক সেলামী দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বালাজী মুঘলদের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য শাহুকে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে পরামর্শ দেন (১৭১৪ খ্রীঃ)। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে এই সুদক্ষ রাজনীতিবিদের জীবনাবসান ঘটে। তিনি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়া মারাঠা জাতির প্রাধান্য স্থাপনের পথ সুগম করিয়া গিয়াছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশওয়া হইলেন। পেশওয়া-পদ বংশানুক্রমিক বলিয়া গণ্য হইল। বাজীরাও পিতার অপেক্ষাও সুচতুর, সমরকুশল এবং দূরদর্শী কূটনীতিবিদ ছিলেন। তিনি শিবাজীর আদর্শ অনুযায়ী 'হিন্দুপাদ-পাদশাহী' (অর্থাৎ অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য) প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে তিনি কৃষ্ণা নদী হইতে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত এক অখণ্ড মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তবে শুধু মারাঠা নয়, অন্য হিন্দু রাজা ও জমিদারগণকেও তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্কের সহিত সন্ধি করিয়া তিনি উত্তর-ভারতে অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এবং বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছত্রশালের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তিনি সসৈন্যে দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলে বাদশাহ নিজাম-উল্-মুল্‌ককে তাঁহার সাহায্যার্থে আহ্বান জানাইলেন। নিজাম প্রথম বাজীরাও-এর সহিত পূর্বে সম্পাদিত সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া বাদশাহকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইলেন। ভূপালের নিকটবর্তী একস্থানে বাজীরাও নিজামের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল মারাঠাদের অধিকারে আসিল।

প্রথম বাজীরাও—দ্বিতীয় পেশওয়া (১৭২০-৪০ খ্রীঃ)

সাম্রাজ্য বিস্তার

অতঃপর পশ্চিম উপকূলের সলসেট ও বেসিন বন্দর বাজীরাও-এর ভ্রাতার দ্বারা পোর্তুগীজদের নিকট হইতে মারাঠা অধিকারে আসে। এই সময় নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বাজীরাও প্রতিবেশী মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে এ বিষয়ে কোন কিছু করার পূর্বেই ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু

ঘটে। সেই যুগে কি সাম্রাজ্য বিস্তারে, কি দেশপ্রেমে, কি সাম্রাজ্যের সংগঠনে বাজীরাও-এর সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রধান ভুল হইয়াছিল এই যে উত্তরাপথে শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যের মারাঠা সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করিতে সমর্থ হন নাই। উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তার কার্যে ব্যস্ত থাকার সময়ে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ইন্দোরে হোলকার, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, নাগপুরে ভোঁসলে প্রভৃতি সামন্তরাজগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশ পর্যন্ত 'বর্গী' বা সামন্তরাজাদের সৈন্যগণ উৎপাত শুরু করিয়াছিল। তিনি শিবাজীর অনুসৃত নীতি ত্যাগ করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভুলত্রুটি

প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশওয়া হইলেন। তিনি মাত্র আঠার বৎসর বয়সে পেশওয়া-পদ লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মত নানা গুণের অধিকারী না হইলেও তাঁহার সামরিক প্রতিভা ছিল। তিনি মালব অভিযান করিয়া উহা দখল করিয়া লইয়াছিলেন। মুঘল সম্রাটের অনুরোধে তিনি রঘুজী ভোঁসলের বিরুদ্ধে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর সাহায্যে অগ্রসর হইয়া জয়লাভও করিয়াছিলেন। রাজা শাহু অপুত্রক ছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পূর্বে উইল করিয়া তিনি পেশওয়ার হস্তে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া শিবাজীর বংশধরগণকে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। ফলে শাহুর মৃত্যুর পর বালাজী বাজীরাও রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত করিয়াছিলেন।

বালাজী বাজীরাও
(১৭৪০-৬১ খ্রীঃ)

উপরিউক্ত পেশওয়াগণের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। মারাঠা শক্তি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেও সকলেই পুনার পেশওয়ার প্রাধান্য মানিয়া চলিত। মূলতঃ তখন পর্যন্ত 'মারাঠা যুক্তরাষ্ট্রের' মধ্যে ঐক্যবন্ধন ছিল।

পেশওয়া শাসনের কুফল

আহম্মদ শাহ্ আবদালীর (দুররানী) ভারত আক্রমণ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : আহম্মদ শাহ্ আবদালী ছিলেন নাদির শাহের একজন বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি নাদির শাহের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। সেইজন্য নাদির শাহের ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি

ব্যক্তিগতভাবে ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। তিনি কাবুল, কান্দাহার ও পেশোয়ার অধিকার করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরও অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি পাঞ্জাবের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা মীর মন্নুর মৃত্যু ঘটিলে মুঘল সম্রাটের অনুমতিক্রমে মারাঠারা পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইতে অগ্রসর হইলেন। আহম্মদ শাহ্ আবদালী (দুর্‌রানী) ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারত আক্রমণ করিলেন। তিনি দিল্লীতে আসিয়া অবাধে লুণ্ঠন চালাইলেন। মুঘল বাদশাহ কাশ্মীর হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। আবদালী পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলে সদাশিব রাও-এর অধিনায়কত্বে এক বিরাট মারাঠা বাহিনী উত্তর-ভারতে প্রেরিত হইল (১৭৬০ খ্রীঃ)। মারাঠাগণের শক্তিবৃদ্ধিতে উত্তর-ভারতের মুসলমান সুলতানগণ খুবই ভীত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা কেহ আবদালীকে বাধা দান করার জন্য মারাঠাদের সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন না। ইহা ব্যতীত মারাঠাদের বিরুদ্ধে জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি হিন্দু রাজাগণেরও অভিযোগ ছিল। সেইজন্য তাঁহারাও আবদালীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে মারাঠাদের সাহায্য করিলেন না। অপরপক্ষে, আবদালী অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা এবং রোহিলখণ্ডের নবাব সর্দার নজীব খাঁর সাহায্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার ফলে পানিপথের প্রান্তরে যখন সদাশিব রাও পৌঁছাইলেন, আবদালী তাঁহাকে সহজে পরাজিত করিতে পারিলেন। সদাশিব রাও এবং বিশ্বাস রাও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। ইহাই হইল পানিপথের তৃতীয় এবং শেষ যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রীঃ)।

ফলাফল : মারাঠা সাম্রাজ্যের অবসান, পেশওয়ার মর্যাদা হ্রাস, মারাঠা শক্তি সঙ্ঘ বিনষ্ট, হায়দর-আলি ও ব্রিটিশ শক্তির প্রাধান্য স্থাপন

এই যুদ্ধের ফলাফল ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগান্তকারী। মারাঠা জাতির পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিল। পেশওয়ার মর্যাদা বিশেষভাবে হ্রাস পাইল। মারাঠা শক্তিসঙ্ঘের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইল। ফলে মারাঠা শক্তির পতনের পথ সুগম হইল। দাক্ষিণাত্যের মহীশূর রাজ্যে হায়দর আলি ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম হইলেন। উত্তর-ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ প্রস্তুত হইল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠারা যে সাম্রাজ্যশক্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহার মূলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরাজয়ে কুঠারাঘাত হানিয়াছিল। ফলে ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা বিস্তারে অন্য কেহ বাধা দেওয়ার মত শক্তিশালী বাহিনী ছিল না।

মারাঠাদের পতনের কারণ ঃ প্রত্যক্ষভাবে মারাঠাদের পতনের মূলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয় ও পঞ্চ শক্তিতে বিভাজন দায়ী ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা ছাড়া

আরও কয়েকটি কারণ কার্যকরী ছিল। (১) পুণাতে পেশওয়া, নাগপুরে ভোঁসলে, ইন্দোরে হোলকার, গোয়ালিয়রে গাইকোয়াড় এবং মধ্য ভারতে সিন্ধিয়ার অধীনে মারাঠা শক্তি ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের নিয়োজিত করে। ফলে জাতীয় স্বার্থ বিনষ্ট হয়। (২) মারাঠা শক্তি পরবর্তী কালে শিবাজীর আদর্শচ্যুত হইয়াছিল। তাহারা শিবাজীর অনুসৃত গেরিলা যুদ্ধ প্রণালী ত্যাগ করিয়া সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার নীতি অবলম্বন করিয়াও মারাত্মক ভুল করিয়াছিল। ভাড়াটিয়া সৈন্য লইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া নিঃসন্দেহে দেশের ও জাতির সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল। (৩) সিন্ধিয়া এবং নানা ফড়নবীশের পরবর্তী কালে জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য মারাঠা নায়কগণ উৎসাহী ছিলেন না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশীদের সহিত অপমানজনক শর্তে সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেও তাঁহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার ফল হইল জাতির সর্বনাশ।

শিবাজীর আদর্শচ্যুতি

'গেরিলা' যুদ্ধ পদ্ধতি ত্যাগ

মারাঠা নেতৃবর্গের স্বার্থসর্বস্বতা

(৪) অর্থনৈতিক দুরবস্থা মারাঠা শক্তির পতনের আর একটি কারণ। পর্বতসঙ্কুল মারাঠা দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সুযোগ ছিল না। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও তাহাদের ছিল না। (৫) জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের ফলে মারাঠা সর্দার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা মারাঠা রাষ্ট্রশক্তির পতনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

অর্থ নৈতিক দুরবস্থা

মারাঠারা পূর্ব অনুসৃত গেরিলা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু উন্নততর ও সুষ্ঠুভাবে সামরিক বাহিনীকে শিক্ষা দান করিতে পারে নাই। এমন কি, আফগানদের যুদ্ধাস্ত্রও মারাঠাদের অপেক্ষা উন্নত ছিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল।

আধুনিক উন্নততর যুদ্ধ

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব—কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ : মুঘল আমলে যথাক্রমে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। তাহারা পশ্চিম উপকূলের কালিকট, সুরাট, গোয়া, বোম্বাই এবং পূর্ব-উপকূলের মাদ্রাজ, মসুলিপত্তম, উড়িষ্যার বালেশ্বর, বঙ্গদেশের হুগলী, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করিয়া বিভিন্ন পণ্যের বাণিজ্য করিতে থাকে। পরে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সম্রাটদের এবং দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের নবাবদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসী বণিক কোম্পানি প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বিবদমান ভারতীয় শাসকদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। বস্তুতঃ, ভারতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে যে সকল জাতি এদেশে আগমন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইংরেজ এবং ফরাসীরা ঐকান্তিক চেষ্টায় নিজেদের ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ করিতে পারিয়াছিল। যেহেতু, উভয়ের স্বার্থই এক এবং পরস্পর-বিরোধী, সেইহেতু অচিরেই ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। সেই সময় পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ইহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল অসংহত, দুর্বল ও পরস্পর বিবদমান এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা ইউরোপীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিত। এই বণিক সম্প্রদায় সর্বদাই ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিল। সেই সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হইলে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দুই পরস্পর-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারই পরিপূরক দ্বন্দ্ব হিসাবে দক্ষিণ-ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ নামে অভিহিত।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কারণ

এই সময় মাদ্রাজ ও সেণ্ট ফোর্ট ডেভিডে ইংরেজদের এবং পণ্ডিচেরীতে ফরাসীদের সুরক্ষিত বাণিজ্য কুঠি ছিল। তাহাদের এই কুঠিগুলি দাক্ষিণাত্যের পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় জলপথে নৌ-বাহিনীর সাহায্যে নিজ নিজ কুঠিগুলি রক্ষা করার সুবিধা ছিল। ইউরোপীয়রা করমণ্ডল উপকূলের নাম দিয়াছিল কর্ণাট। কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে। কিন্তু হায়দরাবাদের নিজাম যেমন দিল্লীর সম্রাটের প্রতি কোনরূপ আনুগত্য প্রকাশ করিতেন না, তেমনি কর্ণাটের নবাবও হায়দরাবাদের নিজামকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। এই সময় কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ

হইলে যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ দেখা দেয় তাহারই নিষ্পত্তি সাধনে হায়দরাবাদের নিজাম আনোয়ার-উদ্দিনকে কর্ণাটের নবাব-পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাহাতেও অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ভূতপূর্ব নবাবের প্রতি যে সকল জায়গিরদার অনুগত ছিলেন তাঁহারা দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব-পদে অভিষিক্ত করিতে চাহিলেন। এই সময় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। ফরাসী গভর্ণর দুপ্লে সাধারণতঃ ইংরেজদের সহিত শান্তিরক্ষা করিয়া চলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কমোডোর বার্ণেটের অধীনে এক বিরাট নৌ-বাহিনী দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি ফরাসী জাহাজ বলপূর্বক দখল করিয়া লইলে দুপ্লে মরিশাসের গভর্ণর লা বুরদনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। লা বুরদনে অতি সহজেই মাদ্রাজ অধিকার করিয়া লইলে ইংরেজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে কর্ণাটের নবাব আনোয়ার-উদ্দিনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে দুপ্লে আনোয়ার-উদ্দিনকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহাকে দান করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি মাদ্রাজ জয়ে অভিলাষী; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ দখলে না পাইয়া আনোয়ার-উদ্দিন সসৈন্যে মাদ্রাজ দখল করিতে অগ্রসর হইলে মাইলাপুর বা সেণ্ট থোমের যুদ্ধে তিনি অতি অল্প-, সংখ্যক ফরাসী সৈন্যের হস্তে পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পরই ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বিশেষতঃ ফরাসীরা এইটুকু উপলব্ধি করিতে পারিল যে ইউরোপীয় সামরিক কায়দায় শিক্ষিত একদল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এদেশে সহজেই সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভবপর হইবে। এই সময় ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে এই-লা-স্যাপলের সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিলে এইভাবে প্রথম কর্ণাট যুদ্ধের যবনিকাপাত হইল।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধে (১) ভারতে তথা দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজনীয়তা ইউরোপীয়রা উপলব্ধি করিল। (২) মাইলাপুরের যুদ্ধে মাত্র পাঁচশত ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনোয়ার-উদ্দিনের পরাজয় একদিকে যেমন ভারতীয় বিশাল সেনাবাহিনীর অকর্মণ্যতার কথা প্রকাশ করিল অপরদিকে তেমনি ইউরোপীয়দের মনে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত করিল। (৩) ইউরোপীয় বণিকগণ যাহারা শুধু বণিকের ছদ্মবেশে ভারতে আগমন করিয়াছিল ভারতের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। (৪) ভারতের দুর্বলতা ও পতনোন্মুখ অবস্থা ইউরোপীয় দেশসমূহের চোখে পড়িল।

যুদ্ধের ফলাফল

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই-লা-স্যাপলের সন্ধির শর্তানুসারে ফরাসী গভর্ণর দুপ্লেকে ইংরেজদের নিকট মাদ্রাজপ্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু মাদ্রাজ পুনরুদ্ধারের আশা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে হায়দরাবাদের নিজাম নিজাম-উল্-

মুলকের মৃত্যু হইলে পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ্ফর জঙ্গ নিজাম পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলেন। সেই সঙ্গে দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেবও আনোয়ার-উদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া কর্ণাটের নবাব-পদ দখল করিতে চাহিতেছিলেন।

ডুপ্লে মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেব

হায়দরাবাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় ও কর্ণাটের প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় উভয়ে স্ব স্ব দল গঠন করিলেন। নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দিন রহিলেন একপক্ষে আর মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেব রহিলেন অপরপক্ষে। ডুপ্লে এই সুযোগে চাঁদা সাহেব ও মুজফ্ফর জঙ্গের সহিত হাত মিলাইলেন। ফলে ইংরেজরা যোগ দিল অপরপক্ষে অর্থাৎ আনোয়ার-উদ্দিন ও নাসির জঙ্গের পক্ষে। চাঁদা সাহেব, মুজফ্ফর জঙ্গ ও ডুপ্লে এই ত্রিশক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আনোয়ার-উদ্দিন অম্বরের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনপলীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কর্ণাট চাঁদা সাহেবের দখলে আসিল এবং মিত্রশক্তি হিসাবে ফ্রান্সেরও কর্ণাটে শক্তিবৃদ্ধি হইল। ভীত ঈর্ষান্বিত ইংরেজ শক্তি নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দিনের পক্ষ লইয়া দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে ইংরেজ সেনাপতি মেজর ল্যারেন্সের তৎপরতায় ইংরেজ ও তাহার মিত্রশক্তি জয়লাভ করিলেও ডুপ্লের সাহস ও কর্মকুশলতায় মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেব জয়যুক্ত হইলেন। চাঁদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর্কটে। ফলে, সেই অঞ্চলে ফরাসী আধিপত্য বিস্তৃত হইল। ডুপ্লের ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ জনৈক আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং মুজফ্ফর জঙ্গ বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হায়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আনোয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি এই বলিয়া প্রস্তাব পাঠাইলেন যে তাঁহার পিতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র অংশ দান করিলে চাঁদা সাহেবকে তিনি কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিয়া লইবেন। কিন্তু ফরাসী সাহায্যপুষ্ট চাঁদা সাহেব রাজী না হইলে ইংরেজ গভর্ণর সন্ডার্স মহম্মদ আলিকে মারাঠা তাঞ্জোর ও মহীশূরের রাজাকে স্বীয় পক্ষে টানিয়া সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিলেন। এমন সময় রবার্ট ক্লাইভ নামক জনৈক ইংরেজ সেনাপতির তৎপরতায় অর্কাট ও কাবেরিপাক নামক দুইস্থানে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ক্লাইভ ডুপ্লে ও চাঁদা সাহেবের যুগ্ম বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া ত্রিচিনপলী অধিকার করিলেন এবং মহম্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এইভাবে ফরাসী আধিপত্যের বদলে এখন হইতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পরাজিত চাঁদা সাহেবকে হত্যা করা হইল।

ইংরেজরা যোগ দিল আনোয়ার-উদ্দিন এবং নাসির জঙ্গের পক্ষে

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী আধিপাত্যর অবসান

অর্থাভাবে বিব্রত দুপ্লে আরও কিছুকাল অতিকষ্টে যুদ্ধ চালাইয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষের আদেশে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। পরবর্তী বৎসর ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল।

দুপ্লে : যোসেফ দুপ্লে প্রথমে চন্দননগরের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন, পরে তিনি আবার পণ্ডিচেরীর গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি অসম সাহসী, রণকুশল সেনাপতি ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। উল্লিখিত গুণাবলী ছাড়াও আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি কিছু খারাপ গুণও তাঁহার চরিত্রে ছিল। তবু তাঁহার চরিত্রে যে অনন্ত দেশপ্রেম ছিল তাহাই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। ইউরোপীয় গভর্ণরদের মধ্যে দুপ্লেই সর্বপ্রথম ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও নবাবদের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার সুযোগে এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। দেশীয় সৈনিকদের বৈদেশিক সামরিক প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের পরস্পরের বিবাদে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করিয়াই ইংরেজরা ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল।

দুপ্লের নীতি

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ : ইউরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশে আবার যখন ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব শুরু হয়, ফরাসী সেনাপতি বুসী উত্তর-ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনে ব্যস্ত। এদিকে লালী পণ্ডিচেরীর গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। সামরিক ও বেসামরিক বিষয়ে তাঁহার মতামতই ছিল চূড়ান্ত। লালীর কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের অধিকার হইতে সেণ্ট ডেভিড দুর্গ দখল করিয়া ফরাসী সৈন্য মাদ্রাজ আক্রমণ করে। মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্ণর পিগট্ এবং সেনাপতি ল্যরেন্স ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিলেন। এই সময় একটি ব্রিটিশ নৌবহর মাদ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বুসী পরাজিত হন, লালী বন্দিবাসের যুদ্ধে পরাজিত হন ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার আয়ার কূটের হস্তে। পণ্ডিচেরীর ফরাসীগণ ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করে। মাহে, জিঞ্জি প্রভৃতি ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলিরও পতন ঘটে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে ফরাসীগণ ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি ফেরত পাইলেও সেখানে কেবল তাহাদের বাণিজ্যিক অধিকার স্বীকৃত হইল। ভারতে ফরাসীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

বন্দিবাসের যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয়

ভারতে ফরাসী সম্রাটের আশা চিরতরে বিলুপ্ত

ফরাসীদের পরাজয়ের কারণঃ (১) ইংরেজদের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং ফরাসীদের অর্থাভাব তাহাদের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। (২) দুপ্লের বাণিজ্যিক স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া সামরিক আদর্শ গ্রহণ করিবার ভ্রান্ত নীতিও ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ ছিল। ফরাসীদের বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় আর্থিক দুর্বলতা দেখা দিয়াছিল। (৩) ফরাসীদের ভারতবর্ষে উপযুক্ত সামরিক ঘাঁটির অভাব ছিল। ইংরেজদের তুলনায় তাহাদের দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গদেশে উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি কম ছিল। (৪) দেশীয় রাজন্যবর্গের অনিশ্চিত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ফরাসীরা ভুল করিয়াছিল। (৫) ফরাসীদের মধ্যে সংহতির অভাব ছিল। লালী, বুসী প্রভৃতি সেনাপতিদের সহিত পণ্ডিচেরী কাউন্সিলের মতানৈক্য লাগিয়া থাকিত। ফলে কর্মদক্ষতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। (৬) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অপেক্ষা ফরাসী কোম্পানীর সাংগঠনিক দুর্বলতাও ব্যর্থতার কারণ ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গদেশে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধি

আলিবর্দী ইংরেজ কোম্পানীর বাড়াবাড়ি স্বীকার করেন নাই। তিনি তাহাদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলার আমলে ইংরেজ বণিকগণ যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা বিস্তার করিতে থাকে। ফলে সিরাজের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

ইংরেজ বণিকদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী

আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) ছিলেন দূরদর্শী শাসক। তাঁহার আমলে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের অধীনে মারাঠা বর্গীরা বারংবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা বাংলার উপর এই আক্রমণ চালাইত। মারাঠা সর্দার ভাস্কর পন্ডিতকে সুবর্ণরেখা নদীতীরে দাঁতনের নিকট ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। তাহার পর হইতে মারাঠা শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। যাহা হউক, আলিবর্দী প্রথমে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বর্গী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তথাপি দুর্ধর্ষ মারাঠা আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন তথাপি দুর্ধর্ষ মারাঠা আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাৎসরিক বারলক্ষ টাকা চৌথ এবং উড়িষ্যার একাংশের রাজস্ব ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধি করেন। আলিবর্দী বুঝিতে পারিয়াছিলেন জলে ও স্থলে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু হইয়াছে। নৌবলে বলীয়ান ইংরেজগণ এবং স্থল শক্তিতে দুর্ধর্ষ মারাঠা বর্গীরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতেছে। এক্ষেত্রে তাঁহাকে ইংরেজদের না চটাইয়া কৌশলে বাংলার স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে বর্গী হাঙ্গামা

বর্গীদের সহিত সন্ধি

আলিবর্দী খাঁ ছিলেন অপুত্রক। তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অপর দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন ঘষেটি বেগম। তাঁহার সহিত ঢাকার শাসনকর্তার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান ছিল না এবং স্বামী মারা গিয়াছিলেন। মধ্যমা ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পত্নী। নবাব আলিবর্দীর ইচ্ছানুসারে সিরাজ সিংহাসনে বসিলেন। ঘষেটি বেগম এবং পূর্ণিয়ার শাসক সৌকত জঙ্গ সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। সিরাজ ছিলেন তখন মাত্র তেইশ বৎসরের যুবক। মাতামহের

সিরাজ-উদ্-দৌলাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন

অত্যধিক স্নেহে লালিত। রাজনৈতিক কোন প্রকার অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। শাসনকার্যে দক্ষতা দেখাইতে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে তিনি পারেন নাই, ফলত চক্রান্তকারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। চক্রান্তকারীদের সহিত হাত মিলাইল সুযোগ সন্ধানী বণিকগণ। ইউরোপীয় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া তাহারা বঙ্গদেশে দুর্গ নির্মাণ করিলে সিরাজ-উদ্-দৌলা তাহাদের প্রতি প্রথম হইতেই রুষ্ট হন। তাহা ছাড়া (১) তাহারা সিরাজের সিংহাসনারোহণের সময় নূতন নবাবের নিকট কোন উপঢৌকন না পাঠাইয়া চিরাচরিত রীতি অমান্য করিয়াছিল। (২) সিরাজের বিরুদ্ধাচারিনী ঘষেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এবং রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়া তাহারা নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। (৩) ঘষেটি বেগম এবং রাজবল্লভ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত তাহারা চক্রান্তে জড়িত ছিল। এই সমস্ত কারণে এবং দুর্গ নির্মাণ ব্যাপারে সিরাজ তাহাদের বাধা দিলেন। ফরাসী বণিকগণ নবাবের আদেশে দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করিল। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ বন্ধ করিল না। তাহা ছাড়া, নবাবের আদেশে কৃষ্ণদাসকেও তাহারা সমর্পণ করিল না। নবাব তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া প্রথমে কৌশলে ঘষেটি বেগমকে নিজ প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। ইংরেজগণ ইহাতে ভয় পাইল। অতঃপর সিরাজ অপর চক্রান্তকারী সৌকত জঙ্গকে দমন করিবার জন্য পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সুযোগে ইংরেজ গভর্ণর ড্রেক নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া দুর্গ নির্মাণ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতার ইংরেজ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করিলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া ফলতায় আশ্রয় লইল। এই দুর্গ দখলকালে অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole tragedy) নামক কাহিনী হল্ওয়েল নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী বর্ণনা করিয়াছেন। ক্লাইভ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন। ক্লাইভ, উমিচাঁদ এবং মীরজাফরের মধ্যে গোপন সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল, স্থির হইল মীরজাফর নবাব হইবেন। ক্লাইভ পাইবেন প্রভূত অর্থ ও ইংরেজ কোম্পানীর জন্য সুযোগ-সুবিধা। আর উমিচাঁদ পাইবেন অর্থ ও রাজদরবারে প্রতিপত্তি। এইভাবে দেশী ও বিদেশী লুঠেরা বাংলা লুঠ করিবার জন্য নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

সিরাজের সহিত ইংরেজ বণিকগণের সংঘর্ষের কারণ

ভাগ্যদেবী সিরাজের প্রতি বিরূপা। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি চারিত্রিক সমস্ত দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি ষড়যন্ত্রের কথায় তেমন কর্ণপাত করিলেন না। ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখিলেন না। মীরজাফরকে সন্দেহ করিয়া বন্দী পর্যন্ত করিলেন না। বিপদের কালো মেঘ বাংলার ভাগ্যাকাশ ছাইয়া ফেলিল। হতভাগ্য সিরাজ বিনা দ্বিধায় চক্রান্তকারী মীরজাফরকে বিশ্বাস করিয়া সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার দিলেন।

সিরাজের দুর্বলতা

ক্লাইভ নামে মাত্র অজুহাত পাইয়াই সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভারত-ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় দিন। ভাগীরথী তীরে পলাশীর আম্রকুঞ্জে ক্লাইভ সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সিরাজের বিরাট সৈন্যবাহিনী বিশ্বাসঘাতক এবং ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর ও রায়দুর্লভের নির্দেশে যুদ্ধ করিল না। মীরমদন ও মোহনলাল অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইংরেজ বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আকস্মিকভাবে মীরমদনের মৃত্যু হইল। নবাব অবস্থার কথা বুঝিতে পারিয়া মীরজাফরের নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু মীরজাফর সিরাজের আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। মীরজাফর একমাত্র বীর যোদ্ধা মোহনলালকেও যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। ইংরেজরা প্রায় বিনা যুদ্ধেই জয়লাভ করিল। সিরাজ ফরাসীর সাহায্য লাভের আশায় ভাগলপুর অভিমুখে পলায়নের চেষ্টা করিয়া রাজমহলে ধৃত হইলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে আনা হইল। চূড়ান্ত অপমান করা হইল। মীরজাফরের পুত্র মীরনের ছুরিকাঘাতে বন্দী সিরাজের মৃত্যু হইল। পলাশীর প্রান্তরে ভারতের শেষ স্বাধীনতা রবি অস্তমিত হইল।

পলাশীর যুদ্ধ, ২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ

ক্লাইভের বিনা যুদ্ধে জয়লাভ

পলাশীর যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। পলাশীর প্রান্তরে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে একটি বিপ্লব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন একটি স্বাধীন দেশের ইতিহাসের পাতায় যবনিকা পাত হইল, অপরদিকে তেমনি বাংলায় ভারতে তথা ইংরেজ কর্তৃত্ব বা আধিপত্য স্থাপনের ইতিহাসের সূচনা হইল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজকোষের যথাসর্বস্ব অর্থের বিনিময়ে মীরজাফর বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন। একমাত্র শূন্য সিংহাসন ভিন্ন মীরজাফরের ভাগ্যে আর কিছুই জুটিল না। শূন্য রাজকোষ আর হৃতশক্তি মীরজাফর তখন সম্পূর্ণরূপে সকল দিক দিয়া ইংরেজ শক্তির উপর নির্ভরশীল। ফলে অতি সহজেই ইংরেজ শক্তি বাংলার রাজধানীতে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইল। মীরজাফরের সমস্ত ক্ষমতা এখন হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। অবশ্য পরবর্তী যুগের ইতিহাসে যখন মীরজাফরের পরিবর্তে মীরকাশিম বাংলার নবাব হইয়াছিলেন তখন স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতায় মীরকাশিম সাময়িকভাবে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বা মতানুযায়ী রাজ্য পরিচালনা কার্যে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে থাকেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ছিল নিতান্ত সাময়িক।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হইলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। কাজেই পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকগণ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে একমাত্র নিয়ন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল। কবির কথায়—"বণিকের মানদন্ড দেখা দিল রাজদন্ডরূপে পোহালে শর্বরী।"

মীরজাফর : দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের তালিকায় মীরজাফরের নাম ইতিহাসের পাতায় চিরদিনের জন্য কালিমালিপ্ত। এই বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যেই তিনি বাংলার মসনদ লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু নীচতা বা হীনতার দ্বারা কোনদিন মহৎ ফল লাভ করা যায় না—এই সত্য মীরজাফর উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই সিংহাসনের পরিবর্তে ইংরেজ কোম্পানিকে প্রতিশ্রুত অর্থদান করিতে গিয়া তিনি তাঁহার আর্থিক রাজনৈতিক, সামরিক তথা আত্মিক সকল ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া ইংরেজদের হস্তে খেলার পুতুলে পরিণত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মত হীনচেতা লোকের পক্ষেও বেশীদিন ইংরেজদের প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব সহ্য করা সম্ভব হইল না, রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে ইংরেজদের সর্বত্র হস্তক্ষেপ ও নানা অজুহাতে অর্থের দাবি মীরজাফরকে শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তিনি ইংরেজদের বিতাড়িত করিবার জন্য গোপনে ওলন্দাজ বণিকদের সহিত ষড়যন্ত্র শুরু করিলে ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া বিদরের যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহাদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দিলেন। ফলে ইংরেজগণ নিরংকুশ ক্ষমতা লাভ করিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেও ভ্যান্সিটার্ট বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলে ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র এবং প্রাপ্য অর্থ না মিটাইবার অজুহাতে তিনি মীরজাফরকে মসনদচ্যুত করিতে চাহিলেন। সেই সময় অর্থের বিনিময়ে বাংলার মসনদে নূতন নূতন নবাবকে প্রতিষ্ঠিত করা ইংরেজদের একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরকে মসনদচ্যুত করিয়া ইংরেজ সরকার প্রভূত অর্থের বিনিময়ে মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসাইলেন।

ওলন্দাজগণের সঙ্গে মীরজাফরের ইংরেজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত

মীরকাশিম : যদিও প্রভূত অর্থের বিনিময়ে মীরকাশিম ইংরেজদের নিকট হইতেই বাংলার মসনদ লাভ করিয়াছিলেন তবুও সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পর হইতেই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হইল ইংরেজ প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করার। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল অসীম। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম

এই তিনটি জেলা ইংরেজদের পারিতোষিক হিসাবে যাবতীয় প্রাপ্যের বিনিময়ে মিটাইয়া দিলেন। যাহাতে পাওনাদারের ভূমিকা লইয়া ইংরেজগণ আর হস্তক্ষেপ করিতে না পারে। অতঃপর ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি একথা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরেজদের সহিত দীর্ঘকাল মিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সেইজন্য তিনি মার্কার ও সামরু নামক দুইজন ইউরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। গুর্গিন খাঁ নামক জনৈক আর্মেনিয়াবাসীকে তাঁহার গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই সময় গুর্খা রাজা পৃথিবীনারায়ণ মকানপুর রাজ্যটি জয় করিয়া সেখানকার রাজা বিক্রমসেনকে বন্দী করিলে তাঁহার মিত্র জনৈক সামন্তরাজ মীরকাশিমের সাহায্য প্রার্থনা করিলে মীরকাশিম ও গুর্গিন খাঁ তাঁহাকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইয়া শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। এই সময় ইংরেজদের সহিত মীরকাশিমের বাণিজ্যিক স্বার্থ লইয়া সংঘাত উপস্থিত হইল।

ইংরেজ প্রভুত্বমুক্ত হইবার চেষ্টা

ইংরেজগণ শুল্ক ফাঁকি দিয়া দেশীয় বণিকদের অপেক্ষা স্বল্প দামে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করায় দেশীয় বণিকরা ইংরেজ বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এ বিষয়ে মীরকাশিম ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দেশীয় বণিকদের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেব পাটনা শহর দখল করিয়া বসিলেন। মীরকাশিম পাটনা পুনর্দখল করিয়া ইংরেজ কুঠি ভাঙ্গিয়া দিলে ইংরেজের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ হইল। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইংরেজদের সহিত বক্সারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষেরই জয় হইল। মীরকাশিম পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। শাহ আলম ও সুজা-উদ্-দৌলা ইংরেজদের হাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

শুল্কগত বিরোধ

ঘেরিয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়

দেশাত্মবোধ স্বাধীনচিত্ততা দূরদর্শিতা প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইয়াও মীরকাশিম কেবল ভাগ্যের বিপর্যয়ে ও তৎকালীন পরিস্থিতির প্রভাবে শেষ পর্যন্ত বাংলার মসনদ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তবু সিরাজের পরবর্তী যুগে সেই মেরুদণ্ডহীনতা ও ক্লীবতার যুগে বাংলার মসনদে প্রকৃত সৎ ও স্বাধীন উদ্দেশ্য লইয়া মীরকাশিম আসিয়াছিলেন বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আশায়। কিন্তু সেদিন ইতিহাসের গতি অন্যদিকে, তাই তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হইল। সকল দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মীরকাশিমই ছিলেন বাংলাদেশের সর্বশেষ স্বাধীন নবাব।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্রুত ক্ষমতা বিস্তার ঘটিতে থাকে। পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত আট বৎসরের মধ্যে (১৭৫৭ খ্রীঃ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে মাত্র 'নবাব ক্লাইভের মীরজাফরের নিকট হইতে এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসানো পুরস্কার স্বরূপ যথাক্রমে কলিকাতার ইজারা, প্রভূত ধনসম্পদ এবং চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের রাজস্ব আদায় অধিকার (দেওয়ানী) লাভ তাহারা ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন সুরম্যানকে সম্রাট ফারুরূশিয়ার প্রদত্ত ফরমানের পূর্ণ সুযোগ সদ্ব্যবহার করে এবং মীরজাফরের নিকট হইতেও নতুন অধিকার লয়।

ফারুকশিয়ার প্রদত্ত সনন্দ অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরেজদের একতরফা সুবিধাদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরবর্তী নবাবদের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করে। মুর্শিদকুলীর মত সুজাউদ্দিন এবং আলিবর্দী খাঁও ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ তথা শক্তি বৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেন। আলিবর্দী মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের জন্য ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলিকে ব্যবসায়ের সুযোগ দান করিলেও তাহাদের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। (পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের দুর্গ নির্মাণের বিরোধিতা করেন। পরবর্তী নবাব আলিবর্দীর দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজত্বকালে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত দীর্ঘদিনের বিবাদ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয় এবং পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি প্রস্তুত হয়।

প্রাক্-পলাশীর যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলী, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, তামাক, লবণ, চিনি, গন্ধক প্রভৃতি পণ্যের বাণিজ্য করিত। বস্তুতপক্ষে ১৭০৮ হইতে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানি বঙ্গদেশের পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া আর্থিক আয়বৃদ্ধি ঘটাইয়াছিল। বাংলার সুতীবস্ত্র মধ্য প্রাচ্যে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত ইংরেজদের মাধ্যমে। ঢাকার মসলিন বস্ত্রের ইউরোপে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংরেজ কোম্পানি বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে সম্পদ নির্গমনের ফলে (Drainage of wealth) এদেশের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল। এই অবস্থাকে বলা হয় "প্রাচ্যের শোণিতে ইউরোপের আর্থিক সমৃদ্ধি"।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব করিয়া ইংরেজরা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। তাহারা প্রথম হইতেই সিরাজের প্রতি নানারূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে থাকে। তাহারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় আশ্রয়দান ও বিচারের জন্য তাহাকে নবাবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করে। তাহারা ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ শুরু করে নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও। তাহারা চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নবাবের সিংহাসনে বসিবার পর সৌজন্যমূলক কোন উপঢৌকন পাঠাইয়া সম্মান জানায় নাই। ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে ওয়াটসন এবং ধুরন্ধর রবার্ট ক্লাইভ মাদ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহার মাসী ঘষেটি বেগম ও তাঁহার অনুগামীদের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগদান

মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীদের প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ক্লাইভ সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বিনা যুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকতার সাহায্যে সিরাজকে পরাভূত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া শুধু যে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইলেন তাহাই নহে, মীরজাফরের ন্যায় মেরুদণ্ডহীনকে নবাব করিয়া ইংরেজ শক্তির হাতে খেলার পুতুল করিয়া রাখিলেন। "ক্লাইভ গর্দভ" মীরজাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ছাড়িয়া দিলেন। অবাধ বাণিজ্যের অধিকার মানিয়া লইলেন। ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। তবে তখনও পর্যন্ত ইংরেজদের আইনগত ক্ষমতা ছিল না। তাহারা রাজা সৃষ্টি করিতে পারিত কিন্তু নিজেরা রাজত্ব করিতে পারিত না। সিংহাসনের পশ্চাতে থাকিয়া নিয়ন্ত্রণ করিত। ক্লাইভের ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধিতে বিরক্ত হইয়া মীরজাফর যখন ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে চাহিলেন, ক্লাইভ বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করিয়া শাস্তিস্বরূপ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশিমের নিকট হইতে পুনরায় বহু অর্থের বিনিময়ে বাংলার মসনদ দান করিলেন। এই সময় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ও তাহার ফলাফল

পলাশীর যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের একটি প্রহসন মাত্র ছিল; কিন্তু বক্সারের যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তি সুনিশ্চিতভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্লাইভের পক্ষে দেওয়ানী লাভ করা সম্ভব হইল। ইংরেজ শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা

ভাস্কো-দা-গামা ক্লাইভ

সিরাজ-উদ-দৌলা মীরজাফর

লাভের ক্ষেত্রে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালের নবাবগণ বৃত্তিভোগী নামে মাত্র শাসক ছিলেন; রাজস্বক্ষমতা ছিল কোম্পানীর

হস্তে। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর হইয়া আসিয়া একদিকে কোম্পানীর শাসন সংস্কার ও দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা কার্যে অন্যদিকে কোম্পানীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সর্বতোভাবে প্রয়াসী হইলেন।

শাহ্ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানী-প্রাপ্তি

বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানীর গভর্ণর ক্লাইভ অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার নিকট হইতে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ এবং প্রচুর অর্থ উপঢৌকন হিসাবে গ্রহণ করিলেন এবং মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ এই দুইটি স্থান ছাড়িয়া দিয়া বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের পরিবর্তে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। বাংলার নবাব নিজাম-উদ্-দৌলা তাঁহার ব্যক্তিগত ও শাসনকার্য চালাইবার জন্য কেবল বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন স্থির হইল। এইভাবে ক্লাইভ বাংলাদেশে কোম্পানীর রাজনৈতিক অধিকার তথা সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানীর আইনগত রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। দেওয়ানী প্রাপ্তির ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আইনগত ক্ষমতা হস্তগত করিল। ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে এক চমৎকার কূটকৌশলের পরিচয় দিলেন। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা ইতিহাসে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই সময়ে ইংরেজদের পক্ষে সরাসরিভাবে রাজস্ব আদায়ের অসুবিধা ছিল এই যে, প্রথমতঃ ইংরেজদের প্রদেশের রাজস্ব আদায় ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না ; দ্বিতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানীর হাতে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ভার থাকিলে ইউরোপের অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষার ও সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। সেইজন্য ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব ও বিচারের ক্ষমতা রাখিলেন নবাবের হাতে, আর রাজস্ব ব্যয় করার ক্ষমতা থাকিল স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে। ফলে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব রহিল নবাবের, আর কোম্পানীর রহিল দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭ খ্রীঃ)

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করিবার পর হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক শক্তিরূপে ক্ষমতা বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পর মারাঠা, মহীশূর প্রভৃতি প্রতিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে তাহারা সাম্রাজ্যবাদী অভিযান চালনা করিয়া রাজ্যবিস্তার করিতে প্রয়াসী হয়। ক্লাইভ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কার্টিয়ার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর হন। তারপর ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর হইয়া আসিয়া পুরাপুরিভাবে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং রাজ্যবিস্তার করিবার নীতি গ্রহণ করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বণিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোম্পানি যখন একবার রাজশক্তির অধিকারী হইয়াছে, তখন তাহাকে আরও শক্তিশালী হইতে হইবে এবং রাজ্যবিস্তার করিতে হইবে। ইংলন্ডে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ তখনও বার বার ব্রিটিশ অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিতেছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ডাইরেক্টরদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করা। ওয়ারেন হেস্টিংস দেখিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করিতে হইলে দেশীয় নৃপতিগণকে যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে। অষ্টাদশ শতকে কোম্পানীর রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী পথিকৃৎরূপে চিহ্নিত। তাঁহার প্রধান সমস্যা ছিল ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তে মারাঠাদের দমন করা।

হেস্টিংসের নীতি

(ক) **ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক :** মারাঠাগণ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট শাহ আলমকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। মুঘল সম্রাট মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছেন দেখিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস সম্রাটকে দেয় অর্থ দিতে অস্বীকার করিলেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত বারাণসীর চুক্তি করিয়া হেস্টিংস পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কারা ও এলাহাবাদ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। আরও স্থির হইল যে অযোধ্যার নবাব প্রয়োজনমত কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর সহায়তা পাইবেন। নবাব তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন। হেস্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা শক্তিকে রোধ করিবার জন্য অযোধ্যাকে 'মধ্যবর্তী রাজ্য' (buffer State) হিসাবে সৃষ্টি করা, যাহাতে আক্রমণের প্রথম ধাক্কা অযোধ্যাকে সামলাইতে হয়।

অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি

মারাঠাগণ শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রোহিলখন্ড আক্রমণ করিল। রোহিলা সর্দারের পুত্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা-উদ্-দৌলার রাজ্য অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। অযোধ্যার নবাব মারাঠাগণ কর্তৃক রোহিলখন্ড আক্রান্ত হওয়ায় অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত দেশে সৈন্য মোতায়েন করিলেন। রোহিলাদের সহিত সুজা-উদ্-দৌলার সদ্ভাব ছিল না। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের চেষ্টায় সুজা-উদ্-দৌলা ও রোহিলাদের মধ্যে এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। স্থির হইল, অযোধ্যার নবাব মারাঠাদের রোহিলখন্ড হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলে ৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবেন। রোহিলা এবং অযোধ্যার নবাবের যুগ্মবাহিনী মারাঠাগণকে রোহিলখন্ড হইতে বিতাড়িত করিল। ওয়ারেন হেস্টিংস রোহিলখন্ড অধিকার করিতে অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করিবার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ আদায় করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে চির নিন্দনীয় হইয়াছেন।

রোহিলা যুদ্ধ

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ মাদ্রাজের গভর্ণরের মারাঠাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের জন্য প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ইংরেজরা রঘুনাথ রাওকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার সহিত সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির দ্বারা ইংরেজরা সল্‌সেট ও ব্যাসিন নামক দুইটি স্থান এবং কিছু অর্থ পাইলেন। ইংরেজ বাহিনীর সাহায্যে তাঁহাকে পুনার সিংহাসনে বসাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বোম্বাই কাউন্সিল এই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে রঘুনাথ রাও ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। নানা ফড়নবীশ নারায়ণ রাওয়ের শিশু পুত্রকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রঘুনাথ রাও বাধ্য হইয়া ইংরেজদের শরণাপন্ন হইলেন।

সুরাটের সন্ধি

ইংরেজ বাহিনী সলসেট অধিকার করিল এবং রঘুনাথকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতা কাউন্সিল বোম্বাই সরকারের এইরূপ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা করিলেন ; কারণ রেগুলেটিং আইনানুসারে বাংলার গভর্ণরকে মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

বোম্বাই কাউন্সিলের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অমান্য

কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেরিত কর্ণেল আপটন মারাঠাদের সহিত পুরন্দরের সন্ধি

স্বাক্ষর করিলেন। বোম্বাই কাউন্সিলের দ্বারা সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষর করা হেস্টিংস ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন না করিলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী বোম্বাই কাউন্সিলকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাহা হউক, কলিকাতা কাউন্সিলের পরামর্শে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী বোম্বাই সরকার রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সলসেট ইংরেজদের অধিকারে রহিল। রঘুনাথ রাওকে উপযুক্ত ভাতাদানের ব্যবস্থা করা হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর ক্ষতিপূরণ মারাঠাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরস্ সুরাটের সন্ধি সমর্থন করিলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। বোম্বাই সরকার পুর্ণোদ্যমে রঘুনাথ রাও-এর সমর্থনে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে মারাঠাদের হস্তে ইংরেজদের পরাজয় ঘটিল। ইংরেজ পক্ষকে ওয়াড়গাঁও (Wargaon)-এর সন্ধি দ্বারা রঘুনাথ রাওকে মারাঠাদের নিকট সমর্পণ করিতে, মারাঠা রাজ্যে অধিকৃত সমস্ত স্থান প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইতে হইল। ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি ব্রিটিশদের মর্যাদায় চরম আঘাত হানিল। হেস্টিংস এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি গোর্ডার্ডকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আহমেদাবাদ এবং ব্যাসিন দখল করিলেন। কিন্তু পরের বৎসর পুনার নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটিল। ইতিমধ্যে হেস্টিংসের চেষ্টায় সিপ্রির যুদ্ধে সিন্ধিয়া পরাজিত হইলেন। এই সমস্ত সাফল্যের ফলে ইংরেজদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হইল। মাহাদজী সিন্ধিয়া ইংরেজদের সহিত মিত্রতা স্থাপনে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে সলবই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে নাবালক মাধবরাও নারায়ণ পেশওয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। রঘুনাথ রাও বা রাঘোবাকে উপযুক্ত ভাতাদানের ব্যবস্থা করা হইল। সিন্ধিয়া যমুনা নদীর পশ্চিম তীরস্থ যাবতীয় স্থান ফেরত পাইলেন। সলসেটের উপর ইংরেজ অধিকার বজায় রহিল। এই সন্ধির দ্বারা ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত না হইলেও তাহাদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। এই যুদ্ধের পর প্রায় বিশ বৎসর কাল মারাঠাদের সহিত ইংরেজদের শান্তি বজায় ছিল।

পুরন্দরের সন্ধি

ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি

ইংরেজদের জয়লাভ

সলবই-এর সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ)

ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক—দ্বিতীয় পর্যায়

কর্ণওয়ালিস ও মারাঠাগণ : ওয়ারেন হেস্টিংস হায়দর আলি ও মারাঠা শক্তির হাত হইতে ব্রিটিশ স্বার্থকে রক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহার নিরাপত্তা বিধানের কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সলবই-এর সন্ধির পর মারাঠা শক্তির সহিত দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া মোটামুটি ইংরেজদের একটি শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধই স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু মনে মনে মারাঠাগণ ইংরেজদের প্রতি শত্রুভাবাপন্নই রহিয়া গিয়াছিল কর্ণওয়ালিসের সময় পিটের ভারত আইনের শর্তানুযায়ী দেশীয় রাজাদের সহিত কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্যই কর্ণওয়ালিস শাহ্ আলমের পুত্রকে দিল্লীর সিংহাসন লাভে সাহায্য করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু ভারতের তৎকালীন অবস্থায় নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণ করা সম্ভব ছিল না, কর্ণওয়ালিস টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি শক্তিসংঘ স্থাপন করিলেন। কর্ণওয়ালিস মারাঠাদের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিলেও ব্রিটিশের অধীন মিত্রশক্তি অযোধ্যা রাজ্যে মাহাদজী সিন্ধিয়া যাহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন সেইজন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়।

কর্ণওয়ালিসের সহিত মারাঠাদিগের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক

স্যার জন শোরের মারাঠা নীতি : কর্ণওয়ালিসের পর ভারতে গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন স্যার জন শোর। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ নিজামের রাজ্য আক্রমণ করিলে নিজাম পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু জন শোর তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোনরূপ সাহায্য করিলেন না। ফলে, খরদার যুদ্ধে মারাঠাদের হাতে নিজামের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। ইংরেজদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ নিজাম স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হইয়া ফরাসীদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্যার জন শোরের নিরপেক্ষতার নীতি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ : খরদার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মারাঠাগণ হায়দরাবাদের অনেকাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়। ইহার অল্পদিন পরে পেশওয়া মাধব রাও নারায়ণের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশওয়া হইলেন। সেই সময় পুনায় মারাঠাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিলে নানা ফড়নবীশকে কারারুদ্ধ করা হয়। নানা ফড়নবীশ একদিকে মারাঠা রাজ্যের বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন; অপরদিকে সংহতি সাধন করিয়াছিলেন হায়দরাবাদের নিজাম তাঁহার পতনের সুযোগ লইয়া হৃত রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করেন। মারাঠা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে

নানা ফড়নবীশের পতনের পর মারাঠাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ

যে স্বার্থপর দলাদলি ও গোলযোগ দেখা দিয়াছিল তাহা দমন করিবার ক্ষমতা পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ছিল না। ফলে মারাঠা শক্তি ক্রমশঃ অবনতির মুখে চলিয়াছিল।

লর্ড ওয়েলেসলী ও মারাঠাগণ ঃ পরবর্তী গভর্ণর লর্ড ওয়েলেসলীর সময় পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, যশোবন্ত রাও, হোলকার ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া সকলকে মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইবার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলেন। ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলত রাও যুগ্মভাবে দ্বিতীয় বাজীরাওকে পুনায় আক্রমণ করিলে তিনি পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। যশোবন্ত রাও দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ভ্রাতা অমৃতরাওকে পেশওয়া পদে অধিষ্ঠিত করিয়া নিজেই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। এই মিত্রতা চুক্তি ব্যাসিনের চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির ফলে যদিও দ্বিতীয় বাজীরাও তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবুও এই চুক্তির ফলে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশওয়াতন্ত্রের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের নিকট এই আত্মমর্যাদাহীন চুক্তি অত্যন্ত অপমানজনক মনে হইলে তাঁহারা ব্যাসিনের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পেশওয়াতন্ত্রকে পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। অস্থিরচিত্ত ও আত্মমর্যাদাহীন দ্বিতীয় বাজীরাও গোপনে মারাঠা নেতাদের সমর্থন করিলেন। বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য এই যুদ্ধ প্রস্তুতিতে যোগ দিলেন না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়া-ভোঁসলের যুগ্মবাহিনী নিজামের রাজ্যসীমায় পৌঁছিলে ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে খ্যাত। ওয়েলেসলীর ভ্রাতা সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলীর ও সেনাপতি লেক্-এর নেতৃত্বে অসই-এর যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের যুগ্মবাহিনী শোচনীয়রূপে পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিন্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধ-পক্ষ ত্যাগ করিল। ভোঁসলে একাই তখন যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে ওয়াড়গাঁও-এর যুদ্ধে ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইয়া দেবগাঁও-এর সন্ধি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইলেন ও নিজ রাজ্যের কতকাংশ ইংরেজদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে সেনাপতি লেক্ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে ইংরেজদের রক্ষণাধীনে আনেন।

দ্বিতীয় বাজীরাও-এর অধীনতামূলক মিত্রতানীতি আনুগত্য

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

ওয়াড়গাঁও-এর যুদ্ধ এবং দেবগাঁও-এর সন্ধি

সিন্ধিয়া পুনরায় সেনাপতি লেকের হস্তে লাসওয়ারা নামক স্থানে পরাজিত হইয়া সুরয-অর্জুনগাঁও-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহার রাজ্যের বিরাট একটি অংশ ও কতিপয় দুর্গ ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং পৃথক একটি চুক্তি দ্বারা ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন।

সুরয-অর্জুন গাঁও-এর সন্ধি (১৮০৩ খ্রীঃ)

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যেই শুধু বৃদ্ধি পাইল না তাহার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও গৃহীত হইল এবং সিন্ধিয়ার নিকট জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি রাজ্য দখল করার পর ভরতপুর, বুন্দী প্রভৃতি রাজ্যও ব্রিটিশের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

যুদ্ধের ফলাফল

হোলকার গোড়ার দিকে ইংরেজদের সহিত নিষ্ক্রিয় আচরণ দেখাইলেও পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ইংরেজদের সহিত মিত্রতাবন্ধ রাজ্যগুলি আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়েলেসলী সঙ্গে সঙ্গে হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে হোলকারের সহিত ভরতপুরের রাজা যোগ দিলেন। তাঁহাদের যুগ্মবাহিনী দিল্লী আক্রমণ করিলে 'দিগ' নামক স্থানে ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হইল। কয়েকদিন পরে হোলকারের নিজস্ব একদল সৈন্যবাহিনী ইংরেজ জেনারেল লেকের হস্তে পরাজিত হইল। ভরতপুরের রাজা ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁহাকে ২০ লক্ষ টাকা দিতে হইল। ইহার পর মিত্রহীন হোলকারকে আক্রমণ করিবার জন্য ওয়েলেসলী যখন প্রস্তুত এমন সময়ে ওয়েলেসলীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ডাক পড়িলে হোলকার রেহাই পাইলেন।

হোলকার ও ওয়েলেসলী

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতন : ব্যাসিনের সন্ধির পর পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও একপ্রকার ইংরেজদের অধীনই হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিম্বকজী নামে পরম দেশহিতৈষী ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এক মন্ত্রীর সহায়তায় তিনি নিজেকে ইংরেজ প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। ত্রিম্বকজী হোলকার-সিন্ধিয়া-ভোঁসলে-পেশওয়ার মৈত্রীর ব্যবস্থা করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। এদিকে বরোদার গাইকোয়াড়ের সঙ্গে পেশওয়ার প্রাপ্য অর্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গাইকোয়াড়ের দেওয়ান পুনায় উপস্থিত হইলে ত্রিম্বকজী তাঁহাকে বন্দী ও হত্যা করান, ফলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বা প্রতিনিধি এলফিনস্টোন ত্রিম্বকজীকে বন্দী করেন। কিন্তু বন্দিদশায় ত্রিম্বকজী পলাইয়া গিয়া পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ইংরেজ অধীনতাপাশ হইতে মুক্তির চেষ্টা

ত্রিম্বকজী

এলফিন্‌স্টোন খবর পাইয়া পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে মারাঠা রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে, মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে এবং ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে কোন বহিঃশক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপন না করিবার জন্য বাধ্য করিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। ত্রিম্বকজীর পর পেশওয়ার মন্ত্রী হইয়াছিলেন গোক্‌লা। তদানীন্তন ইংরেজ গভর্ণর লর্ড ময়রা যখন পিণ্ডারি দমনে ব্যস্ত, সেই সময় গোক্‌লা সুযোগ বুঝিয়া পুনা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য কোম্পানিকে জানাইলেন। তাঁহার চেষ্টায় পুনরায় হোলকার-সিন্ধিয়া-ভোঁসলে প্রভৃতি মারাঠা নেতাদের সাহায্যে মারাঠা জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময় পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর নির্দেশে পুনার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এলফিন্‌স্টোনের বাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইলে এলফিন্‌স্টোন কোনক্রমে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ সৈন্য পুনা আক্রমণ করিলে, দ্বিতীয় বাজীরাও পুনা ছাড়িয়া পলায়ন করিলে পুনা ব্রিটিশ সৈন্যের দখলে চলিয়া যায়। পেশওয়া পুনা পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ভোঁসলে-গদিয়ান আপ্পাসাহেব এবং হোলকার ইংরেজ রেসিডেণ্টের ঘাঁটি আক্রমণ করিতে যাইয়া ব্যর্থ হইলেন। পরাজিত হোলকার ইংরেজদের সহিত চুক্তিবন্ধ হইয়া নিজ ব্যয়ে ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন রাখিতে রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজদের ত্যাগ করিতে এবং ইংরেজের বিনা অনুমতিতে অন্য রাজ্যের সহিত যোগাযোগ না রাখিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর পেশওয়ার ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর রহিল না। মন্ত্রী গোক্‌লা ইতিপূর্বে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। মারাঠা শক্তিপুঞ্জের অস্তিত্ব একপ্রকার বিলীন হইয়া গেল। পেশওয়াকে একেবারে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে লর্ড ময়রা বার্ষিক আশী লক্ষ টাকা ভাতা দিয়া কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হইল। মারাঠাদের অসন্তোষ যাহাতে প্রশমিত হয় সেইজন্য কূটকৌশলে ইংরেজগণ শিবাজীর এক বংশধরকে সাতারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হইল। ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডাক এবং এলফিন্‌স্টোন (পুনার ভূতপূর্ব রেসিডেণ্ট) এই রাজ্যের শাসন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভোঁসলা রাজ্যের একাংশও ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া গেল। এইভাবে একদা শক্তিশালী মারাঠা রাষ্ট্রবর্গকে ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীন আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মারাঠা শক্তির চিরতরে পতন ঘটিল।

গোক্‌লা পেশওয়ার মন্ত্রী

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী

(খ) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মহীশূরের সহিত সম্পর্ক : প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : দাক্ষিণাত্যে মহীশূর রাজ্যের অভ্যুত্থান একটি স্মরণীয় ঘটনা। হায়দর আলি নামে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীর ব্রিটিশ ও মারাঠা শক্তির সম্মুখে একটি বিরাট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। মহীশূরের হিন্দু রাজার অধীনে চাকরি করিতেন। দাক্ষিণাত্যের গোলযোগের সুযোগ লইয়া তিনি মহীশূরের সিংহাসনে বসেন। সেইজন্য মারাঠাগণ প্রথমে মহীশূরের হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গুটি ও সাবনুর নামক স্থান দুইটি এবং বহু ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিয়াছিল। পরের বৎসর নিজাম ইংরেজদের সাহায্যে মহীশূর আক্রমণ করিলে হায়দর কৌশলে নিজামকে সপক্ষে টানিয়া আনিলেন। কিন্তু নিজাম তাঁহাকে অল্পদিনের মধ্যে ত্যাগ করিলেন। হায়দর আলি একাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মাদ্রাজ সরকারকে পর্যুদস্ত করিয়া তুলিলেন। ফলে মাদ্রাজের সন্নিকটে ইংরেজ ও হায়দরের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। উভয়পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থান ও যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ করিল। কিন্তু ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করিলে মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া হায়দরকে কোন সাহায্য দিলেন না। হায়দর এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

প্রথম মহীশূর যুদ্ধ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : ইতিমধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফরাসীরা বিদ্রোহী আমেরিকানদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এই সূত্রে ভারতে ইংরেজগণ ফরাসী-অধিকৃত মাহে বন্দরটি দখল করিয়া লইল। মাহে ছিল মহীশূর রাজ্যের ভিতরে। হায়দর আলি স্বভাবতঃই এইজন্য ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হইলেন। এই সময় নিজাম মারাঠাদের সহিত একটি ইংরেজ-বিরোধী মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। হায়দর তাহাতে যোগ দিয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমে ইংরেজ পক্ষ হায়দরের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে হেস্টিংস স্যার আয়ার কূটকে হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কূটকৌশলে তিনি নিজাম, বেরার রাজা ও মাহাদজী সিন্ধিয়াকে ইংরেজ-বিরোধী শক্তিজোট হইতে পৃথক করিয়া লইলেন। মিত্রবর্গ তাঁহাকে ত্যাগ করার ফলে একক হায়দরের পরাজয় ঘটিল। কিন্তু

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হায়দরের স্বনামধন্য পুত্র টিপু সুলতানের হাতে অপর একটি ইংরেজ বাহিনীর পরাজয় ঘটিল। তাহা ছাড়া, ফরাসীরা হায়দরের সাহায্যের জন্য একটি নৌ-বাহিনী পাঠাইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় হায়দরের মৃত্যু ঘটিল। হায়দরের সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান আরও কিছুদিন যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিতে এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। উভয় পক্ষই পরস্পরকে অধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণ করিল। হেস্টিংস ইহাতে খুশী না হইলেও এই সন্ধি অনুমোদন করিতে বাধ্য হইলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-৯২ খ্রীঃ) ঃ ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হইলেও ইহা ইঙ্গ-মহীশূর বিরোধিতার কোন স্থায়ী মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কর্ণওয়ালিস প্রথম কয়েক বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়া নির্লিপ্ত ছিলেন কিন্তু শীঘ্রই স্বাধীনচেতা এবং ব্রিটিশ-বিরোধী টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। টিপু সুলতান দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরেজদের উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে ফ্রান্স, কনস্টান্টিনোপল, বরিশাল, কাবুল প্রভৃতি স্থানে সামরিক সাহায্য চাহিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। ব্রিটিশরা ইহাতে সন্দিহান হইয়া উঠিল।

কর্ণওয়ালিস ও মহীশূর

পরোক্ষ কারণ

ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালিস দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি হায়দরাবাদের নিজামের নিকট হইতে গুন্টুর নামক স্থানটি পাওয়ার বিনিময়ে নিজামকে সামরিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পর বৎসর তিনি টিপু সুলতান বাদে দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গ যথা মারাঠা, নিজাম এবং তাহার মিত্র ব্রিটিশ সরকারকে লইয়া একটি শক্তিজোট গঠন করার প্রস্তাব করিলে টিপু কর্ণওয়ালিসের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। ঐতিহাসিকগণ কর্ণওয়ালিসের এই আচরণ টিপুর সহিত মিত্রতা চুক্তির বিরোধী এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল বলিয়া মনে করেন। টিপু ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। এই সময় টিপু ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিলে **তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হইল।**

পূর্বে উল্লিখিত টিপুর শক্তিত্রয় নিজাম, মারাঠাগণ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরকার এক ত্রিশক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কর্নওয়ালিস নিজে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া টিপু সুলতান এই সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিলেন। শেষ পর্যন্ত রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমের পতন ঘটিলে টিপু বাধ্য হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির র্শতানুসারে টিপুকে তাঁহার অর্ধেক রাজ্য নিজাম, মারাঠা ইংরেজদের ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার দুই পুত্রকে ইংরেজগণের নিকট প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিতে হইল। প্রচুর ক্ষতিপূরণও তাঁহাকে ইংরেজদের দিতে হইল। মহীশূর রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দখল না করিয়া লওয়ার জন্যই ঐতিহাসিকগণ কর্নওয়ালিস সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯৯ খ্রীঃ) : স্বাধীনচেতা টিপু সুলতানের পক্ষে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির অপমানজনক শর্তাদি মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। তিনি ফ্রান্স, মরিসাস, কাবুল, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে দূত পাঠাইয়া সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে বিধ্বস্ত দুর্গগুলির সংস্কার এবং পুনর্গঠন করিলেন। উন্নত ধরনের সামরিক শিক্ষা দান করিয়া তিনি মহীশূরের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। ফরাসী দেশে তখন বিপ্লব পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। টিপু ফরাসী চরমপন্থী বিপ্লবী দল 'Jacobin Club-এর' সদস্য হইলেন এবং ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তি বিতাড়িত করিবার জন্য ফরাসী জেকোবিন দলীয় কয়েকজন সদস্যকে মহীশূরে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক ম্যাঙ্গালোরে আসিয়া উপস্থিত হইল। লর্ড ওয়েলেসলী সেই সময় ভারতের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। টিপু সুলতান কর্নওয়ালিসের আমলের শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির সর্তাদি লংঘন করিতেছেন দেখিয়া এবং ইংরেজ শত্রু ফরাসীদের সাহায্যে ইংরেজ বিতাড়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-নিজাম মারাঠা ত্রিশক্তি সন্ধি পুনঃসঞ্জীবিত করিবার জন্য নিজামকে সপক্ষে টানিলেন এবং মারাঠাদের টিপুর রাজ্য বিজিত হইলে একাংশ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর তিনি টিপুর সহিত ফরাসীদের

ওয়েলেসলী ও মহীশূর

টিপুর ফরাসীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন

টিপুর বিরুদ্ধে নিজাম-ইঙ্গ সন্ধি

যোগাযোগের জন্য কৈফিয়ত দাবি করিলেন। টিপুর জবাব সন্তোষজনক নহে বিবেচনায় তিনি টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধও শুরু হইল। এই যুদ্ধে টিপু ব্রিটিশ সেনাপতি স্টুয়ার্টের হাতে সদাশির-এর যুদ্ধে এবং হ্যারিসের হাতে মলভেলীর যুদ্ধে উপর্যুপরি পরাজিত হইলেন। এক্ষণে টিপু নিজ রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার উদ্দেশ্যে তথায় সৈন্য অপসারণ করিলেন এবং শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করিবার কালে দুর্ধর্ষ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারও স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

টিপুর পরাজয় এবং মৃত্যু

টিপুর মৃত্যুর পর মহীশূর রাজ্যকে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করিয়া ওয়েলেস্‌লী তাহার বিলিব্যবস্থার ভার লইলেন। অধিকাংশ রহিল ব্রিটিশ অধিকারে, এক ক্ষুদ্রাংশ পড়িল নিজামের ভাগে, আর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে কতকগুলি শর্তের বিনিময়ে মারাঠাদের মহীশূর রাজ্যের একাংশ দেওয়া হইলে মারাঠাগণ তাহা গ্রহণে অস্বীকার করে। বাকী যাহা রহিল তাহা হায়দর আলি কর্তৃক যে হিন্দু রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল তাহারই জনৈক বংশধরকে দেওয়া হয় এবং এই হিন্দু রাজবংশ বস্তুত ইংরেজদের তাঁবেদার হিসাবেই চলিতে লাগিল। টিপুর পরিবার-পরিজন ও দুই পুত্রকে প্রথমে ভেলোরে বন্দী করিয়া রাখা হয়। পরে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। মহীশূর রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ-বিদ্বেষী সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির বিলোপ ঘটে ও ভারতবর্ষে ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়।

মহিশূর রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা

টিপুর চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ ভারত হইতে ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য যে সমস্ত বীর জীবনমরণ পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে টিপু সুলতান অন্যতম ও অগ্রগণ্য। তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে শুধু মহীশূর রাজ্য পান নাই ; বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতাস্পৃহা প্রভৃতি গুণাবলীও পাইয়াছিলেন। নিজে কূটনৈতিক কৌশলে বিপ্লবী ফরাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজদের বিতাড়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(গ) **অপরাপর রাজ্য বিজয় (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) ঃ** লর্ড ওয়েলেসলীর মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ এবং অন্যান্য কয়েকটি বৃহৎ শক্তির উপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে অধীনতামূলক বশ্যতা নীতি (ubsidiary Allianc: Policy) প্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ঊনিশ শতকের শুরু হইতেই দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। লর্ড হেস্টিংস গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিবার পর তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটে। অতঃপর অপরাপর দেশীয় স্বাধীন রাজ্য দখল করিতে ইংরেজ সরকার তৎপর হয়। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ইংরেজ অধিকৃত সাম্রাজ্য সীমান্তবর্তী নেপালের সহিত যুদ্ধ, সিন্ধু বিজয়, ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ এবং পাঞ্জাব অধিকার। ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক তথা রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পাঞ্জাব অধিকার ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের ইংরেজ অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) **নেপাল আক্রমণ ঃ** লর্ড ময়রা বা গভর্ণর-জেনারেল 'মারকুইস' অফ হেস্টিংসের আমলের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধ বা নেপাল যুদ্ধ। গোর্খাদের নেতা পৃথ্বীশনারায়ণ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র নেপাল দেশ দখল করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গোরক্ষপুর জেলা পাওয়ার পর হইতে ইংরেজগণের সহিত গোর্খাদের প্রায়ই সীমান্ত লইয়া সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

নেপাল যুদ্ধ

লর্ড হেস্টিংস নিজে ছিলেন এই যুদ্ধের সেনাপতি। ইংরেজবাহিনীর তুলনায় গোর্খাদের সংখ্যা ছিল অল্প। কিন্তু পার্বত্য জাতির কষ্টসহিষ্ণু যোদ্ধা গোর্খাগণ যুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংরেজদের সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করিল। তখন জেনারেল অক্টারলোনীকে যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। গোর্খাদের তিনি পরাজিত করিয়া সগৌলির সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখা হইল এবং তরাই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ ইংরেজদের অধিকারে আসিল। গোর্খা যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি স্যার ডেভিড অক্টারলোনীর নামে কলিকাতায় বিরাট মনুমেন্ট স্থাপিত হয়।

(২) **সিন্ধু বিজয় ঃ** পাঞ্জাব সীমান্ত পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইলে স্বভাবতই ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি সিন্ধু দেশের উপর পড়িল। আলেকজাণ্ডার বার্ণেস সিন্ধু নদ ধরিয়া নদীপথে উজানে পাঞ্জাবে আসেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। পাঞ্জাব-কেশরী রঞ্জিৎ সিংহ সিন্ধু বিজয়ের পরিকল্পনা করিলে, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক কর্নেল পটিঞ্জারকে পাঠাইয়া সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত সন্ধি করেন। ইহার ফলে সিন্ধুদেশে ইংরেজদের অনুপ্রবেশ ঘটে। লর্ড অকল্যাণ্ড আফগান যুদ্ধের সময় সিন্ধুদেশে ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। সিন্ধুদেশের

আমীরগণ ইংরেজদের রক্ষণাধীনে স্থাপিত হন। লর্ড নেপিয়ার নামক ইংরেজ সেনাপতি সিন্ধুদেশে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিলে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। লর্ড নেপিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া আমীরদের ভয় দেখাইয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করেন। আমীরগণের আত্মসম্মানে বাধে। তাঁহারা ক্ষেপিয়া যান। বড়লাট লর্ড এলেনবরা মিয়ানী ও দাবোর যুদ্ধে আমীরগণকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

(৩) **ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক :** উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তানের উপর প্রভাব বিস্তার প্রচেষ্টা এই যুগে ব্রিটিশ রাজ্য বিস্তারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অক্‌ল্যাণ্ডের আফগান নীতি

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড। তাঁহার আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের রুশ ভীতির জন্য। পূর্বদিকে রাশিয়ার অগ্রগতি এবং রাশিয়ার সাহায্য লইয়া পারস্য আফগানিস্তানের হিরাট অঞ্চল দখল করিলে ব্রিটিশ মন্ত্রী পামারস্টোন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে অক্‌ল্যাণ্ড আলেকজাণ্ডার বার্ণেস নামক একজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে আফগানিস্তানে দূতরূপে প্রেরণ করেন। দোস্ত মহম্মদও এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তিনি এই সুযোগে পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশোয়ার তাঁহাকে ফেরত দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাহাতে রাজী না হইলে আফগানিস্তানের সহিত মৈত্রীর চেষ্টা বিফল হয়। ফলে

বার্ণেসকে দূতরূপে প্রেরণ

দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাহ্ সুজাকে সিংহাসনে স্থাপন

অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদকে আফগানিস্তানের সিংহাসনচ্যুত করিয়া তথাকার ভূতপূর্ব সিংহাসনচ্যুত আমীর দুর্‌রানীর জনৈক বংশধর শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন। দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের সহিত মৈত্রী স্থাপনে রাজী না হওয়ায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা ছিল না। তবুও অক্‌ল্যাণ্ড স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেই অজুহাতেই যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শাহ্ সুজা, রঞ্জিৎ সিংহ ও ইংরেজ সরকারের সহিত এই বিষয়ে মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই সময় আফগানিস্তানে অন্তর্বিরোধ দেখা দিলে, সেই সুযোগে অক্‌ল্যাণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে দোস্ত মহম্মদ পরাজিত হইলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু শাহ্ সুজার ইংরেজদের তাঁবেদারী আফগান জাতির সহ্য হইল না। এতদ্ভিন্ন তথাকার ব্রিটিশ কর্মচারী বার্ণেসের অত্যাচার তাহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলে আফগানরা তাঁহাকে হত্যা করিল। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি চুক্তি পালনের কোন চেষ্টা

না করিলে তাঁহাকেও হত্যা করা হয়। ইংরেজদের আফগানদের সহিত যুদ্ধে পরাজয় ঘটে।

অক্‌ল্যাণ্ডের পর গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন লর্ড এলেনবরা। তিনি সেনাপতি পোলিক্‌ ও নটকে আফগানিস্তানে পাঠাইলেন জালালাবাদ নামক স্থানে অবরুদ্ধ কতিপয় ব্রিটিশ সৈন্য উদ্ধারের জন্য। তাঁহারা তাহাদের উদ্ধারের পর কাবুলে প্রবেশ করিয়া নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাইয়া সেইস্থান ত্যাগ করিলেন আফগানগণ ইহাতে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া শাহ্‌ সুজাকে হত্যা করিয়া দোস্ত মহম্মদকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে স্থাপন করিল। এইভাবে বারংবার আফগানদের হস্তে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইয়া ব্রিটিশ শক্তি স্বীয় মর্যাদা হারাইয়া ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সাময়িক যবনিকাপাত করিল।

(ঘ) রঞ্জিৎ সিংহ ঃ ইংরেজদের পাঞ্জাব অধিকার

রঞ্জিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ) ঃ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ শিখ জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্য ও সাফল্যের মূলে ছিল শিখজাতির অনন্যসাধারণ বীর পাঞ্জাব-কেশরী রঞ্জিৎ সিংহের অবদান।

প্রথম জীবন

রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর পাঞ্জাবের সুক্কারচুকিয়া নামে এক 'মিস্‌ল্‌' অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলে তিনি উক্ত মিস্‌ল্‌-এর অধিপতি হন। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ ভারত আক্রমণ করিলে তিনি মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন এবং নিজে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা-চুক্তিতে আবদ্ধ হন। জামান শাহের ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পরেই তিনি লাহোর অধিকার করেন।

রাজ্য বিস্তার

ইহার পর তিনি মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া জম্মুর দিকে অগ্রসর হন এবং প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ লইয়া জম্মুর রাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর অধিকার তাঁহার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহাতে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সমগ্র শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থ সমুদয় মিস্‌ল্‌ দখল করিয়া লন এবং তৎপরে পূর্ব তীরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। ইহাতে কয়েকটি মিস্‌ল্‌-এর নেতারা দলবদ্ধভাবে ইংরেজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। চতুর ইংরেজরা সীমান্তরক্ষার ব্যাপারে রঞ্জিৎ সিংহের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা নীতিকেই অগ্রাধিকার দেয়।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চার্লস্ মেটকাফ্ রঞ্জিৎ সিংহের সহিত সন্ধি করেন। ইহাতে স্থির হয় যে রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পূর্ব তীরস্থ মিস্‌ল্‌গুলি আক্রমণ করিবেন না। অতঃপর কয়েকটি মিস্‌ল্‌-এর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া তিনি লুধিয়ানাতে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্যই সন্ধির পর তিনি মিস্‌ল্‌গুলির ব্যাপারে (পূর্বতীরের) হস্তক্ষেপ করেন নাই। পরবর্তী সময়ে তিনি মুলতান, কাশ্মীর, পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলগুলি, পশ্চিমে কোহাট, বান্নু, টঙ্ক, দেরা ইস্‌মাইল খাঁ, দেরা গাঁজী খাঁ, পেশোয়ার প্রভৃতি জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আফগানদের হায়দরাবাদের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আটক অধিকার করেন। জীবনের অন্যতম কীর্তি হিসাবে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খাইবার গিরিবর্ত্মের কাছে 'জামরুদ কেল্লা' নির্মাণ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমৃতসরের সন্ধি

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ রঞ্জিৎ সিংহ রণনিপুণ সেনাপতিই ছিলেন না, শাসন কার্য ও সংগঠনী শক্তিতেও তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। নেপোলিয়নের পদ্ধতিতে শিক্ষিত রণনিপুণ দুই সামরিক কর্মচারীকে তিনি তাঁহার বাহিনীতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে নিজ সৈন্যদের যুদ্ধশিক্ষা দিয়াছিলেন।

সংগঠনী শক্তি ইত্যাদি

বিচক্ষণ রঞ্জিৎ সিংহ ইংরেজদের রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে মানচিত্র নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন 'সব লাল হো যায়েগা'। যাহা হউক, সন্ধির শর্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি আজীবন ইংরেজের সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়াছিলেন।

ইংরেজের সহিত সম্পর্ক

রঞ্জিৎ সিংহ বীর যোদ্ধা, দূরদর্শী রাজনীতিক ও গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার সুগভীর জাতীয়তাবোধ সমগ্র শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি 'জাতিশক্তি'তে পরিণত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক (বা খড়্গ) সিংহ ক্ষমতাসীন হন। এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং পরদিবসই তাঁহার পুত্র নৌনিহাল সিংহ মারা যান। অতঃপর খড়ক সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ রাজা হন, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইরূপ দুর্বল অবস্থায় শিখ বাহিনী—'খালসা'র পক্ষে রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, রানীমাতা ঝিন্দনকে নামেমাত্র অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া লাল সিংহ ও তেজ সিংহ নামে দুই সামরিক নেতা শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

পরবর্তী বংশধর

এই সময় আফগানদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজদের পর্যুদস্ত অবস্থা দেখিয়া শিখ যোদ্ধারা আশান্বিত হইয়া উঠে। আফগানদের হারানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল। তাহারা ইংরেজদের হারানোর স্বপ্নেও অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৪-৪৮ খ্রীঃ)ঃ ইতিমধ্যে হার্ডিঞ্জ গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য ইংরেজও প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসর সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করিয়া শতদ্রু নদীর পূর্বতীরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইংরেজগণ শিখদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইহা প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ নামে পরিচিত। মুদ্‌কী, ফিরোজ শাহ, আলীওয়াল, সেব্রাও নামক চারিটি স্থানে যুদ্ধ হয় এবং শিখ সৈন্য পরাস্ত হইয়া শতদ্রু নদীর পূর্বতীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির জন্য শিখদিগকে উপযুক্ত খেসারত দিতে হয়। লাহোরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজরা নিজেদের খুশীমত এক সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করে (১৮৪৬ খ্রীঃ)। ইহাতে প্রচুর ক্ষতিপূরণ (৫০ লক্ষ টাকা) এবং কাশ্মীর রাজ্যটি ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁহার নির্দেশে পাঞ্জাবের শাসনকার্য চলিতে থাকে। পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর আমলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে পাঞ্জাব পুরাপুরিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

পাঞ্জাবে ইংরেজ কর্তৃত্ব

(৬) লর্ড ডালহৌসী ঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিনব উপায়

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের পর ভারতে গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসেন লর্ড ডালহৌসী। তাঁহার রাজত্বকালকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যাহ্নের যুগ বলা যায়। তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারের নানা কূট-কৌশলের **উদ্ভাবনী শক্তি, সংগঠনী** প্রতিভা ও কর্মদক্ষতায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আসমুদ্রহিমাচল বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রধান তিনটি নীতির দ্বারা—যথা ঃ (১) যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য বিস্তার, (২) **স্বত্ববিলোপ নীতির** প্রয়োগ দ্বারা রাজ্যবিস্তার ও (৩) **অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্যের দখল**, তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে কার্যকরী করিতে চাহিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী নীতি

ডালহৌসী (১) যুদ্ধনীতি ঃ যুদ্ধনীতির প্রয়োগ দ্বারা ডালহৌসী প্রথমেই পাঞ্জাব দখল করিলেন। ইতিপূর্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে শিখ মহারাজা দলীপ সিংহ ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে আসিলেও দীর্ঘদিন এই আনুগত্য বজায় থাকে নাই। মুলতানের শাসনকর্তা যদিও পাঞ্জাবের রাজার অধীন ছিলেন তবুও তিনি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার হেনরী ল্যরেন্স তাঁহার নিকট হইতে হিসাব চাহিয়া পাঠাইলে মুলরাজ বিদ্রোহ করেন। তাঁহার স্থলে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মুলরাজ তাঁহাদিগকে হত্যা করাইয়া নিজেই মুলতানে প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যেরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের আশায় আফগান জাতিও তাহাদের সহিত হাত মিলাইল, তখন লর্ড

পাঞ্জাব অধিকার

ডালহৌসী যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সেনাপতি গাফং-এর নেতৃত্বে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে গাফং পুনরায় গুজরাটে শিখদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ পরাজিত হইলে ডালহৌসী পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহকে বাৎসরিক ৫০ হাজার পাউণ্ড ভাতা দানের পরিবর্তে পাঞ্জাব দখল করিয়া লইলেন। শিখ খালসা সেনাবাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং শিখজাতিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হইল। পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিমে ব্রিটিশের রাজ্যসীমা আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

দুর্ধর্ষ পাঠান উপজাতিদের হাত হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য আফগানিস্তানের সহিত মৈত্রী স্থাপনে একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য নববিজিত পাঞ্জাবের নিরাপত্তার জন্য লর্ড ডালহৌসী আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করিলে সে আক্রমণ ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে ব্যাহত করা হয়। পর বৎসর উভয় দেশের মধ্যে পুনরায় এক মিত্রতাচুক্তি হয়; যাহার ফলে একদিকে আফগানিস্তান পারস্যের সম্প্রসারণ নীতি হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিল অপরদিকে আফগানিস্তান সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করায় ইংরেজদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা সহজসাধ্য হইয়াছিল।

দোস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি, ১৮৫৫ খ্রীঃ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ঃ প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের পর ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলে অল্পকালের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হয়, অতঃপর কয়েকজন ব্রিটিশ বণিক বর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত হওয়ায় ডালহৌসী কমোডোর ল্যাম্বার্ট নামে এক জনৈক ইংরেজ কর্মচারীকে পাঠাইয়া ব্রহ্ম সরকারের নিকট এই ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন। কমোডোর ব্রহ্ম সরকারের একটি জাহাজ দখল করিয়া লইলে ব্রহ্মদেশের সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করে। ফলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয়, অল্প সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন ও প্রোম দখল করিয়া লইলে ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। ইহার ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসিল।

যুদ্ধের কারণ

যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভ

সিকিম বিজয়

ডালহৌসী সিকিম রাজ্যের একাংশও জয় করিয়াছিলেন সামান্য মাত্র অজুহাতের কারণে।

(২) **স্বত্ববিলোপ নীতি ঃ** লর্ড ডালহৌসী তাঁহার নব আবিষ্কৃত স্বত্ববিলোপ নীতির সাহায্যে সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন। ব্রিটিশের অধীনে বা ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে গঠিত কোন রাজ্যের রাজার যদি কোন

উত্তরাধিকারী না থাকে তবে তিনি কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিতে পারিবেন না। সেই রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িবে—ইহাই ছিল স্বত্ত্ববিলোপ নীতির মূলকথা। কার্যতঃ ডালহৌসীর সময়ে ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির বেশ কয়েকটির রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ডালহৌসী এই নীতি প্রয়োগে উদ্যোগী হইলেন। যদিও ডালহৌসীর সহিত এই নীতির নাম জড়িত তবু বহু পূর্ব হইতেই এই নীতি এই দেশে প্রচলিত ছিল। কোম্পানীর সাহায্যপুষ্ট সাতারা রাজ্যের রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তাঁহার দত্তক পুত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া, ডালহৌসী সর্বপ্রথম সাতারা দখল করেন। এই একই উপায়ে নাগপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। কারাউলি ও উদয়পুর প্রথমে দখল করিয়াও অবৈধতার জন্য সেগুলি ফেরত দেওয়া হয়। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজাদের বাৎসরিক ভাতা দানের ব্যবস্থা করিয়া এই রাজ্য দুইটিও লর্ড ডালহৌসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

নীতির ব্যাখ্যা

নীতির প্রয়োগ

স্বত্ত্ববিলোপ নীতি ছাড়াও অরাজকতার অজুহাতে ডালহৌসী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। হায়দরাবাদের নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের খরচ বাবদ দেয় অর্থ দিতে না পারার অজুহাতে বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ দখলীভুক্ত হইয়া যায়।

অরাজকতার অজুহাতে রাজ্যবিস্তার

লর্ড ডালহৌসী তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির সাহায্যে ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যাধীন করিতে পারিলেই প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথও সুগম হইবে। কিন্তু তাঁহার এই নীতির ভিতর কোনরূপ নৈতিকতার প্রশ্ন ছিল না। নাগপুর ও অযোধ্যা দখল করিয়া লইবার সময় তিনি যে অমানুষিকতা ও বর্বরোচিত আচরণের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের ও ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের দানা বাঁধিয়া উঠে। আশ্রিত রাজ্যগুলির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের এরূপ নীচ এবং স্বার্থপর আচরণ হইতে তাহাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকার যে-কোন অজুহাতে যে-কোন দেশীয় রাজ্য গ্রাস করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য ডালহৌসীর এই পররাজ্য গ্রাস নীতি বহুলাংশে দায়ী ছিল। কারণ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া নানাসাহেব ও ঝাঁসি, অযোধ্যা প্রমুখ রাজ্যের অধিকারিগণ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞরূপে ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহের পদ অবলুপ্ত করার চেষ্টা, দেশীয় রাজাদের স্বার্থ ও মর্যাদাকে উপেক্ষা করিয়া চলা প্রভৃতি কারণেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের উদ্ভব হইয়াছিল।

ফলাফল

অন্যতম ফল সিপাহী বিদ্রোহ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি

(১) **১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি :** ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হইতে ক্লাইভের কোম্পানীর পক্ষে দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজদের ভারতবর্ষে আইনানুগ রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কোন অধিকার ছিল না। পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ (১৭৫৭-৬৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত কোম্পানি বাংলার নবাবের পশ্চাতে থাকিয়া রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। মীরজাফরের দুর্বলতার সুযোগে তাহারা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিনা বাধায় ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। মীরজাফর ইংরেজদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণের হাত হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় ওলন্দাজদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে যত্নবান হন; কিন্তু বিদরের যুদ্ধে ওলন্দাজগণ ইংরেজদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরেজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের জামাতা মীরকাশিমের সহিত গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুসারে সিংহাসন প্রাপ্তির বিনিময়ে মীরকাশিম মীরজাফরের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থসহ বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব কোম্পানিকে প্রদান করিতে সম্মত হন (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মীরকাশিমের সিংহাসন প্রাপ্তির পুরস্কারস্বরূপ ভ্যান্সিটার্ট ও তাঁহার পারিষদবর্গ দুই লক্ষ পাউণ্ড গ্রহণ করেন। বাংলার মসনদ পুনরায় ইংরেজগণ বিক্রয় করে বাংলার এক নবাবকে। 'প্রাসাদ বিপ্লব' তথা নবাবী পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তাহারা অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায় ও ভোগ করার অধিকার লাভ করার পর হইতে উক্ত অঞ্চলের জমিদারদের উপর বাড়তি রাজস্ব চাপাইয়া অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হয়। সীমান্ত অঞ্চলের যে সকল স্বাধীন এবং অর্ধ-স্বাধীন জমিদার মুঘল রাজত্ব কালে নামে মাত্র রাজস্ব দিতেন, তাঁহাদের উপরও বাড়তি রাজস্ব চাপানো হয়। অনেকে কোম্পানীর রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাইলে কোম্পানীর জেলা শাসন কর্তৃপক্ষ সামরিক অভিযান করিয়া বিরুদ্ধবাদী জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং বাড়তি রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণও অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে।

মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীদের 'দস্তক' বা ছাড়পত্রের (Permit) অপব্যবহার করিয়া বাণিজ্য-শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় বণিকদের একই হারে শুল্ক দিতে বাধ্য করেন। ফলে ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজদের

অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারা মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করিয়া বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া নেয় এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে।

দেওয়ানী প্রাপ্তির তাৎপর্য

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সহিত স্বাক্ষরিত এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধি অনুসারে বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন। ইহার ফলে কোম্পানি নবাবকে নামেমাত্র সিংহাসনে রাখিয়া নিজেই বাংলার প্রকৃত শাসনকর্তা হয়। নবাব বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা হারাইয়া নামে শাসক থাকেন। তাঁহার কর্মচারিগণও নবাবকে পরোয়া করেন না। দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ প্রবল হইয়া উঠেন। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানি এতদিন ধরিয়া যে সকল অধিকার বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয়তঃ, কোম্পানি নবাবের প্রাক্তন কর্মচারীদের বরখাস্ত করিয়া (যথা, মহারাজা নন্দকুমার) তাহাদের বিশ্বাস-ভাজন অনুগত কর্মচারীদের (যথা, মহম্মদ রেজা খাঁ, সিতাব রায়) নিয়োগ করে। চতুর্থতঃ, ইংরেজ কোম্পানি অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মচারীকে চূড়ান্তভাবে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে বিতাড়ন করিতে সমর্থ হয় আইনগত একচেটিয়া অধিকারবলে। পঞ্চমতঃ, কোম্পানীর আর্থিক শোষণ বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য ও রাজস্ব আদায়ের নামে বাংলার জনসাধারণকে শোষণ করিয়া বাড়তি অর্থ আদায় করে। প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ পাউণ্ড কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারকে পাঠায় বাংলার আদায়ীকৃত রাজস্ব হইতে। ফলে প্রজাদের নিকট হইতে কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এমনকি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রাক্কালেও মহম্মদ রেজা খাঁ কোম্পানীর পক্ষে নির্দয়ভাবে কঠোরতার সহিত রাজস্ব আদায় করেন বুভুক্ষু কৃষকদের নিকট হইতে। দ্বৈত শাসনের অপগুণের ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তীব্রতর হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান।

(২) শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন (তথা কেন্দ্রীয়করণ নীতি)

শাসনসংস্কার ঃ হেস্টিংস হইতে কর্নওয়ালিসের আমল পর্যন্ত কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয়করণ অর্থাৎ কলিকাতাকে প্রধান শাসনকেন্দ্রে পরিণত করা। বাংলার গভর্ণর হিসাবে শাসনভার গ্রহণ করিয়াই হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ হইতে রাজকোষ কলিকাতায় সরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। ক্লাইভের দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া কোম্পানীর হাতে সমস্ত দেওয়ানী তুলিয়া লইলেন (The East I dia Comp ny stood forth as the Diwan)। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নাম-কা-ওয়াস্তে নবাবের হাতে আর দেওয়ানী সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব রহিল না। তাঁহার বার্ষিক

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনবিষয়ক সংস্কার

ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা হইতে ১৬ লক্ষ টাকায় কমাইয়া দেওয়া হইল। রাজস্ব আদায়ের জন্য পূর্বে নিযুক্ত মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়কে পদচ্যুত করা হইল এবং অর্থ তছরূপ করার অভিযোগে তাঁহারা দণ্ডিত হইলেন। জমিদারি বিলি ব্যবস্থা এবং রাজস্ব আদায়ের নূতন নীতি গৃহীত হইল। যে বেশী খাজনা দিতে রাজী হইল তাহাকে পাঁচ বৎসরের জন্য জমি বিলি করা হইল। খাজনা আদায়ের জন্য ইউরোপীয় কালেক্টর (Collector) নিযুক্ত করা হইল। পূর্বে তাঁহাদের নাম ছিল 'সুপারভাইজার'। কালেক্টরগণ প্রত্যেক জেলায় হাজির হইয়া নূতন জমিদারের সঙ্গে রাজস্বের রফা করিতেন। এই কাজের ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইল। এই কমিটির নাম 'কমিটি ও সার্কিট'। কমিটির সভ্যদের কাজের এলাকা স্থির করিয়া দেওয়া হইল। গভর্ণর এবং তাঁহার কাউন্সিল লইয়া 'বোর্ড অফ্ রেভিনিউ' (Board of Revenue) গঠিত হইল। এই বোর্ডের হাতে দেওয়ানী বিষয়ে কর্তৃত্ব এবং সর্বোচ্চ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য এক একটি 'কাউন্সিল' স্থাপিত হইল এবং প্রত্যেক কাউন্সিলকে সাহায্য করার জন্য একজন করিয়া 'দেশী দেওয়ান' নিযুক্ত হইল। কালেক্টর প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস 'আমিনী কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিলেন। ইহার মতানুযায়ী প্রাদেশিক কাউন্সিল তুলিয়া দেওয়া হইল এবং কালেক্টর প্রথা পুনরায় প্রবর্তন করা হইল। সামরিক ও বেসামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করা হইল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জমি বিলির নূতন নিয়ম চালু হইল। হেস্টিংসের রাজস্ব নীতি কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পথ সুগম করিয়াছিল।

রাজস্বনীতির সংস্কার

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়ামক বিধি বা রেগুলেটিং অ্যাক্ট্ চালু করে। সেই সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। কোম্পানীর কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী এবং ডাইরেক্টরগণ অবৈধ উপায়ে অর্থ রোজগার করিত। তাহা বন্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লর্ড নর্থ একটি আইন প্রণয়ন করিলেন। ইহার দ্বারা কোম্পানীর ভারত শাসন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা হইবে স্থির হইল। (১) কোম্পানীর পরিচালকবর্গ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। (২) পূর্বে প্রতি বৎসর ডাইরেক্টরগণ নির্বাচিত হইতেন। প্রতি বৎসর পরিচালকগণের এক-চতুর্থাংশ অবসর লইয়া অন্তত এক বৎসর পরিচালকগোষ্ঠীর বাহিরে থাকিবে। (৩) সেক্রেটারী অব্ স্টেট কোম্পানীর কাজকর্ম সম্পর্কে সরকারী তত্ত্বাবধান করিবে। (৪) বাংলাদেশে গভর্ণরের পরিবর্তে গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইবেন। (৫) চারিজন সদস্যকে লইয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হইবে। (৬) তাঁহারা পাঁচ বৎসরের জন্য ক্ষমতায় আসীন থাকিবেন। (৭) বাংলার

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপন

রেগুলেটিং অ্যাক্ট্

গভর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলের অধিকার ছিল যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন প্রভৃতি ব্যাপারে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কার্যের তত্ত্বাবধান করা। (৮) কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবে। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন বিচারপতি এই বিচারালয়ে বিচার পরিচালনা করিবেন।

এই নিয়ামক আইনানুসারে গঠিত কাউন্সিলের সহিত অচিরেই হেস্টিংসের বিরোধ বাধিল। কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র বারওয়েল ছাড়া অন্য তিনজন হেস্টিংসের কার্যকলাপের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। কাউন্সিলের প্রথম কাজ হইল রোহিলা যুদ্ধের নিন্দাবাদ করা।

কাউন্সিলের সহিত হেস্টিংসের বিরোধ

ওয়ারেন হেস্টিংসের পর ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস একযোগে গভর্ণর-জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস শাসনসংস্কার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইংরেজ কর্মচারী 'জন্ শোর', 'জেমস্ গ্রাণ্ট', 'উইলিয়াম জোনস' প্রভৃতি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীকার লিখিয়াছেন যে, ভারতে ইংরেজ কর্তৃত্বকে যাঁহারা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং বিজিত অঞ্চলে রীতিবদ্ধ ও সমুন্নত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কর্ণওয়ালিস হইলেন অন্যতম।

কর্ণওয়ালিসের কৃতিত্ব

শাসনবিষয়ক সংস্কার ঃ কর্ণওয়ালিস যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চ-নীচ সর্ব স্তরেই দুর্নীতি, আত্মীয়-পোষণ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কর্তৃত্বের সুযোগ লইয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে গোপনে বাণিজ্য করিত। বেনামী ব্যবসায় একেবারে বন্ধ করিতে না পারিলেও কর্ণওয়ালিস নিয়ম করিলেন যে (১) সরাসরি দেশীয় বণিকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে। (২) তাহা ছাড়া, 'বোর্ড অফ ট্রেড' (Board of Trade)-এর সদস্য সংখ্যা এগার হইতে কমাইয়া পাঁচজন করা হইল। শাসন-বিষয়ক ক্ষেত্রে কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্য-নীতি ও কার্য-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিয়া ভারতীয় 'সিভিল সার্ভিস' (Indian Civil Service)-এর সংক্ষেপে (I. C. S.) মূল কাঠামো গঠন করিয়াছিলেন। তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্য নীতি ব্যাখ্যা করিয়া কর্ণওয়ালিস কোড্ (Cornwallis Code) নামে কতকগুলি নিয়মকানুন চালু করিয়াছিলেন। কর্মচারিগণ যাহাতে অবৈধ উপায়ে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে সচেষ্ট না হয়, সেজন্য তিনি তাহাদের মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কর্মচারীদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আনুগত্যের উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন।

কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্য দুর্নীতি দমন

Cornwallis Code

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ধারণের জন্য তিনি পুলিশী ব্যবস্থারও সংস্কার

সাধন করিয়াছিলেন। কয়েকটি গ্রামের শান্তি রক্ষার ভার ছিল একজন দারোগার উপর। পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকার শান্তি বিধান করিতেন। কর্নওয়ালিসের নূতন নিয়মের ফলে তাঁহাদের প্রাধান্য লোপ পাইল। প্রত্যেক জেলার শাসনভার একজন করিয়া ইউরোপীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ন্যস্ত করা হইল। কলিকাতায় একজন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত শাসন সংস্কারের সহিত বেন্থামের হিতবাদী দর্শন মিশ্রণ করিয়া ভারতীয়দের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দানের নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ভারতীয়দের বেতন ও পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। একই ব্যক্তির হাতে জেলা কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি বা Indian Penal Code (IPC) রচিত হয়। বিচার বিভাগীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে কর্নওয়ালিস হেস্টিংসের অনুগামী ছিলেন।

পুলিশী ব্যবস্থার প্রবর্তন

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার : ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেওয়ানী বিচারের দায়িত্ব ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। ফৌজদারী আদালতের উপর ধীরে ধীরে কোম্পানীর অধিকার স্থাপিত হইল। 'কমিটি অব্ সার্কিট'-এর সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক জেলায় মফস্বল দেওয়ানী আদালত এবং মফস্বল ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। কালেক্টরগণ দেওয়ানী আদালতের বিচার পরিচালনা করিতেন। কলিকাতায় ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। সেখানে জমির মালিকানা সংক্রান্ত গুরুতর মামলার শুনানি হইত; মফস্বল দেওয়ানী আদালত হইতে সেখানে আপিল আসিত। প্রত্যেক আদালতে একজন হিন্দু পণ্ডিত এবং একজন মুসলমান মৌলভী থাকিতেন। তাঁহারা এদেশের হিন্দু ও মুসলমান আইন ব্যাখ্যা করিতেন।

মফস্বল আদালত

সদর দেওয়ানী আদালত

মফস্বল ফৌজদারী আদালতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্বন্ধে বিচার হইত। প্রাণদণ্ডের প্রশ্ন উঠিলে মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইত মুর্শিদাবাদে 'সদর নিজামত' আদালতে। কাজী ও মুফ্‌তি ফৌজদারী আদালতে আইনের ব্যাখ্যা করিতেন। নবাবের বিনা অনুমোদনে কাহারও প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত না। নবাব স্বয়ং ছিলেন সদর নিজামত আদালতের সর্বোচ্চ বিচারপতি। সেখানে প্রধান কাজী, প্রধান মুফতি এবং তিনজন প্রসিদ্ধ মৌলভী আইনের ব্যাখ্যা করিতেন। মফস্বলের ফৌজদারী আদালতে যেমন ইংরেজ কালেক্টরগণ তদারকি করিতেন, তেমনই সদর নিমাজত আদালতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি তদারক করিতেন।

সদর নিজামত আদালত

এইভাবে হেস্টিংসই সর্বপ্রথম শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারের দ্বারা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কর্নওয়ালিস ইহার উপর আরও সংস্কার করিয়া ব্রিটিশ শাসনের লৌহ-কঠিন কাঠামো প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

(১) ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ আদালত 'সদর নিজামত' আদালতকে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল এবং নবাবের বিচারের ক্ষমতা লোপ করিয়া স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে দেওয়া হইল। (২) সদর নিজামত আদালতের অধীনে কর্নওয়ালিস চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় (circuit courts) স্থাপন করিলেন। ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ের বিচারকগণ বৎসরে দুইবার করিয়া বিভিন্ন জেলায় যাইতেন এবং স্থানীয় বিচার কার্য সম্পাদন করিতেন। (৩) কর্নওয়ালিস পূর্বে প্রচলিত নিষ্ঠুর দণ্ডদান-নীতির পরিবর্তন করিয়াছিলেন। (৪) পূর্বে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজবিরোধী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। কর্নওয়ালিস সমাজের উপকারের জন্যই হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার রীতি প্রবর্তন করেন।

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার

দেওয়ানী বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে কর্নওয়ালিস রাজস্ব বিভাগকে বিচার বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়াছিলেন। ১) দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ আদালত ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল এই বিচারালয়ের কার্য পরিচালনা করিতেন। (২) সর্বনিম্ন আদালত ছিল সদর আমিন ও মুন্সেফী আদালত। (৩) এই সমস্ত সদর আমিন ও মুন্সেফী আদালতের উপরে ছিল জেলা দেওয়ানী বিচারালয়। এক একজন ইংরেজ জেলা জজ এই বিচারালয়গুলির কার্য পরিচালনা করিতেন। (৪) ইঁহাদের উপরে ছিল চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয়। কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলির পরিচালনার ভারও ইংরেজ জজদের উপর ছিল। (৫) জেলা কালেক্টরদের বিচার ক্ষমতা নাকচ করিয়া তাঁহাদের শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। কর্নওয়ালিসের শাসন সংস্কারের ফলে ভারতীয়গণ শাসন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। জমিদারগণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব হারাইলেন; ইংরেজ কর্মচারীদের উপর পুলিশী এবং বিচার-ভার দেওয়া হইল।

দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার

ফলাফল

(৪) **বর্ধিত ভূমি-রাজস্ব ঃ** রাজস্ব বিভাগের সংস্কারের জন্য কর্নওয়ালিস ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ক্রমাগত রাজ্য বিস্তারনীতির ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাই বর্ধিত হারে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে কর্নওয়ালিস বঙ্গদেশে দশ-সালা (১৭৯০ খ্রীঃ ও তৎপরে চিরস্থায়ীভাবে জমিদারের ভূমি ও ভূমি-রাজস্বের ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে মাদ্রাজে এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কিছু অঞ্চলে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়। এই প্রথা অনুসারে নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে প্রতিটি কৃষকের নিকট হইতে সরকার সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যবস্থারই স্বীকৃতি মাত্র ছিল বলা যায়। টমাস মনরো নামক উচ্চপদস্থ একজন ইংরেজ সরকারী কর্মচারী এই প্রথার উল্লেখযোগ্য সমর্থক ছিলেন। বাংলার জমিদারদের মত মাদ্রাজে 'পলিগার গণের সহিত উক্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাতে কোম্পানীর লাভ হইয়াছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিয়া তিনি ভূমি-রাজস্ব আদায় এবং বণ্টনের সুষ্ঠু সমাধান করিয়া গিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারণা কর্নওয়ালিসের সৃষ্ট নয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালেও এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল। হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে ডাইরেক্টরদের সভা এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পিট্-এর ভারত আইনেও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব স্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কর্নওয়ালিস যখন গভর্ণর হইয়া আসিলেন তখনও ইংরেজ কর্মচারিগণ এদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই। এইজন্য প্রথমে দুই বৎসরের ভিত্তিতে এবং পরে দশ বৎসরের ভিত্তিতেই ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল জেলা কালেক্টরগণের দ্বারা (১) রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ, (২) নূতন ও পুরাতন জমিদারদিগের সহিত ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন, (৩) জমিদারদের অত্যাচার হইতে 'রায়ত' অর্থাৎ প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি।

Permanent Settlement of Land & Land Revenue

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দশ-সালা বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার প্রস্তাব করিলেন। ইহার ফলে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার জন্ শোর-এর সহিত তাঁহার বিতর্ক শুরু হইল। ১) শোর-এর মতে ইংরেজ কোম্পানি তখনও রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং দশ-সালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী করা উচিত হইবে না। (২) পক্ষান্তরে, কর্নওয়ালিসের মতে ইংরেজ কোম্পানি রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে এতদিন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল তাহাই যথেষ্ট। তিনি মনে করিতেন জমিদারগণ চিরস্থায়ীভাবে জমি ভোগদখলের অধিকার না পাইলে জঙ্গলাকীর্ণ এবং অনাবাদী জমির উৎকর্ষ সাধনে তাঁহারা সচেষ্ট হইবেন না। (৩) তাহা ছাড়া কর্নওয়ালিস ডাইরেক্টরী সভার স্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করিবার নির্দেশের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। (৪) শোর এই মতামত জানাইলেন যে পূর্বোক্ত দুই বৎসর জমিদারগণের নিকট হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে, তাহা ন্যায্য রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল; সুতরাং নূতন করিয়া জমি জরিপ না করিয়া রাজস্ব নির্ধারণ করা অন্যায় হইবে। (৫) ইংলণ্ডের জমিদার বংশের সন্তান কর্নওয়ালিস সাধারণ প্রজার কথা চিন্তা না করিয়াই জমিদারগণকেই জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের ভার কোম্পানীর হাতে রাখিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। ডাইরেক্টর সভার সম্মতি পাওয়া মাত্রই

স্যার জন শোর-কর্নওয়ালিস বিতর্ক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা

কর্ণওয়ালিস শোর-এর মতামত অগ্রাহ্য করিয়া ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তারিখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল স্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করা; কৃষিকার্যের উন্নতি বিধান করা এবং এক শ্রেণীর ইংরেজ-শাসন সমর্থক জমিদার সৃষ্টি করা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ ঃ এই ব্যবস্থার দ্বারা (১) কোম্পানি বাৎসরিক ভূমি-রাজস্বের আয় সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে এবং নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছিল। ইহার ফলে আয় অনুযায়ী বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করার সুবিধা হইয়াছিল। (২) জমিদারগণ জমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে জমির এবং প্রজাবর্গের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। জমিদারগণের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও বর্তাইয়াছিল। বহু জমিদার দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর সময় প্রজাবর্গকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। (৩) গ্রামাঞ্চলে জমিদারগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। (৪) সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও জমিদারগণের অবদান কিছু কম ছিল না। (৫) এই ব্যবস্থার ফলে যে স্থায়ী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারা স্বভাবতই কোম্পানীর উপর নির্ভর ছিলেন বলিয়া সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিলেন, ফলে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইল।

গুণাবলী

দোষ-ত্রুটি ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ অপেক্ষা দোষ-ত্রুটি ছিল বেশী। ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব এই বন্দোবস্তের দোষ-ত্রুটির সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন।

(১) জমি জরিপ না করিয়া রাজস্ব নির্ধারণ করার ফলে রাজস্বের হার অনেক ক্ষেত্রেই খুব বেশী হইয়াছিল। জমিদারদের অধীনে কি পরিমাণ পশুচারণ ভূমি, নিষ্কর জমি ইত্যাদি ছিল কোন প্রকার খোঁজ-খবর না লইয়া রাজস্ব নির্ধারিত হইবার ফলে উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। ইহার ফলে নির্ধারিত রাজস্ব দেওয়া জমিদারগণের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

(২) নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি নিলাম করিবার নিয়ম প্রচলিত থাকিবার ফলে বহু প্রাচীন জমিদার তাঁহাদের জমিদারি হারাইয়াছিলেন। মাত্র ২২ বৎসরের মধ্যে কর্ণওয়ালিসের সৃষ্ট জমিদারগণের মধ্যে প্রায় অর্ধেকেই জমিদারি হারাইয়াছিলেন।

(৩) কর্ণওয়ালিস বন্দোবস্তের পূর্বে রায়তদের স্বার্থ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও জমিদারগণের অত্যাচার হইতে তাহাদের রক্ষা করিতে পারেন নাই। অতি সামান্য কারণে বা অকারণ জমিদারগণ রায়তদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন।

(৪) অতি উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হইবার ফলে জমিদারগণ রায়তগণের নিকট হইতে উচ্চহারে খাজনা আদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ফলে রায়তদের অর্থনৈতিক দুর্দশা অবর্ণনীয় অবস্থায় পেঁছাইয়াছিল।

(৫) ভূমি-রাজস্ব আদায়কারী নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারের কাহিনী সমকালীন সাহিত্য উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে উল্লিখিত রহিয়াছে।

(৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করিবার সময় কর্নওয়ালিস জমির উন্নতির জন্য জমিদারগণ সচেষ্ট হইবেন বলিয়া যে আশা করিয়াছিলেন তাহা ব্যাহত হইল। যেহেতু রাজস্ব আদায় দিলে জমি হস্তচ্যুত হইবার কোন কারণ নাই; সেইজন্য কেহই জমির উন্নতি সাধনে মন দিলেন না।

এই সকল কারণে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা বলা হয়। পরবর্তী কালে রাজস্ব আইন পাশ করিয়া লর্ড ক্যানিং অন্যায়ভাবে রায়ত উচ্ছেদ এবং খাজনা বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বাংলাদেশে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিয়া এবং প্রজাগণকে 'রায়তি-স্থিতিবান' স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার দান করিয়া এই আইনের অনেক দোষ রহিত করা হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া রায়তদের সহিত সরাসরি জমি বন্দোবস্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরবর্তী কালে দোষ ত্রুটি দূরীকরণের চেষ্টা

———

সপ্তম অধ্যায়

শিল্প ও বাণিজ্য

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের প্রসার এবং কয়েকটি দেশজ শিল্পের অবক্ষয় : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে তথায় নানা ধরনের শিল্পের উদ্ভব ঘটে এবং এই শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর বিক্রীর জন্য বৃহত্তর বাজারের প্রয়োজন দেখা দেয়। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার ইংলণ্ডের নিকট কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের নূতন শিল্পপতিগণ ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বহির্বাণিজ্যের অবসান করিয়া অবাধ বাণিজ্যের জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরও ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যত্ন সহকারে সময় দেওয়া এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাহা ছাড়া বাণিজ্য-প্রসূত আয় ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা ও শাসনকার্যে ব্যয়িত হইতে থাকে। ফলে কোম্পানীর অংশীদারদের প্রাপ্যাংশ ঠিকমত দিতে কোম্পানিকে ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। কোম্পানীর পরিচালকবর্গ উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনদে একমাত্র চীনদেশ ছাড়া অন্য সর্বত্র কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার উচ্ছেদ করা হয়। ভারতে ইংরেজদের স্থায়িভাবে বসবাসের উপর এযাবৎ যে সমস্ত বিধিনিষেধ তাও রোধ করা হয়। ইংরেজ শিল্পপতিগণ ভারতে মূলধন বিনিয়োগ করেন ও অবাধ বাণিজ্যের সুযোগে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে একদিকে যেমন ব্রিটিশজাত পণ্যসামগ্রীর আমদানির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া ভারতীয় শিল্পের বিনাশ সাধন করা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল বিদেশজাত পণ্যসামগ্রীর উপর আমদানী শুল্ক ছিল কম, কিন্তু ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীর উপর শুল্কের হার ছিল বেশী। অত্যধিক শুল্কহারের ফলে ভারতীয় শিল্পের, বিশেষতঃ সুতীবস্ত্রের শিল্পেব প্রভূত ক্ষতি হয়। বহির্বিশ্বে ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। অপরদিকে ইউরোপীয় বিশেষতঃ ইংলণ্ডের বৃহৎ কারখানায় উৎপাদিত পণ্য ভারতের বাজারে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়। ভারতীয় কুটির শিল্পের পতন ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু, মুসলমান, আর্মেনীয় বণিকদের দ্বারা বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ইউরোপীয়দের দ্বারা ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের পরিমাণের চেয়ে বেশী ছিল। ভারতীয় বণিকরা আরব, পারস্য, তুরস্ক এবং তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিত। বহির্বাণিজ্যের লভ্যাংশের সিংহভাগ পাইত বঙ্গদেশ, কারণ বঙ্গদেশের সুতীবস্ত্রের, বিশেষতঃ ঢাকার মসলিন বস্ত্রের সারা বিশ্বে কদর ছিল, তাহা ছাড়া বাংলার রেশম, চিনি, লবণ, পাট, সোরা, গন্ধক এবং আফিং-এর বিদেশের বাজারে চাহিদা ছিল। ইহাদের মধ্যে সুতীবস্ত্রের চাহিদা সবচেয়ে বেশী ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলি ভারতীয় সুতীবস্ত্র স্থলপথে ইস্ফাহান এবং জলপথে মধ্যপ্রাচ্যের বাসারা, মোচা এবং জেজ্জায় রপ্তানি করিত। ওলন্দাজরা শুধু কাশিমবাজার কুঠি হইতে প্রতিবৎসর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা রেশম রপ্তানি করিত। আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকালে প্রায় সাত লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম রপ্তানি করা হইয়াছিল বলিয়া মুর্শিদাবাদের শুল্ক সম্বন্ধীয় নথিপত্রে উল্লিখিত আছে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে করমণ্ডল এবং মালাবার উপকূল হইতে পারস্য উপসাগর এবং লোহিত সাগরের ভিতর দিয়া ভারতে আমদানীকৃত বৃহৎ পরিমাণ পণ্যের কথা জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্রমাবনতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত হইতে পণ্য রপ্তানীর পরিবর্তে কাঁচামাল সস্তা দামে ক্রয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে পণ্যসামগ্রী আমদানি করিতে থাকে।

রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে ভারতীয় তাঁতী, কৃষক, কারিগর প্রভৃতিকে যথেচ্ছ শর্তে 'দাদন' বা অগ্রিম দিয়া সস্তা দামে সুতীবস্ত্র প্রস্তুত করিতে বাধ্য করে। কোম্পানীর কারখানায় ভারতীয় তাঁতীদের বলপূর্বক অতি সামান্য মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য করা হয়। অনেক সময় দৈহিক নির্যাতন ভীতি প্রদর্শন করিয়াও তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করা হয়। কোম্পানীর গোমস্তাগণ জোরপূর্বক গ্রাম হইতে তাঁতীদের ধরিয়া আনিয়া কোম্পানীর কারখানা বা আড়ংএ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কাজ করিতে বাধ্য করার বহু নজীর সমকালীন রেকর্ড হইতে জানা যায়। অনেক সময় তাঁতীদের কোন প্রকার পারিশ্রমিক দেওয়া হইত না। আবার বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় করিবার জন্য একচেটিয়া বাজারের আশায় তাহাদের ভারতীয় তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দেওয়ার কাহিনীও নিছক রচনা ছিল না।

১৭৫৭ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি নবাব মীরজাফর এবং মীরকাশিমের নিকট হইতে প্রায় ৫০ লক্ষ স্টার্লিং সিংহাসনে বসানোর পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছিল। উক্ত ভারতীয় অর্থ ভারতীয় পণ্যক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাহারা বিনিয়োগ করিয়াছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এইরূপ বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি

পাউণ্ডে পেঁছাইয়াছিল। তাহা ছাড়া, কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ও ছিল। ফলে প্রভূত পরিমাণ অর্থের ভারত হইতে নির্গমন ঘটিয়াছিল। ১৭৫৭ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একমাত্র বাংলার এইরূপ অর্থ নির্গমনের পরিমাণ ছিল ৩৮০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং। প্রভূত পরিমাণে অর্থ-সম্পদ নির্গমনের ফলে বাংলার অর্থনীতি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কোম্পানীর বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কার্যকরী পণ্যের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার থাকার ফলে তাহারা যথেচ্ছভাবে বাণিজ্য করিত। তাহারা ভারতীয় বণিকদের কৃষক ও তাঁতীদের নিকট হইতে সরাসরি পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিতে নিষিদ্ধ করে। কোম্পানীর পক্ষে কর্মচারীরা উক্ত পণ্য কেনার একমাত্র অধিকারী ছিল বলিয়া তাহারা ইচ্ছামত দামে ক্রয় করিয়া তাহা পুনরায় ভারতীয় বণিকদের বেশী দামে কিনিতে বাধ্য করিত।

পূর্ব-ভারতের তথা বঙ্গদেশের সূতীবস্ত্র ব্যতীত লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, নাগপুর এবং মাদুরা ছিল উল্লেখযোগ্য সূতীবস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র। পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর হইতে শাল রপ্তানি হইত।

উনিশ শতকের গোড়া হইতে ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর সহিত ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত সামগ্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ডাইরেক্টর সভার নির্দেশে চারি বৎসরের জন্য ভারত হইতে রঙিন সূতীবস্ত্রের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। ভারত হইতে কাঁচা তুলা লইয়া গিয়া ইংলণ্ডের কারখানায় বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া তাহা পুনরায় ভারতে কোম্পানি বিক্রয় করিত। যন্ত্রচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সহিত ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত বস্ত্র অসম প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না। ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পতন ঘটিল। বহু লোক বেকার হইয়া পড়িল গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙ্গন ধরিল। কৃষি শ্রমিক এবং কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিল। ভারতের অর্থনীতি কৃষিনির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

অষ্টম অধ্যায়

(ক) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবঃ ভারতীয় নবজাগরণের সূচনা

(খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার।'—রবীন্দ্রনাথ

ইউরোপের ইতালীতে যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসিয়াছিল রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, ভারতবর্ষের বাংলাদেশে তেমনি নবজাগরণ আসিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে একদিকে বিদেশী ইংরেজগণ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিল, অপরদিকে সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনৈক্যজনিত বিশৃঙ্খলা এবং অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের সূত্রপাত হইল। ইংরেজদের চেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হইলে এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনানুসারে এদেশে প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তার ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অর্থদান এবং পৃষ্ঠপোষকতা করিলে, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে নব-যুগের সূচনা হইল। ইংরেজগণ প্রথমদিকে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু রামমোহন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মনীষীর চেষ্টায় প্রাচ্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংরেজ সরকার মনোনিবেশ করেন। ইহার ফলে একদিকে প্রাচ্য শিক্ষা, অপরদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ধারার প্রসার ঘটিতে থাকে। প্রাচ্যপন্থী এবং পাশ্চাত্যপন্থী দুই ধারার মধ্যে সংঘাত এবং সমন্বয়ের ফলে এক নব-জাতীয়তাবোধ সমন্বয়মূলক, সাংস্কৃতিক জীবনধারা এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসার জন্মলাভ হয়। ফলে নবজাগরণ আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ। সমন্বয়মূলক নব-জাগৃতি আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস আন্দোলনের সূচনা

রামমোহনঃ বাংলার তথা ভারতবর্ষের এই নবজাগরণ আন্দোলনে যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহন ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি হুগলী জেলার রাধামোহনপুর নামক গ্রামে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক ভারতীয় ছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লব তাঁহার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম ও যুক্তিবাদের সমন্বয়, সমাজে কুসংস্কারের পরিবর্তে

যুক্তিবাদী সংস্কারের প্রবর্তন, রাজনীতিতে সাম্য ও স্বাধীনতা নীতির আলোচনা তাঁহাকে গতানুগতিকতার যুগে আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে। তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধর্ম বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রবর্তক। সকল ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই ছিল তাঁহার সিদ্ধান্ত। তিনি 'বেদ' ও 'উপনিষদের' উপর ভিত্তি করিয়া নিজ ধর্মমত পর্যালোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। 'ব্রাহ্ম সভা' নাম লইয়া পরে এই সভা আরও সুসংবদ্ধ হয়। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রবল আগ্রহ থাকিলেও অন্ধ বিশ্বাস কখনও তাঁহাকে আকর্ষণ করে নাই। তিনি প্রাচ্য বিদ্যা-বিশারদ হইয়াও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য সরকারী আনুকুল্যে কলেজ স্থাপনের জন্য লর্ড আমহার্স্টের নিকট তাঁহার আবেদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডেভিড হেয়ারের মত বিদেশী সজ্জন এবং স্বদেশীয় কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু কলেজ' প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। স্কটিশ পাদরী আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌কে তিনি কলেজ স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহাই হইল স্কটিশচার্চ কলেজ। নিজের উদ্যোগে তিনি অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল এবং বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সার্থক সমন্বয় হইয়াছিল। ভারতের নবজাগরণের 'প্রথম পথিকৃত', এই মহামানব ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহলোক ত্যাগ করেন।

যুক্তিবাদের প্রবর্তন

রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোক্তা

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টারে ভারতীয়দের শিক্ষাখাতে বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই নির্দেশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Committee of Public Instruction নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। রামমোহন এই সংস্থাটিকে প্রাচ্য বিদ্যা অপেক্ষা পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রসারে সচেষ্ট হইবার জন্য তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের নিকট যে পত্র পাঠান তাহা ঐতিহাসিক দলিল হইয়া রহিয়াছে। ডেভিড হেয়ার নামক ঘড়ি ব্যবসায়ী এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন। তিনি 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা এবং প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইন পাশ হইবার পর লর্ড মেকলে ভারতবর্ষে আইন সচিবের কাজ পাইয়া আসিয়াছিলেন। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের তিনি একজন অগ্রদূত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এবং সদাশয় গভর্ণর-জেনারেল বেণ্টিঙ্কের আনুকূল্যে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী অর্থ সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের নীতি গৃহীত হয়। এই বৎসরই পাশ্চাত্য ধারায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে হিন্দু কলেজের কনিষ্ঠতম শিক্ষক হেনরী ডি' রোজিও নামক এক প্রতিভাবান যুক্তিবাদী এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এক তরুণ শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাঁহার শিষ্যরা ডি' রোজিয়ান বা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে খ্যাত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার, দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুর, রেভারেন্ড লালবিহারী দে প্রভৃতি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির পরিবর্তে প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। অপরদিকে প্রাচ্যপন্থিগণ রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দুগণের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলতার নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহারা সংস্কার পন্থীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মকে বাঁচাইবার জন্য লোকাচার ও সংকীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে এই ধর্মকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। ফলে দুই বিপরীতধর্মী ও পরস্পর-বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। বাংলাদেশের ইয়ং বেঙ্গলদের মত বোম্বাইতেও ইয়ং বোম্বে দলের সৃষ্টি হইল। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি প্রাচ্য বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেও পাশ্চাত্য বিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনিও রামমোহনের মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও রামমোহনের মত তিনি সতীদাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন।

ডি' রোজিও

ইয়ং বেঙ্গল

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে ব্যয় করার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দেওয়া হইত। এই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার খাতেই ব্যয় করা হইত। ইতিপূর্বেই রাজা রামমোহন রায় এই টাকা যাহাতে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানে ব্যয়িত হয় তাহার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন কোন ফল হয় নাই। গভর্ণর-জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিংক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে

শিক্ষা সংস্কার

ংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এ বিষয়ে রকারের সেক্রেটারী প্রিন্সেপ সাহেব ও গভর্ণর-জেনারেল কাউন্সিলের আইন সদস্য ৬র্ড ম্যাকলের তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও উদারপন্থী ারতীয়দের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতে লাগিল। ডভিড হেয়ার ও রামমোহনের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল, পরে উহার নাম হইলাছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ। ডেভিড হেয়ার ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের জন্য 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন। নূতন ভাবধারায় তৎকালীন যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরী লুই ভাইভান ডি রোজিওর নাম উল্লেখযোগ্য। স্কটিশ মিশনারীর ডক্টর আলেকজান্ডার ডাফ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল জেনারেল এ্যাসেম্ব্রীজ ইনস্টিটিউশন বা বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ। এই সকলই সম্ভব হইয়াছিল তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের সহানুভূতি ও সদিচ্ছায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্কের চেষ্টায় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ ও বোম্বাই-এর এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়। এইভাবে এদেশের বিভিন্ন ব্যবস্থায় তিনি যে যুগান্তকারী সংস্কার কার্যাদির পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার জন্য আজও ভারতবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার নাম স্মরণ করে। মিশনারীদের প্রচেষ্টা ও সরকারী প্রচেষ্টা এবং বেসরকারী ভারতীয় ও ইংরেজদের প্রচেষ্টায় এইভাবে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়।

কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইতে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন স্থাপিত

(খ) ধর্ম আন্দোলন : সামাজিক পরিবর্তন :

যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবধারার সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতীয় ধর্ম এবং সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। লোকাচার জীর্ণ, বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজের মধ্যে সংস্কারপন্থী ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দেয়। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইল ভারতীয়গণ। ইহার ফলে দেখা দিল চিন্তার জগতে আলোড়ন। সৃষ্টি হইল নূতন সাহিত্য। সমাজ-জীবনে আসিল অনেক আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কার। নূতন প্রাণ বন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ভারতবর্ষ। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের ভাবধারার মিলনের ফলে, পুরাতনের সহিত নূতনের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিরূপে একদিকে দেখা দিল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ; অপরদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিচার, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতির এদেশে প্রচলনের প্রচেষ্টা। এই যুগ-সন্ধিক্ষণের সূত্রপাত হইয়াছিল উনিশ শতকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় সাধকদের মধ্যে পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৮৩ খ্রীঃ) মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী সেতুরূপে তিনি

বিরাজমান। তাঁহার সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল জ্ঞানের আলোকে মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের প্রচেষ্টায় অচলায়তন ভারতীয় সমাজে প্রাচ্য প্রথা অটুট রাখিয়া সংস্কার সাধন সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় সাহিত্য-জগতে (বাংলায়) যে আলোড়ন আসিয়াছিল তাহার ফলে সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্ভব হইল।

বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলন

ব্রাহ্ম সমাজ ঃ ইউরোপে যেমন, 'ফ্রান্স হাঁচিলে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের সর্দি লাগে' ; ভারতবর্ষেও তেমনি বাংলায় কোন আন্দোলনের সূচনা হইলে অন্যান্য প্রদেশে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। লোকাচার এবং গোঁড়ামীর আবেষ্টনে হিন্দু ধর্ম যখন বেদ-উপনিষদের নির্দেশিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল এবং শাস্ত্রের নামে ব্রাহ্মণগণ অশাস্ত্রীয় আচরণ করিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় তখন উপনিষদের বাণী প্রচার এবং প্রসার করিয়া ধর্মীয় কলুষতা দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। তিনি মূর্তি পূজার প্রতিবাদ করিলেন এবং উপনিষদের 'একেশ্বরবাদ' প্রচার করিয়া ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন, সর্বভূতে সমানভাবে তিনি বিরাজমান এই সনাতন সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ধর্মাচরণকে এক নূতন রূপ দিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মসভা নামে একটি ধর্মসভা স্থাপন করিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য যাঁহারা এক পরমব্রহ্মে বিশ্বাসী, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিবেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রামমোহনের অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের পিতা) ব্রাহ্ম-উপাসক বা ব্রাহ্মদের লইয়া বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে একটি ধর্ম-সমাজ গঠন করিলেন। ইহাই 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত হইল। সংস্কার এবং প্রগতিকামী হইলেও তিনি আতিশয্য এবং দ্রুত পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। ফলে নবীন ব্রাহ্মদের সহিত মতান্তর ঘটিল। এই মতদ্বৈধ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে দলগত ভেদ সৃষ্টি হয় এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক অতি প্রগতিভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে পৃথক হইয়া 'নব-বিধান' নামে একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রামমোহন, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' এখনও টিকিয়া আছে। তাঁহারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। নূতন সমাজের সভ্যগণ জাতিভেদের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়াছিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ তরুণ নেতারা বেদের অভ্রান্ততায়ও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।' কেশবচন্দ্র প্রায় সারা ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের বহু শাখা স্থাপন করিয়াছিলেন। সুদূর পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, এমন কি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ভাঙ্গিয়া গেল। উমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু

ও শিবরাম শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিরা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। ইহার নাম হইল 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' (The Brahma Samaj of India)। 'নব-বিধান' দলনেতা কেশবচন্দ্র সেনের অল্পবয়স্কা কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহের ফলে তাঁহার অনুগামীরা দল ত্যাগ করিয়া এই সাধারণ সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ছিলেন প্রগতিবাদী ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা

আচার-বিচার ও দলগত পার্থক্য থাকিলেও সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্ম সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত নানাভাবে হিন্দু সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন, পর্দা প্রথার অবসান ; স্ত্রীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বাল্য-বিবাহ নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি সংস্কার সাধন করিয়া এই 'সমাজ ইতিহাসে' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' এবং 'ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস' গ্রন্থ এই সমাজের কার্যাবলী সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

প্রার্থনা সমাজ ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে। মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলন গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। সেখানে ব্রাহ্ম সমাজের অনুরূপ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল প্রার্থনা সমাজ। মহারাষ্ট্রের সাধু-সন্ত তুকারাম, রামদাস, নামদেব প্রভৃতি ধর্মমতে অবিশ্বাস করিতেন বলা চলে না। তবে ধর্ম অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারে তাঁহাদের আগ্রহ ছিল বেশী। বোম্বাই-এর বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। উপরোক্ত দুইটি সমাজ পাশ্চাত্য ভাবধারায় সৃষ্ট এবং পুষ্ট হইয়াছিল।

আর্য সমাজ ঃ পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, সমাজ-সংস্কার এবং ধর্মীয় আঘাতের প্রতিক্রিয়ারূপে সম্পূর্ণ ভারতীয় ও হিন্দু ধাতু এবং শুদ্ধ বৈদিক ধর্মের আদর্শে আর্য সমাজের জন্ম হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং মূর্তিপূজা বিরোধী। তিনি ব্রাহ্মদের মতই জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করিয়া এবং স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদির প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার নূতন কীর্তি হইল বিধর্মীকে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু ধর্মে দীক্ষাদান। তিনি ছিলেন প্রাচীন বৈদিক ধর্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী এবং বেদ অভ্রান্ত বলিয়া তিনি প্রচার করিয়াছিলেন।

কালক্রমে এই আর্য সমাজও দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। একদল পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়া আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং আচার-ব্যবহার প্রবর্তন করিতে চায়, অপর পক্ষে অন্য দল প্রাচীনপন্থী থাকিয়া বৈদিক আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে এই সমাজের বিস্তারলাভ ঘটিয়াছিল।

একই সময়ে থিওসফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারকার্যে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ছিল ভারতের স্বাধীনতা পোষণ। এ্যানি ব্যাসান্ত প্রমুখ কয়েকজন বিদেশী নরনারী এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস : ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত ধর্ম আন্দোলন ও চিন্তাধারার অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল পরমহংস রামকৃষ্ণের কথামৃতে। তিনি নূতন কোন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন নাই। সত্যজ্ঞান ছিল তাঁহার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তিনি তাঁহার ঈশ্বরোপলব্ধি সহজ সরল কথায় শিষ্যবর্গের মধ্যে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমনির কালী মন্দিরে তিনি ছিলেন পুরোহিত। এইখানেই পূজায় বসিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইয়া যাইতেন। তাঁহার মতে সকল ধর্মের মূলকথা ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ : পরমহংস দেবের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণের ধর্মপ্রবণতা বিবেকানন্দের মধ্যে কর্ম-প্রবণতায় রূপান্তর লাভ করে। গুরুর তিরোধানের পর সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত সর্ব-ধর্ম আলোচনা সভায় হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। আমেরিকায় এবং ইউরোপের নানা স্থানে বেদান্ত মঠ ও প্রতিষ্ঠান তাঁহার চেষ্টায় স্থাপিত হয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে একটি সন্ন্যাসী সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু ধর্ম পালন নয় জনসেবায় আত্মনিয়োগ ছিল স্বামীজীর অন্যতম আদর্শ। তিনি বলিতেন, 'জীবেপ্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতা, কাপুরুষতা প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তিগুলিকে দূরীভূত করিয়া, বীর্যবান এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। স্বামীজীর স্বাদেশিকতা ছিল অপরিমেয়। তিনি 'দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী' সকলকেই এক মহান্ জাতীয়তাবাদী ঐক্য-কল্যাণে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তবে তাঁহার স্বদেশপ্রেম মানবিক উদারতা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে সংকীর্ণ করিতে পারে নাই। তাঁহার কর্ম-প্রচেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশন একটি জনহিতকর শিক্ষামূলক এবং উদারনৈতিক ধর্ম-সংগঠনে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। সারা ভারতে ও বহির্বিশ্বে রামকৃষ্ণ মিশন এখনও একটি সুদূরপ্রসারী জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের মত স্বামীজীও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি যোগসূত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক পরিবর্তন : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের গোড়ার দিকে ইংরেজগণ সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারে মন দেয় নাই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন সংস্কারক মনীষী এবং ইংরেজ গভর্ণর-জেনারেলের

সহৃদয় প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমাজে নানাবিধ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজ হইতে সতীদাহ প্রথা এবং শিশুদের হত্যা করা ও বলি দেওয়া (যথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন দেওয়ার এবং প্রস্তর ফলকে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করার) প্রভৃতি কু-প্রথাগুলির উচ্ছেদ সাধন হয়। রামমোহন রায়, গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি মনীষীদের চেষ্টায় এইগুলি বন্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল একথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে বিধবা-বিবাহ আইনসঙ্গত হয়। বেথুন প্রমুখ ভারত-সুহৃদ ইংরেজগণ এবং এদেশীয় কয়েকজন মনীষীর চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হয়। ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি সংস্কারবাদী ধর্ম-সমাজগুলির প্রচেষ্টার ফলেও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সামাজিক সংস্কারসাধন সম্ভব হইয়াছিল। 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং বোম্বাই' নামধারী বিদ্রোহী তরুণগণের প্রচেষ্টায় সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। জাতিভেদ-প্রথার দূরীকরণ করিয়া সামাজিক ক্ষুদ্র গণ্ডীর পরিবর্তে বৃহত্তর আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠনে তাহারা তৎপর হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের রক্ষণশীল সমাজ তাহা সহজে গ্রহণ করিয়া মানিয়া লইলেন না। পরবর্তী কালে যন্ত্রশিল্পের বিকাশের ফলে, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন, সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি কারণে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে।

সমাজ সংস্কার

নবম অধ্যায়

কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ

(ক) কৃষক বিদ্রোহ—ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলন
(খ) উপজাতীয় আন্দোলন—কোল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

(ক) কৃষক বিদ্রোহ : পলাশীর যুদ্ধের পর একশত বৎসরের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ বিনা প্রতিবাদে কোম্পানীর আধিপত্য মানিয়া লয় নাই। যদিও ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার উন্মেষ তখন হয় নাই, তবু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবিরাম রাজ্যগ্রাস ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ঘটে। বাংলা ও বিহারে প্রথম কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এই অঞ্চলেই প্রথম অসামরিক গণবিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায় বিদ্রোহ করিয়াছিল। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহ দমনে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল। লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও বীরভূমের কৃষকেরা শোচনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ছোটনাগপুর ও পশ্চিম-বঙ্গের বাঁকুড়া-মেদিনীপুর অঞ্চলের কৃষক, জমিদার, পাইক ও আদিবাসী জনসাধারণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। বিক্ষুব্ধ ও জমিদারীচ্যুত রাজা-জমিদারগণ (যথা—ঘাটশিলার রাজা, কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি) বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব-দান করিয়াছিলেন। তাহারা সীমান্তবঙ্গ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। ইংরেজ সরকারের ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ৮নং বিধি (Regulation VIII of the Permanent Settlement) অনুযায়ী নিষ্কর পাইকান জমি বাজেয়াপ্তকরণ এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহকে 'চুয়াড়' বিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল একটি কৃষক বিদ্রোহ। ঊনিশ শতকের গোড়ায় (১৮১০ খ্রীঃ) মেদিনীপুরের গড়বেতা অঞ্চলে পাইক-লায়েকদের বিদ্রোহও একটি কৃষক বিদ্রোহ ছিল। ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশকে চব্বিশ-পরগনা, নদীয়া ও যশোহর অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের ফরাজি আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বিহারের কোল, ভুমিজ ও সাঁওতালগণ এই ব্যাপক আন্দোলন ঘটাইয়াছিল (১৮৫৫-৫৬ খ্রীঃ)। মুণ্ডা বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বীর বীরসা মুণ্ডা।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের গণবিদ্রোহের মধ্যে পশ্চিম-ভারতের ভীলগণ, উত্তর-ভারতের জাঠগণ, গুজরাটের কোলীদের ও আসামের খাসিয়াদের বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরি-লিখিত বিদ্রোহগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক কারণে ঘটিয়াছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন : ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মুসলমানগণ তাহাদের পূর্ব প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল। দিল্লীর মুঘল বাদশাহ এবং অযোধ্যা প্রভৃতি মুসলিম শাসিত রাজ্যগুলি কোম্পানীর অধিকারে চলিয়া যাইবার ফলে মুসলিম কর্মচারী ও সৈন্যগণ বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ করিলে মুসলিম অভিজাতগণের সরকারী চাকরি পাইবার আশাও নষ্ট হইল। তাহা ছাড়া, হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে পশ্চাদপদ ছিল।

ইংরেজ শাসনে মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক অবক্ষয়

এই পটভূমিকায় ভারতীয় মুসলিম সমাজে দুই ধরনের আন্দোলন দেখা দেয়। প্রথমতঃ, একশ্রেণীর মুসলিম নেতা বিশুদ্ধ ইসলামের আদর্শে মুসলমান সমাজের পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবেন। তাঁহারা বলপূর্বক ভারত হইতে ইংরেজদের বিতাড়নের কথা বলেন। দ্বিতীয়তঃ, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ নেতৃবর্গ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যভাবধারার সহিত সম্যক পরিচয় ঘটাইয়া হৃত প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হন। প্রথম আন্দোলনকে মুখ্যত ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন ও দ্বিতীয় আন্দোলনকে আলিগড় আন্দোলন বলা হইয়াছে।

ওয়াহাবি আন্দোলন ঃ উনিশ শতকে ইসলামের শুদ্ধির জন্য ভারতবর্ষে এক আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত মুসলমান সন্ত শাহ উয়ালিউল্লাহ। তিনি আরবের আবদুল ওয়াহাবি নামক এক ধর্মপ্রাণ বিশুদ্ধবাদী ধর্মসংস্কারকের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আবদুল ওয়াহাব প্রচার করিয়াছিলেন যে কোরান, ইদিস প্রভৃতি ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থের শরিয়তী বিধান হইতে মুসলমান সমাজ সরিয়া আসিবার ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও গোঁড়ামীর বীজ হইতে মুসলমান সমাজকে মুক্ত হইতে হইবে। তাঁহার মতাবলম্বী অনুগামীরা ওয়াহাবি নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে শাহউল্লাহ এবং তাঁহার পুত্র আজিজ কোরানের উর্দু অনুবাদ করেন। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলীর অধিবাসী সৈয়দ আহমদ, সাধু আবদুল আজিজের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলামের পরিশুদ্ধি আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হন। ইহা ছাড়া, মক্কাতে হজ করিতে গিয়া সৈয়দ আহমদ আরব দেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের ভাবধারার সহিত পরিচিত হন। ইসলামের পরিশুদ্ধির জন্য আরব দেশে আবদুল ওয়াহাবি নামে এক ব্যক্তি আন্দোলন গঠন

করেন। সৈয়দ আহমদ ভারতে ফিরিয়া আসিয়া আবদুল ওয়াহাবীর অনুরূপে শুদ্ধি আন্দোলন গঠন করেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্তিত আন্দোলনকে ওয়াহাবি আন্দোলন বলা হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলন প্রথম দিকে ইসলামের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহা শেষ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ ও তাঁহার অনুগামীর নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলাম বা ইসলামের পবিত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা। ইসলামকে বিভিন্ন অনাচার হইতে পরিশুদ্ধ করা এবং ইসলাম বিরোধী ইংরেজ শক্তিকে ভারত হইতে বিতাড়ন করা।

সৈয়দ আহমদ

সৈয়দ আহমদকেই ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলীতে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এই মত প্রচার করেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করার ফলেই মুসলিম সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটিয়াছে। পয়গম্বরের বাণী অনুসরণ করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ যদি জীবন ধারণা গঠন করেন তবে ভারতীয় মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটিবে। এই কারণে প্রতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের উচিত পবিত্র ইসলামের আলোকে জীবন গঠন করা। বিধর্মী ইংরেজ ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করার ফলে ভারতে ইসলাম বিপন্ন হইতেছে। বিধর্মী শাসনের ফলে ভারত দার-উল্-হারব বা বিধর্মীর দেশে পরিণত হইয়াছে। সৈয়দ আহমদ বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষকে দার-উল্-ইসলামে পরিণত করার জন্য মুসলমানগণকে আহ্বান করেন। দ্বিতীয়তঃ, সৈয়দ আহমদ বলেন যে, বণিক ইংরেজরা ভারতের সম্পদ লুঠ করিয়া দেশকে ঝাঁঝরা করিয়া দিতেছে। ইহাদের বিতাড়িত না করিলে দেশবাসীর রক্ষা নাই।[১]

সৈয়দ আহমদের মতবাদ

সৈয়দ আহমদ মারাঠা, হিন্দু ও অন্যান্য ভারতীয় রাজাকে ওয়াহাবি আন্দোলন সমর্থন করার আহ্বান জানান। সৈয়দ আহমদের পরামর্শে বিলায়েৎ আলি ও এনায়েৎ আলি নামে তাঁহার দুই অনুচর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওয়াহাবি কেন্দ্র গঠন করেন। সৈয়দ আহমদ মুসলিম যুবকগণকে ওয়াহাবি সেনাদলে যোগ দেওয়ার ডাক দেন। অন্যান্য ব্যক্তিকে ওয়াহাবি তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য বলেন। ওয়াহাবি সেনাদলকে ইউরোপীয় কায়দায় লড়াই করিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। হিজরত আদর্শ অনুযায়ী ওয়াহাবিগণ বিধর্মী ইংরেজ শাসিত ভারত ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাঠান অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটি হইতে জেহাদ চালাইয়া তাহারা ভারতকে ইংরেজের হাত হইতে মুক্তি করার সঙ্কল্প নেয়।

ওয়াহাবি সংগঠন

(১) Quemuddin Ahmad—The Wahabi Movement

সৈয়দ আহমদ ও ওয়াহাবিগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সামরিক শক্তি গঠন করিলে প্রতিবেশী পাঞ্জাবের শিখ সাম্রাজ্যের সহিত তাহাদের সংঘাত বাধে

শিখ যুদ্ধ

শিখ শক্তির বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কালাকোটের যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং ওয়াহাবিগণ পরাস্ত হয়।

সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগামী ওয়াহাবিগণ বিলায়েৎ ও এনায়েৎ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। ইঁহাদের সহিত মৌলবী নাসিরউদ্দিনও যোগ দেন। ইঁহাদের নেতৃত্বে ওয়াহাবিগণ ভারতকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব হইতে ইংরেজ সেনার সুপরিকল্পিত আক্রমণে উত্তর-পশ্চিমের পাঠান অঞ্চলে ওয়াহাবি শক্তি ধ্বংস হয়।

ওয়াহাবি-ইংরেজ সংঘর্ষ
লাল্লুর যুদ্ধ

ইংরেজ পুলিশ ও গোয়েন্দারা ভারতের ভিতরে ওয়াহাবি সমর্থকদের গ্রেপ্তার করিয়া জেল অথবা প্রাণদণ্ড দেয়। ইহার ফলে ওয়াহাবি আন্দোলন ধ্বংস হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় কিনা ইহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ডঃ কুয়েমুদ্দিন আহমদের মতে ওয়াহাবি আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বলা যায়। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের হাত হইতে ভারতকে সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা মুক্ত করা। এই ঐতিহাসিকের মতে ওয়াহাবি আন্দোলনকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী আন্দোলন বলা যায় না। এই আন্দোলন কেবল মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সৈয়দ আহমদের অনুরাগী ও সমর্থকগণের মধ্যে কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন ইহা মনে করার কোন কারণ নাই। ডঃ কুয়েমুদ্দিন আহমদের মতে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার শ্যালক হিন্দুরাও ছিলেন সৈয়দ আহমদের সমর্থক। বোম্বাইয়ে ওয়াহাবিগণের সভায় হাজার হাজার হিন্দু যোগ দিয়াছিল। ভারতের অভ্যন্তর হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওয়াহাবি ঘাঁটিতে অর্থ সরবরাহ হিন্দু বণিক ও মহাজনগণই করে। সৈয়দ আহমদের চিঠিপত্রে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরেজ ঐতিহাসিক হান্টার তাঁহার রচনায় ওয়াহাবি আন্দোলনকে হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনেক গবেষকের মতে ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ। ইহা অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী হইতে পারে নাই। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও স্বীকার করেন যে, বহু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ওয়াহাবিদের সমর্থক ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলনের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল ভারত হইতে ইংরেজদের বিতাড়ন করা। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় ওয়াহাবিগণের বিরোধিতা করায় ঘটনাচক্রে ওয়াহাবিগণ শিখ বিরোধী হইয়া পড়ে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে ইসলামীয়

ওয়াহাবি আন্দোলনের
প্রকৃতির মূল্যায়ন

শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ওয়াহাবি আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমানাধিকারের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত ছিল না। কিন্তু ডঃ কুয়েমুদ্দিন আহমদ এই মতের বিরোধিতা করেন। তাঁহার মতে ওয়াহাবি আন্দোলন ভারতে একমাত্র মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল মনে করিলে ভুল হইবে। ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি যাহা হউক না কেন, এই আন্দোলন যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ বৃদ্ধি করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবু ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইহা ইংরেজ শাসনের ভিতে ফাটল ধরাইয়াছিল।

আন্দোলনের ত্রুটি

ফরাজি আন্দোলন: ঊনিশ শতকে বাংলায় মুসলমান সমাজের মধ্যে ওয়াহাবি আন্দোলনের সমগোত্রীয় যে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল তাহা **ফরাজি আন্দোলন** নামে পরিচিত। ১৮১৮ হইতে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাজি আন্দোলন বাংলায় চলিয়াছিল। ফরাজি শব্দটির অর্থ হইল 'ইসলামের পবিত্র আদর্শে বিশ্বাস'। পূর্ব-বাংলার ফরিদপুর জেলার মৌলবী হাজি শরিয়ৎউল্লাহ ছিলেন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি ইসলামকে পবিত্র কোরানের আদর্শ অনুযায়ী শুদ্ধ করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ধর্মীয় শুদ্ধিকরণের সহিত আর্থ-রাজনৈতিক আদর্শও প্রচার করেন। তিনি বলেন যে ইংরেজের সমর্থনপুষ্ট জমিদার শ্রেণী দরিদ্র রায়তদের রক্ত শোষণ করিতেছে। পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহারা শরিয়ৎউল্লাহ-এর কথায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বেকার তাঁতী ও কৃষকগণ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। হিন্দু কৃষকেরাও শরিয়ৎউল্লাহের আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। ফলে এই আন্দোলন পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল।

শরিয়ৎউল্লাহর পুত্র দুধুমিঞা (১৮১৯-৬০ খ্রীঃ) তাঁহার পিতার আদর্শকে আরও উগ্র রাজনৈতিক মতে পরিণত করেন। তিনি পূর্ব-বাংলার বাহাদুরপুরকে প্রধান কর্মকেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা স্থাপন করেন। তাঁহার নেতৃত্বে বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক সংঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। জমিদারগণ ইংরেজ সরকারের শরণাপন্ন হন। নীলকর সাহেবরাও জমিদারদের সহিত যোগ দেন। ইংরেজ সরকার দুধুমিঞাকে গ্রেপ্তার করে (১৮৫৭ খ্রীঃ)। তিনি মুক্ত হইয়া পুনরায় আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র নোয়ামিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন কিছুকাল চলে। কিন্তু আন্দোলন ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় ইহার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়।

হান্টারের মতে ফরাজি আন্দোলন ছিল একটি শ্রেণী সংগ্রাম। দরিদ্র কৃষকশ্রেণী জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। কিন্তু ডঃ শশিভূষণ চৌধুরীর

মতে ইহা জমিদার ও সামন্ততন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে আরম্ভ হইলেও ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও ফরাজি আন্দোলন বাংলার কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্রিটিশ সরকার পরবর্তী কালে কৃষক ও প্রজাস্বত্ব রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

ফরাজি আন্দোলনের গুরুত্ব

তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খ্রীঃ) ঃ ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের শ্রেণীসংগ্রাম তথা শোষিত কৃষক ও কর্মহীন কারিগর শ্রেণীর আন্দোলনের চরিত্র সুস্পষ্ট হইয়াছিল পশ্চিমবাংলার কলিকাতার নিকটবর্তী বারাসতে সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য মীর নিসার আলি বা তিতুমীরের নেতৃত্বে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪-পরগনার বাদুড়িয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম মীর হাসান আলি। তিতু মক্কা যাত্রা করিয়া ওয়াহাবি মতের প্রচারক আহম্মদের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতে ইসলাম ধর্মের অধঃপতনের জন্য কোরান শরিফের মূলনীতি হইতে মুসলমানদের বিবৃতিই দায়ী ছিল বলিয়া মনে করেন। তিনি গোড়াতে ইসলামের বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলনে (ওয়াহাবি) যোগদান করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহা জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাজে লাগান। তাঁহার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেয়।

তিতুমীর কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের নিন্দা করেন। ফলে কৃষক ও জোলাগণ তিতুর নেতৃত্ব নেয়। এক্ষেত্রে তিতুর চিন্তাধারায় ফরাজি প্রভাব দেখা যায়। তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার যশোহর, নদীয়া, ২৪-পরগনা জেলার দরিদ্র চাষী ও বেকার তাঁতিগণকে লইয়া তাঁহার আন্দোলন সংগঠিত করেন। অত্যাচারী জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে দরিদ্র চাষীর পক্ষ লইয়া তিতুমীর দাঁড়ান। অত্যাচারী জমিদারদের তিনি বল প্রয়োগে শায়েস্তা করার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর জমিদারদের সমানভাবে শাস্তি দিতেন। মুসলিম বলিয়া অত্যাচারী জমিদারদের তিনি খাতির করিতেন না। কৃষ্ণ রায় নামে এক জমিদার 'ঈশ্বর সেস' নামে অতিরিক্ত কর মুসলিম চাষীদের উপর ধার্য করেন। ইহা জানা যায় যে, কৃষ্ণ রায় তিতুর অনুচরদের জব্দ করিবার জন্য তাহাদের দাঁড়ির উপর ২-৫০ পয়সা হারে কর ধার্য করেন। তিতুর নির্দেশে তাঁহার অনুচররা এই কর আদায় দিতে অস্বীকার করে। তিতুমিঞার অনুচরগণ কৃষ্ণ রায়ের পাইক সেনার সহিত দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। অতঃপর তিতুর নির্দেশে সকল জমিদারের উপরেই তিতুর অনুচররা আক্রমণ চালায়। নীলকরগণের উপরেও আক্রমণ চালান হয়। বারাসত, এমন কি কলিকাতার উপকণ্ঠ অঞ্চলেও ফরাজিগণ হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের উপর হামলা চালায়। তিতুমীরের অনুচরেরা কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ হিন্দুদের উপর অত্যাচারও করে। তবে প্রধানতঃ তাহাদের আক্রমণ জমিদার শ্রেণীর

তিতুমীর ও কৃষক আন্দোলন

ফরাজি বিদ্রোহে তিতুমীরের নেতৃত্ব

বিরুদ্ধে পরিচালিত হইত। তিতুমীর বুঝিতে পারেন যে জমিদারদের খুঁটি হইল ইংরেজ। সুতরাং ইংরেজকে হঠাইতে না পারিলে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ হইবে না। এই কারণে তিতুমীর ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে। তিতুমীর ২৪-পরগনার নারিকেলবেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা বানাইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। নারিকেলবেড়িয়ার যুদ্ধে ইংরেজ সেনার হাতে তিতুমীর প্রাণ দেন। বহু ফরাজি নিহত এবং বন্দী হয়।

(খ) **উপজাতীয় আন্দোলন ঃ** ছোটনাগপুর ও মানভুম অঞ্চলের হো, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসিগণ ইংরেজ কর্তৃক তাহাদের স্বাধীনতা হরণের ফলে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ হইতেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। এইসকল আদিবাসীর নিকট হইতে খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানি বহিরাগত কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিল—আদিবাসী গ্রাম-প্রধান-মুখিয়া বা মাজীদের চিরায়ত অধিকার হরণ করিয়া তাহারা অধিকাংশই ছিল ইংরেজ সরকারের তাঁবেদার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহারা আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার হরণ করিয়াছিল। তাহারা জোরপূর্বক তাহাদের নিকট হইতে যথেচ্ছ খাজনা আদায় করিত। আদিবাসীরা পূর্বে নামমাত্র খাজনা দিত ; আবার অনেকক্ষেত্রে একেবারেই দিত না। ইংরেজ রাজস্ব কর্মচারীরা তাহাদের সেই অধিকার খর্ব করিয়া খাজনা আদায় করিলে আদিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। রাঁচি, হাজারিবাগ অঞ্চল লইয়া প্রায় ৪ হাজার বর্গ মাইল স্থানে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। মানভুমে ভূমিজরা বিদ্রোহ করে। ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহীদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেয় ও অকথ্য অত্যাচার করে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল পরগনা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। সাঁওতালগণ ছিল খুবই শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী ও বনবাসী মানুষ। ইহারা ছিল খুবই সৎ, কর্মী, সরল প্রকৃতি। ইহারা জমি ও অরণ্যকে প্রাকৃতিক সম্পদ মনে করিত। জঙ্গল কাটিয়া কৃষিজমি তৈয়ারী করিয়া সাঁওতালগণ চাষ করিত। ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের অধিকৃত জমির উপরেও বাড়তি কর স্থাপন করে। ফলে বহু সাঁওতাল কৃষক পালামৌ, মেদিনীপুর, বীরভুম, মানভুম, ছোটনাগপুর অঞ্চলের হাসিল করা আবাদী জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। তাহারা রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, বীরভুম অঞ্চলের জঙ্গল সাফ করিয়া নূতন বসতি গড়িয়া তুলে। ইহার নামকরণ করা হয়—দামান-ই-কোহ বা মুক্ত অঞ্চল। কিন্তু লোভী ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলের উপরও হাত বাড়ায় ; কর চাপাইয়া জোরপূর্বক আদায় করে। সরকারের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার শ্রেণীও সাঁওতালদের উপর নির্যাতন করে। তাহাদের সঙ্গে মহাজনী ঋণদাতা শ্রেণীও সাঁওতালদের শোষণ করিতে থাকে। তাহারা সাঁওতালদের নিকট হইতে ক্ষেত্রবিশেষে শতকরা ৫০-৫০০% পর্যন্ত সুদ আদায় করে। মহাজনের ঋণের দায়ে সাঁওতালদের

অবস্থা খুবই দুর্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় মিশনারীরা সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়া তাহাদের চিরায়ত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্য ও কর্মচারীদের সাঁওতাল নারীর সম্মানহানির ঘটনা ও তাহাদের অসন্তোষের আগুনে ঘৃতাহুতি করে।

উপরোক্ত কারণে সাঁওতালগণ তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠে। তাহারা সরকারের নিকট অভিযোগ করিয়া কোন প্রতিকার পায় নাই।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। ইহাকে উপজাতীয় গণসংগ্রাম বলা যাইতে পারে। ব্রিটিশ সরকার জমিদার, নীলকর সাহেব অর্থ সাহায্যে বিদ্রোহীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। ২৫ হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। এই বিদ্রোহে সাঁওতালদের নেতৃত্ব দেন সিধু ও কানু নামে দুই সাঁওতাল ভ্রাতা। ইহা ছাড়া বীর সিং, কালো প্রামাণিক, ডোমস মাঝি প্রভৃতি নেতারাও বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। বিদ্রোহে অ-সাঁওতাল কৃষকরাও যোগ দেয়। সিধু ও কানু স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য ঘোষণা করেন। আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সাঁওতালরা তীর-ধনুক-কুঠার লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল।

A4 to be deleted

সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। সাঁওতাল বিদ্রোহ

গুরুত্ব

জাতীয় গণঅভ্যুত্থানের পথ সুগম করে। ব্রিটিশ সরকারের ভিত্তিভূমি কাঁপাইয়া তুলে। ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের দাবি মানিয়া লইয়া সাঁওতাল পরগনা নামে স্বতন্ত্র অঞ্চল গঠন করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ বাংলার নীলচাষীদের বিদ্রোহ, পুনায় মারাঠা চাষীদের বিদ্রোহ প্রভৃতি কৃষক বিদ্রোহে প্রেরণা যোগায়।

দশম অধ্যায়

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

(ক) কারণ ; (খ) বিদ্রোহে জনসাধারণের অংশগ্রহণ—নেতৃবর্গ, বিদ্রোহের প্রকৃতি

ঐতিহাসিকগণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে একমত নহেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান জুড়িয়া যে এই বিদ্রোহ দেখা দেয় সে-সম্বন্ধে অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক ও লেখকের অভিমত এই যে, এই বিদ্রোহ প্রধানতঃ সিপাহীদের মধ্যে ঘটিয়াছিল। কাজেই এই বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলাই যুক্তিযুক্ত। আবার অনেকে বিশেষতঃ ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখকের মতে এই বিদ্রোহ ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানকল্পে প্রথম 'জাতীয় সংগ্রাম', কিন্তু এই দুই মতই এত বেশী পরস্পর-বিরোধী যে, বিশেষ কোন একটি অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। সেই কারণে এই বিদ্রোহকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বলাই যুক্তিযুক্ত।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি

কারণ : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ কোন আকস্মিক ঘটনা নয় দীর্ঘদিন যাবৎ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিদ্রোহের কারণগুলিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক এই কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতিই অন্যতম। এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর ঝাঁসি প্রভৃতি অধিকার এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অযোধ্যা রাজ্যটিও কুশাসনের অজুহাতে দখল করিয়া লওয়া হইয়াছিল। পররাজ্য গ্রাসের এই অভিনব পন্থাসমূহের নীতিগত প্রশ্ন বাদ দিলেও যে অত্যাচার ও অমানুষিকতার সঙ্গে অযোধ্যার নবাবের রাজপ্রাসাদ ও নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল তাহাতে তৎকালীন দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন, অযোধ্যা নগরের প্রাসাদ হইতে নবাব পরিবারের কন্যাদের বাহির করিয়া দিয়া কোষাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি নীচ এবং হীন স্বার্থপরতায় দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শুরু করিলেন। তাঁহাদের নিকট ব্রিটিশ আনুগত্য ও ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি মূল্যহীন হইয়া পড়িল।

রাজনৈতিক

কতকগুলি সামাজিক কারণও বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। বিদ্রোহের অর্ধ-শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে শাসক ও শাসিত সম্পর্ক ভাল ছিল না। ইংরেজ শাসকশ্রেণীর ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা এবং তাহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিয়া এড়াইয়া চলার যে মনোবৃত্তি তাহা ভারতীয়দের ক্রমশঃ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সিয়ার-উল-মুতাখরিন গ্রন্থে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের এই ধরনের মনোভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয়দের কোন দায়িত্বমূলক পদে বহাল করা হইত না, বা তাহাদের ইংরেজ কর্মচারীদের তুলনায় বেতন অনেক কম দেওয়া হইত। এতদ্ভিন্ন তাহাদের চোখে ভারতীয়দের সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না। বলা বাহুল্য, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক যখন এমন তখন শাসকের প্রতি শাসিতের আনুগত্য প্রকাশ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। যদিও ইংরেজ গভর্ণর এদেশের শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক বহু কুসংস্কারের বিলোপসাধন ইত্যাদি বহু জনহিতকর কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন তবুও তাঁহাদের এই কল্যাণমূলক কার্যকলাপ ভারতীয়রা সহজমনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সব সময় এই সকল উদ্দেশ্যের পিছনে ইংরেজ সরকারের দুরভিসন্ধির কথা চিন্তা করিত।

সামাজিক

এদেশে ইংরেজরা আসিয়াছিল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া বণিকের ছদ্মবেশে। মূলগত উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বহুবিশ্রুত সম্পদের কিছুটা ছলে-বলে-কৌশলে নিজের দেশে বহন করা। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই একশত বৎসর ধরিয়া যে কি বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন ইংরেজরা এই দেশ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের সাফল্য। ভারত হইতে নামমাত্র মূল্যে কাঁচামাল আনিয়া যন্ত্রের সাহায্যে অধিক উৎপাদন ঘটাইয়া সেই শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করিত। এইভাবে রাজনীতির মত অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ ব্রিটেনের শিকারে পরিণত হইল। বিদেশী পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে দেশের কুটিরশিল্প প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা তদুপরি নানাপ্রকার কর স্থাপন এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার চরম সীমায় আনয়ন করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক

এই বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সিপাহীদের অসন্তোষ। এই অসন্তোষের বহুবিধ কারণ ছিল। বস্তুতঃ, এই ভারতীয় সিপাহীদের দ্বারাই ইংরেজ জাতির এদেশে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জয় সম্ভব হইয়াছিল অথচ তাহারা তাহার জন্য পুরস্কৃত ত হয়ই নাই উপরন্তু সকল সময়েই তাহারা ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম পাইত। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্রমশঃ বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছিল। ইংরেজ সামরিক কর্মচারীদের ব্যবহারও অত্যন্ত

আপত্তিজনক ছিল। তাহারা অত্যন্ত খারাপ ভাষায় দেশীয় সৈনিকদের গালি দিত। তাহাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ভারতীয় সৈনিকগণ কোন প্রতিকার পাইত না। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল প্রকট। অভিজ্ঞ ভারতীয় অফিসারদের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া ইউরোপীয় অফিসারগণকে দায়িত্বশীল পদে বহাল করা হইত। ফলে ইউরোপীয় সৈনিক ও অফিসারদের বিরুদ্ধে দেশীয় সেনাবাহিনীর বিদ্বেষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সিপাহীদের অসন্তোষ

ভারতীয় সৈনিকদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে বিদেশী সামরিক কর্মচারিগণের দায়িত্বও নেহাত কম ছিল না। ১০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর সভার আদেশক্রমে উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়া গেলে ব্রিটিশ অফিসারগণ বিদ্রোহ প্রকাশে ত্রুটি করেন নাই। সাময়িকভাবে মাদ্রাজের বাহিরে ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন, ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ, ব্যারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে কর্তৃপক্ষের অন্যায়মূলক আদেশে বিশেষতঃ ধর্মনৈতিক আদেশে ভারতীয় সিপাহীরাও বিদ্রোহ প্রকাশে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

এইভাবে ভারতবাসীর এবং তথাকার সিপাহীদের মনে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব যখন বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে তখন ইউরোপীয় খ্রীষ্টান যাজকদের হিন্দু-মুসলমান সকল জাতি নির্বিশেষে সকলকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিল। এমতাবস্থায় ভারতীয়দের নিকট সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ আইন এমনকি রেলে ভ্রমণ করায় জাতিভেদ মানিয়া চলার অসুবিধা প্রভৃতি সবকিছুকেই তাহারা ইংরেজদের ধর্মনৈতিক জুলুমের দুরভিসন্ধি মনে করিতে লাগিল। ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহের কারণ তাহাদের চামড়ার টুপি পরিধান করিতে বলা ও দাড়ি কামাইয়া ফেলিবার আদেশ দান। ব্যারাকপুরের সিপাহীদের সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশ যাইবার আদেশ দান তাহাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলে।

খ্রীষ্টধর্ম যাজকদের ধর্মান্তরকরণ

এইভাবে বিদ্রোহের সমস্ত ক্ষেত্র যখন প্রস্তুত সেই সময় এনফিল্ড রাইফেল নামক একপ্রকার রাইফেল যাহার চর্বিমাখানো টোটা দাঁত দিয়া কাটিয়া ব্যবহার করিতে হইত প্রচলিত হওয়াতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ প্রচারিত হইল এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মাখাইয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ধর্মনাশের চেষ্টা হইতেছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরের সামরিক ছাউনিতে প্রথম মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী বিদ্রোহ প্রকাশ করিল। অপরাপর সৈনিক সকলে একমত হইলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পল্টনটি ভাঙিয়া দিয়া মঙ্গল পাণ্ডে ও অহার সহায়ক ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না। পরবর্তী বিদ্রোহ দেখা দিল মীরাটের সামরিক ছাউনিতে। সেখানে ৮৫ জন সৈনিক

চর্বি মাখানো টোটা প্রত্যক্ষ কারণ

২৪শে এপ্রিল চর্বিমাখানো কার্তুজ স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের দশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইলে, ১০ই মে অপরাপর সৈনিক জোর করিয়া জেলখানায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের মুক্ত করিয়া কর্ণেল ফিনিসকে গুলি করিয়া হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্রমে এই বিদ্রোহ দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্রোহীরা মুঘল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ কর্মচারীদের তাহারা অবাধে হত্যা করিতে শুরু করিল। দেখিতে দেখিতে এই বিদ্রোহ ফিরোজপুর, মুজফ্‌ফরনগর, পাঞ্জাব নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, কানপুর, বিহার, ঝাঁসি ও বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ঝাঁসিতে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া তোপী ; কানপুরে নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহের অধিনায়ক ছিলেন। ঝাঁসির রাণী ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। তাঁহার অনুচর তাঁতিয়া তোপী পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন ; পরে ধরা পড়েন ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নেতৃবর্গ

বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ প্রকাশের উন্মত্ততায় যেমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিল তেমনি বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার কম পৈশাচিকতার নিদর্শন দেখায় নাই। বিদ্রোহের প্রথম দিকে বিদ্রোহীরা জয়লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত সার্ জন্ ল্যারেন্স, সার্ কোলিন্ জ্যাম্পবেল্ প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারী ও সেনাপতিদের তৎপরতায় এবং শিখ, নেপালী ও ব্রিটিশ সৈনিকদের সহায়তায় বিদ্রোহ দমন সম্ভব হইয়াছিল। ইংরেজ সরকার দিল্লী পুনরধিকার করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই বিদ্রোহ নিছক সিপাহী বিদ্রোহ না সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করার একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। জে. বি. নর্টন, ডক্টর ডাফ্ ইত্যাদির মতে এই বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে দেখা দিলেও পরে উহা ব্যাপকতা লাভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের রূপ ধরিয়াছিল। তৎকালীন একজন আমেরিকান লেখকের লেখাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। আবার জন কে (J. W. Kaye), সার্ সৈয়দ আহম্মদ, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারী—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে এই বিদ্রোহ সিপাহীদের বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; কিছু বেসামরিক কর্মচারী যাহারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই গণ্ডগোলের সুযোগে কিছু লুঠপাঠ করা। উপরোক্ত মতের কোন একটি সম্বন্ধেই এ-পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছান সম্ভব হয় নাই। সাম্প্রতিককালে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের

বিদ্রোহের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ডক্টর মজুমদার, ডক্টর সেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক এ-বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে দেখা দিলেও স্থানবিশেষে ইহা কোথাও কোথাও জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের পিছনে সর্বত্র জনসাধারণের সমর্থন ছিল; স্থানবিশেষে কোথাও বেশী কোথাও কম। বাহাদুর শাহকে সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা এবং বাহাদুর শাহের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরেজ বিতাড়নে আহ্বান প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনে-বলে বলীয়ান ব্রিটিশ শক্তির সহিত সংগ্রাম ছিল অকল্পনীয়। এমতাবস্থায় ঐক্যবদ্ধ সিপাহীদের সহিত বহু স্থানের কৃষকগণও যোগ দেয়। এতদ্ব্যতীত সেদিনের জনগণের জাতীয়তাবোধকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যাহা হউক, অবশেষে এইটুকু বলা যায় যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত না আরও নূতন কোন তথ্যাদি প্রকাশিত হইতেছে ততক্ষণ এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নহে।

আলোচনা

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

(মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ঔরংগজেব কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন? (খ) ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কে সিংহাসনে বসেন? (গ) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বলিতে কাহাদের বুঝায়? (ঘ) সৈয়দ ভ্রাতাদের 'রাজস্রষ্টা' বলা হয় কেন? (ঙ) ফারুকশিয়ারের নিকট হইতে কোন্ ইংরেজ দূত ফরমান আদায় করিয়াছিলেন এবং কত খ্রীষ্টাব্দে? (চ) মহম্মদ শাহের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি? (ছ) নিজাম-উল্ মুলক কে ছিলেন? তিনি কোথায় রাজ্য স্থাপন করেন? (জ) নাদির শাহ কখন ভারত আক্রমণ করেন? (মাঃ ১৯৮৫) (ঝ) মুঘল দরবারে দলীয় বিরোধে লিপ্ত কয়েকটি দলের নাম কর। (ঞ) দার-উল্-হারব এবং দার-উল্-ইসলাম কথাগুলির অর্থ কি?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) ঔরংগজেবের শিখ ও রাজপুতদের সহিত যুদ্ধের ফল কি হইয়াছিল? (খ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অভিজাতবর্গের কি দায়িত্ব ছিল? (গ) জায়গিরদারী প্রথার সংকট বলিতে কি বুঝ? (ঘ) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের গৃহযুদ্ধে কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন? (ঙ) মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গনের যুগে দাক্ষিণাত্যের নব সৃষ্ট একটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান? (চ) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতটা দায়ী ছিল? (ছ) মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি সম্বন্ধে কি জান?

৩। নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর ঃ

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? (খ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য ঔরঙ্গজেবের দায়িত্ব আলোচনা কর। (গ) ঔরংগজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঘ) ১৭০৭ হইতে ১৭৪৯ মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি এবং বৈদেশিক আক্রমণের মধ্যে কোন্‌টি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বেশী দায়ী ছিল? (ঙ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থানের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) মুর্শিদকুলী খাঁ কে ছিলেন ? (খ) মুর্শিদকুলী খাঁ কবে দেওয়ান থেকে সুবাদার হন ? (গ) 'দস্তক-প্রথা' কি ? (ঘ) বঙ্গদেশে বর্গী হাঙ্গামা কবে হয়েছিল ? (ঙ) বর্গী হাঙ্গামার সময় বঙ্গদেশের নবাব কে ছিলেন ? (চ) আলিবর্দীর সহিত মারাঠাদের কবে ও কোথায় সন্ধি হইয়াছিল ? (ছ) আলিবর্দীর পর বাংলার কে নবাব হন এবং কত খ্রীষ্টাব্দে ? (জ) হায়দ্রাবাদ রাজ্যটি কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন ? (ঝ) মহীশুর রাজ্যে হায়দর আলির পূর্বে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিত ? (ঞ) অযোধ্যা রাজ্যের কিভাবে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ? (ট) গুরু অর্জুন কত সংখ্যক গুরু ছিলেন ? নবম শিখ গুরুর নাম কি ? কে তাঁহাকে শিরশ্ছেদ করেন ? (ঠ) গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ জাতিকে কি কি পাঁচটি জিনিস ধারণ করিতে আদেশ দেন ? (ড) পেশওয়া বলিতে কি বুঝায় ? ঢ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কবে হইয়াছিল ? (ণ) আহম্মদ শাহ আব্দালী কে ছিলেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) মুর্শিদকুলীর সহিত ইউরোপীয় বণিকদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? (খ) আলিবর্দীর সময়ে মারাঠা আক্রমণের কারণ কি ছিল ? (গ) গুরু নানক হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ গুরুদের নাম কি ? মুঘল সম্রাটগণ কোন্ কোন্ শিখ গুরুকে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন বল। (ঘ) পেশওয়াতন্ত্র বলিতে কি বুঝায় ? পেশওয়া প্রথম বাজীরাও কিভাবে "মারাঠা রাষ্ট্রমণ্ডল" গঠন করেন ? "হিন্দুপাদ-পাদশাহী" বলিতে কি বুঝায় ? পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ ও প্রথম বাজীরাও ভারতে মারাঠা শক্তি কিভাবে স্থাপন করেন ? (ঙ) উত্তর-ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রথম বাজীরাও-এর ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণনামূলক উত্তর দাও ঃ

(ক) মুর্শিদকুলী খাঁ ও আলিবর্দী খাঁর সময়ে বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। (খ) হায়দ্রাবাদে নিজাম-উল্-মুল্ক এবং অযোধ্যায় সাদাত খাঁ কিভাবে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ? (গ) গুরু নানকের মতবাদ ও আদর্শ কিভাবে গুরু অর্জুন, তেগ বাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখদের আলাদা সংগঠন ও জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল আলোচনা কর। (ঘ) প্রথম বাজীরাও ও বালাজী বাজীরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। (ঙ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

(ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য বিস্তার)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় ? (খ) ইংরেজ বণিকগণ প্রথম কোথায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ? (গ) ফরাসীদের কোথায় বাণিজ্য কুঠি ছিল ? (ঘ) কত খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পত্তন হয় ? (ঙ) কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (চ) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোন্ খ্রীষ্টাব্দে ফারুকশিয়ারের ফরমান পায় ? (ছ) ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোথায় স্থাপিত হয় ? (জ) ফোর্ট সেণ্ট জর্জ দুর্গ কাহাদের দ্বারা এবং কোথায় স্থাপিত হয় ? (ঝ) দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের সময় পণ্ডিচেরীর ফরাসী শাসনকর্তা কে ছিলেন ? (ঞ) মহম্মদ আলি কোথাকার নবাব ছিলেন ? (ট) "আলিনগরের সন্ধি" কবে এবং কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ঠ) "অন্ধকূপ হত্যা" কি ? কবে হইয়াছিল ? (ড) বিদরার যুদ্ধ কবে এবং কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ঢ) "প্রাসাদ বিপ্লব" কাহাকে বলে ? (ণ) বন্দীবাসের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ত) প্যারিসের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (থ) দুপ্লে কে ছিলেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) কর্ণাটকে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কারণ কি ? (খ) কর্ণাটকের যুদ্ধে দুপ্লে কি উদ্দেশ্য লইয়া যোগদান করিয়াছিলেন ? (গ) ত্রিচিনপলী অবরোধ কেন ব্যর্থ হইয়াছিল ? (ঘ) সিরাজ-উদ্-দৌলার কলিকাতা আক্রমণের কারণ কি ? (ঙ) দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ফলাফল কি হইয়াছিল ? (চ) চাঁদা সাহেব ও আনোয়ার-উদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ কি ? (ছ) দুপ্লের ব্যর্থতার কারণ কি ? (জ) ইংরেজ বণিকদের সহিত ওলন্দাজ বণিকদের সংঘর্ষের কারণ কি ?

৩। সংক্ষেপে বিশদ আলোচনা কর ঃ

(ক) ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর। (খ) প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখ। (গ) দুপ্লে ও ক্লাইভের কৃতিত্ব বিচার কর। (ঘ) দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই দ্বন্দ্বে ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ কি ? (ঙ) ভারতীয় রাজাদের ঘরোয়া ঝগড়া কিভাবে কাজে লাগাইয়া ইংরেজ ও ফরাসীরা সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করে ? (চ) ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধ কিভাবে ভারতবর্ষে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ?

চতুর্থ অধ্যায়

(ইংরেজ শক্তির উত্থান—১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ১৭১৭ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোন্ মুঘল বাদশাহের নিকট হইতে ফরমান গ্রহণ করে। (খ) আলিবর্দী খাঁ কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হন ? (গ) নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কত খ্রীষ্টাব্দে নবাব হন ? (ঘ) সিরাজ কত খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা অধিকার করেন ? (ঙ) কলিকাতার নাম আলিনগর কে, কখন এবং কেন রাখেন ? (চ) আলিনগরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ? (ছ) অন্ধকূপ 'হত্যার' কাহিনী কাহার দ্বারা প্রচারিত হয় ? (জ) পলাশীর যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দের কত তারিখে হয় ? (ঝ) পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পক্ষে প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন ? (ঞ) নবাবের দুইজন বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতির নাম কি ? (ট) সিরাজের পর কে বাংলার নবাব হন ? (ঠ) 'পলাশী লুণ্ঠন কি ? (ড) "ক্লাইভের গর্দভ" কাহাকে বলা হয় ? (ঢ) মীরকাশিম কত খ্রীষ্টাব্দে নবাব হন ? (ণ) মীরকাশিম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কোন্ কোন্ তিনটি জেলার রাজস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন ? (ত) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত মীরকাশিমের সংঘর্ষের প্রধানতম কারণটি কি ? (থ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ হয় ? (দ) বক্সারের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হয় ? (ধ) কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কোন্ মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করে ? (ন) ১৭৫৭ খ্রীঃ, ১৭৬০ খ্রীঃ, ১৭৬৪ খ্রীঃ এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) নবাব আলিবর্দীর সহিত ইংরেজদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? (খ) সিরাজ-উদ্-দৌলা কেন কলিকাতা আক্রমণ করিলেন ? (গ) সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী কাহারা ছিলেন এবং কেন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ? (ঘ) পলাশীর যুদ্ধের কারণ কি ? (ঙ) পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল কি ? (চ) মীরজাফরের সহিত ইংরেজদের সন্ধির শর্ত কি ছিল ? (ছ) মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের বিরোধের কারণ কি ? (জ) বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব কি ? (ঝ) দ্বৈত শাসন কাহাকে বলে ? ইহার ফলে কোম্পানির কি লাভ হইয়াছিল ?

৩। নাতিদীর্ঘ উত্তর দাও :

(ক) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক বিস্তার সম্বন্ধে যাহা জানা লিখ। (খ) পলাশী হইতে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরেজ শক্তির অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। (গ) পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (ঘ) পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের তুলনামূলক গুরুত্ব আলোচনা কর। (মাঃ ১৯৮৩) (ঙ) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে ১৭৫৭, ১৭৬০,

১৭৬৪ ও ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গুরুত্ব বিচার কর। (চ) মীরকাশিমের নীতি ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। সিরাজের সহিত মীরকাশিমের তুলনা কর। (ছ) কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও তাহার ফলাফল আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

(ইংরেজদের সাম্রাজ্যিক বিস্তার—১৭৬৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) সুরাট ও পুরন্দরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ? (খ) সলবাই-এর সন্ধি দ্বারা কোন্ যুদ্ধের অবসান হয় ? (গ) নানা ফড়নবীশের কত খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটে ? (ঘ) বেসিনের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঙ) বশ্যতামূলক নীতি কে উদ্ভাবন করেন ? (চ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কোন্ সন্ধির দ্বারা এবং কত খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় ? (ছ) মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পতন কখন ঘটে ? (জ) কোন্ সন্ধির দ্বারা এবং কত খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে ? (ঝ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঞ) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় ইংরেজ গভর্ণর-জেনারেল কে ছিলেন ? (ট) কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে ? (ঠ) মহীশূর বিভাজন কত খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ? (ড) সগৌলির সন্ধি কাহাদের মধ্যে কবে সম্পাদিত হইয়াছিল ? (ঢ) কোন্ বড়লাট পাঞ্জাব অধিকার করেন ? (ণ) স্বত্ববিলোপ নীতির উদ্‌গাতা কে ? (ত) কোন্ বড়লাট এবং কি অভিযোগের ভিত্তিতে অযোধ্যা সম্পূর্ণরূপে দখল করেন ? (থ) শিখ মিস্‌ল কি ? (দ) রঞ্জিৎ সিংহ কোন্ মিস্‌লের অধিনায়ক ছিলেন ? (ধ) অমৃতসরের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ন) কোন্ বড়লাটের আমলে সিন্ধুদেশ জয় করা হয় ? (প) সিন্ধু-বিজয়ের প্রধান নায়ক কে ছিলেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) সুরাটের সন্ধির শর্ত কি ছিল ? (খ) নানা ফড়নবীশের কৃতিত্ব কি ? (গ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলাফল কি ? (ঘ) বেসিনের সন্ধির শর্ত কি ছিল ? (ঙ) পুণার সন্ধির গুরুত্ব কি ? (চ) লর্ড লেকের বিজয় অভিযান সম্বন্ধে কি জান ? (ছ) হায়দর আলির কৃতিত্ব কি ? (জ) টিপু সুলতানের ফরাসীদের সহিত কি সম্পর্ক ছিল ? (ঝ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির শর্ত কি ছিল ? (ঞ) লর্ড কর্নওয়ালিসের মহীশূর নীতি কি ছিল ? (ট) অমৃতসরের সন্ধির গুরুত্ব কি ? (ঠ) ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি কি কি ? সিন্ধু বিজয়ের কারণ কি ?

৩। আলোচনামূলক উত্তর দাও ঃ

(ক) নানা ফড়নবীশ ও মহাদজী সিন্ধিয়ার কৃতিত্ব তুলনামূলকভাবে আলোচনা কর। (খ) ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের আমলে ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক আলোচনা কর। অথবা ১৭৬১ হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (গ) ইঙ্গ-আফগান ও ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখ। (ঘ) রঞ্জিৎ সিংহের চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (ঙ) অমৃতসরের সন্ধি হইতে লাহোরের সন্ধি পর্যন্ত ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক আলোচনা কর। (চ) স্বত্ববিলোপ নীতি বলিতে কি বুঝায়? লর্ড ডালহৌসী কিভাবে এই নীতি প্রয়োগ করিয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর। ইহার ফল কি হয়? (ছ) সিন্ধুদেশ ও অযোধ্যায় কিভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তার হয়? (জ) বশ্যতামূলক নীতির মাধ্যমে কিভাবে লর্ড ওয়েলেসলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

(শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুইটি প্রধান বাণিজ্য কুঠির নাম কর। (খ) দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে প্রধান ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন? (গ) ভারতে প্রধান ফরাসী বাণিজ্য কুঠি কোথায় ছিল? (ঘ) দ্বৈত শাসন কাহাকে বলে? (ঙ) কে এবং কবে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটান? (চ) আমিনী কমিশন কে নিয়োগ করেন? (ছ) কোন্ গভর্ণর-জেনারেলের আমলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'ভারতবিধি' প্রথম প্রচলন করে? (জ) কোন্ গভর্ণর-জেনারেল প্রথম বিচার বিভাগীয় সংস্কার করেন? (ঝ) পাঁচসালা বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন? (ঞ) বোর্ড অফ রেভিনিউ (Board of Revenue) কে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন? (ট) জেমস গ্র্যান্ট কে ছিলেন? (ঠ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রচলন করেন এবং কবে? (ড) বাংলাদেশে জেলাভিত্তিক শাসন কে প্রথম চালু করেন? (ঢ) রেগুলেটিং অ্যাক্ট কত বৎসর অন্তর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পাশ হইত? (ণ) এশিয়াটিক সোসাইটি কত খ্রীষ্টাব্দে, কোন্ গভর্ণর-জেনারেলের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়? (ত) কোন্ গভর্ণর-জেনারেল ফারসী ভাষার স্থলে সরকারী কাজে ইংরেজী ভাষার প্রচলন করেন? (থ) 'সূর্যাস্ত আইন' কি? (দ) লর্ড ম্যাকলে কে ছিলেন? (ধ) কোন্ গভর্ণর-জেনারেল সতীদাহ নিবারণমূলক আইন করেন?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থার কে অবসান করেন ? ইহার পরিবর্তে কি ব্যবস্থা করা হয় ? (খ) ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর। (গ) ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব-সংস্কারমূলক পরীক্ষার উদাহরণ দাও। (ঘ) 'কর্নওয়ালিস কোড্' কাহাকে বলে ? তাঁহার শাসন বিভাগীয় সংস্কার কি ছিল ? (ঙ) শোর-গ্র্যাণ্ট-কর্নওয়ালিসের রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পর্কে কি ভিন্ন মত ছিল ? (চ) লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসন সংস্কারে হিতবাদী নীতির কি প্রভাব ছিল ? তাঁহার শাসন সংস্কারের উদাহরণ দাও। (ছ) শাসন পরিচালনায় কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা আলোচনা কর। (জ) লর্ড ডালহৌসীর জনহিতকর সংস্কারগুলি আলোচনা কর। (ঝ) ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্টে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের কি নির্দেশ ছিল ?

৩। বিশদ আলোচনা কর ঃ

(ক) ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর। (খ) লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সুফল ও কুফলগুলি দেখাও। (গ) "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি দুঃখজনক ভুল" এই মন্তব্যের মূল্য বিচার কর। (মাঃ ১৯৭৯) (ঘ) লর্ড বেণ্টিংক কি সংস্কারের কাজ করেন ? তাঁহাকে রাজা রামমোহন রায় কিভাবে প্রভাবিত করেন ? (ঙ) লর্ড ডালহৌসী রাজ্যবিস্তার ছাড়া আর কি কাজ করেন আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

(শিল্প ও বাণিজ্য)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) দস্তক কি ? (খ) কোম্পানীর বাণিজ্যের কয়েকটি একচেটিয়া পণ্যের নাম কর। (গ) কোম্পানি আমলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর কি কি ছিল ? (ঘ) বাংলার কোন্ পণ্য সবচেয়ে বেশী বিদেশে রপ্তানি হইত ? (ঙ) 'দাদন' ব্যবস্থা কি ? (চ) কয়েকটি সুতীবস্ত্র উৎপাদনকারী প্রধান স্থানের নাম কর। (ছ) বেনামী ব্যবসায় কি ? (জ) 'অর্থ-সম্পদের নির্গমন' (Drainage of wealth) বলিতে কি বুঝ ? (ঝ) ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের কি প্রভাব ভারতের উপর পড়িয়াছিল ? (ঞ) ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের কে এবং কবে বিলোপ সাধন করেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) 'অর্থনৈতিক নির্গমনে'র ফলে ভারতের আর্থিক অবস্থার উপর কি প্রভাব

পড়িয়াছিল ? (খ) বাংলা তথা ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের ধ্বংস কিভাবে হইয়াছিল ? (গ) ইংরেজ কোম্পানি কিভাবে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করিয়াছিল ? (ঘ) সূতীবস্ত্রের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে লিখ।

৩। বিবরণমূলক নাতিদীর্ঘ উত্তর দাও :—

(ক) ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বিরুদ্ধে কাহারা আন্দোলন করিয়াছিলেন ? এই আন্দোলনের ফল কি হইয়াছিল ? (খ) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা কর। (গ) বাংলা তথা ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের ধ্বংস কিভাবে হইয়াছিল ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ?

অষ্টম অধ্যায়

(পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) এশিয়াটিক সোসাইটি কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন ? (খ) কাশীতে সংস্কৃত কলেজ কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন ? (গ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কত খ্রীষ্টাব্দে কে স্থাপন করেন ? (ঘ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কে ছিলেন ? (ঙ) হেইলেবেরী কলেজ কত খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় ? (চ) এ্যাডমসের রিপোর্ট কি ? (ছ) "ম্যাকলের প্রতিবেদন" কি ? (জ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত যে কোন একটি পুস্তকের নাম কর। (মাঃ ১৯৭৮) (ঝ) ইয়ং বেঙ্গল বলিতে কি বুঝায় (হাই মাদ্রাসা—১৯৮০)। (ঞ) কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন ? (মাঃ এক্স, '৮০) (ট) মিল, বেন্থাম কে ছিলেন ? (ঠ) হিতবাদী দর্শন কি ? (ড) লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কে ছিলেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ভারত বিদ্যার চর্চার কি ফল হয় ? (খ) খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য কি করেন ? (গ) হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং স্কুল বুক সোসাইটি সম্পর্কে কি জান ? (ঘ) বাংলার নবজাগরণে ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গলের ভূমিকা কি ছিল ? (ঙ) আর্য সমাজের মতবাদ কি ? (চ) ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কে ? ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল ? (ছ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি ? (জ) রামকৃষ্ণদেবের ধর্মমত কি ? স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে রামকৃষ্ণের ধর্মমতের প্রচার করেন ?

৩। নাতিদীর্ঘ বিবরণ দাও :

(ক) পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও ম্যাকলের অবদান আলোচনা কর। (খ) ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে বিরোধের ইতিহাস আলোচনা কর। (গ) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। (ঘ) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মান্দোলন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (ঙ) বাংলার নবজাগরণে ইয়ং বেঙ্গলের ভূমিকা আলোচনা কর। (চ) রামমোহনকে "আধুনিক ভারতের জনক" বলা হয় কেন ?

নবম অধ্যায়

(কৃষক আন্দোলন ও গণবিক্ষোভ)

১। দুই-এক কথায় লিখ :

(ক) সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কোন্ সময়ে হয় ? (খ) "চুয়াড় বিদ্রোহ" কাহাকে বলে ? ইহা কোন্ সময়ে হয় ? (গ) ভীল বিদ্রোহ কোন্ সময়ে হয় ? (ঘ) ভূমিজ বিদ্রোহ কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ? (ঙ) সাঁওতাল বিদ্রোহের দুইজন নেতার নাম কর ? (চ) সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রথম কোথায় হয় ? (ছ) ইহা কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ? (জ) ফরাজি আন্দোলনের স্রষ্টা কে ? (ঝ) বাংলায় এই আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ? (ঞ) তিতুমীর কে ছিলেন ? (ট) ওয়াহাবি শব্দের অর্থ কি ? (ঠ) ইহার সূচনা কোথায় হয় ? (ড) ভারতে এই আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কবে, কোথায় এবং কিভাবে ঘটেছিল ? (খ) চুয়াড় বিদ্রোহের কারণ, নেতৃবর্গ এবং কোথায়, কবে ঘটেছিল আলোচনা কর। (গ) সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ কি ? (ঘ) ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি কি ? (ঙ) ফরাজি আন্দোলন বাংলায় কিরূপ ধারণ করিয়াছিল ?

৩। নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর :

(ক) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ আলোচনা কর। (খ) উনিশ শতকের প্রথমভাগে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস সম্পর্কে কি জান ? (গ) ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি আলোচনা কর। (ঘ) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ওয়াহাবি আন্দোলন কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল ? ইহার লক্ষ্য ও আদর্শ কি ছিল ?

দশম অধ্যায়

(১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ)

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) সিপাহী বিদ্রোহের সময় বড়লাট কে ছিলেন ? (মাঃ ১৯৭৮) (খ সিপাহী বিদ্রোহ প্রথম কোথায় শুরু হয় ? (গ) ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ? (ঘ) নানাসাহেব কে ছিলেন ? (ঙ) তাঁতিয়া টোপী কে ছিলেন ? (চ) মঙ্গল পান্ডে কে ছিলেন ? (ছ) ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ কত খ্রীষ্টাব্দে হয় ? (জ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে কোন্ নারী ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দান করেন ? (ঝ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহীরা কাহাকে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

(ক) সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল ? (খ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় কি না ? (গ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসী কতটা দায়ী ছিলেন ? (ঘ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ কিভাবে ছড়াইয়াছিল লিখ। (ঙ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ কি ছিল ?

৩। নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর ঃ

(ক) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা কর। (খ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে কি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা যায় ? যুক্তি সহকারে আলোচনা কর। (গ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের চারিজন নেতার নাম কর। এই সংগ্রামের সূত্রপাত কোথায় হইয়াছিল ? ইহার ব্যর্থতার তিনটি কারণ উল্লেখ কর। (মাঃ ১৯৮৩) (ঘ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিস্তার ও কাহারা যোগ দিয়াছিলেন আলোচনা কর।

প্রাচীন যুগ

[পরিশিষ্ট]

[বংশ-পরিচয়]

মগধের রাজবংশ

বিম্বিসারীয় বংশ ঃ

বিম্বিসার	৫৪৪—৪৯৩	খ্রীঃ পূঃ	(আনুমানিক)
অজাতশত্রু	৪৯৩—৪৬১	,,	,,
উদয়ভদ্র	৪৬১—৪৪৫	,,	,,
অনুরুদ্ধ ও মুণ্ড	৪৪৫—৪৩৭	,,	,,
নাগদাসক	৪৩৭—৪১৩	,,	,,

শৈশুনাগ বংশ ঃ

শিশুনাগ	৪৩১—৩৯৫	,,	,,
কালাশোক কাকবর্ণ	৩৯৫—৩৪৫	,,	,,

নন্দবংশ ঃ

মহাপদ্ম	৩৪৫—(?)
উগ্রসেন	
ধননন্দ	৩২৪ খ্রীঃ পূঃ

মৌর্যবংশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২৪—২৯৮ খ্রীঃ পূঃ
বিন্দুসার ২৯৮—২৭৩ ,,
সুসীম
অশোক
[২৭৩—২৩২]
বিগতাশোক
মহেন্দ্র (?)
কুণাল
জলৌক
তিবর
বন্ধুপালিত
সম্প্রতি
বিগতাশোক
শালিশূক
সোমবর্মন (দেববর্মন ?)
শতধন্য (শশধর্মন)
বৃহদ্রথ

শুঙ্গ বংশ :

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ
অগ্নিমিত্র
জ্যেষ্ঠমিত্র ও সুমিত্র
ভাগভদ্র
দেবভূতি

কাণ্ব বংশ :

বাসুদেব
ভূমিমিত্র
নারায়ণ
সুশর্মন

সাতবাহন বা অন্ধ্র বংশ :

সিমুক
কৃষ্ণ
শ্রীসাতকর্ণী
* * *
গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী
বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী
* * *
যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী

কুষাণ বংশ :

কুজল কদ্ফিসস্ বা প্রথম কদ্ফিসস্
বিম বা দ্বিতীয় কদ্ফিসস্
* * *
কণিষ্ক
বাশিষ্ক
হুবিষ্ক
দ্বিতীয় কণিষ্ক
বাসুদেব
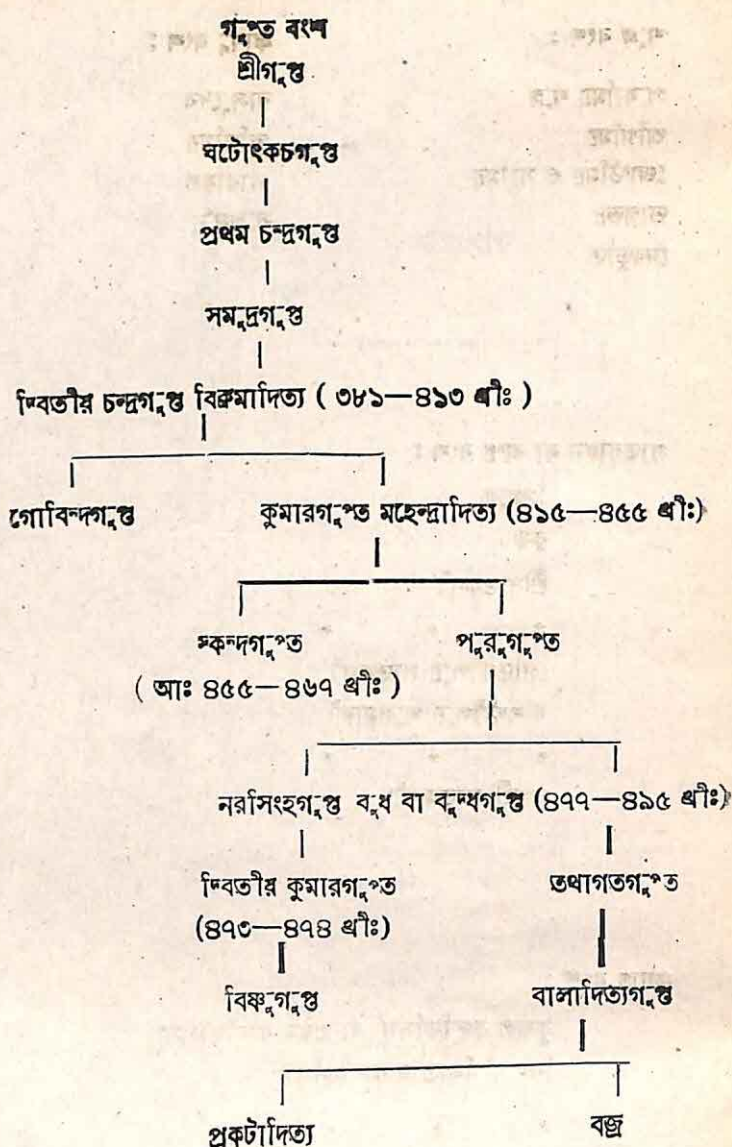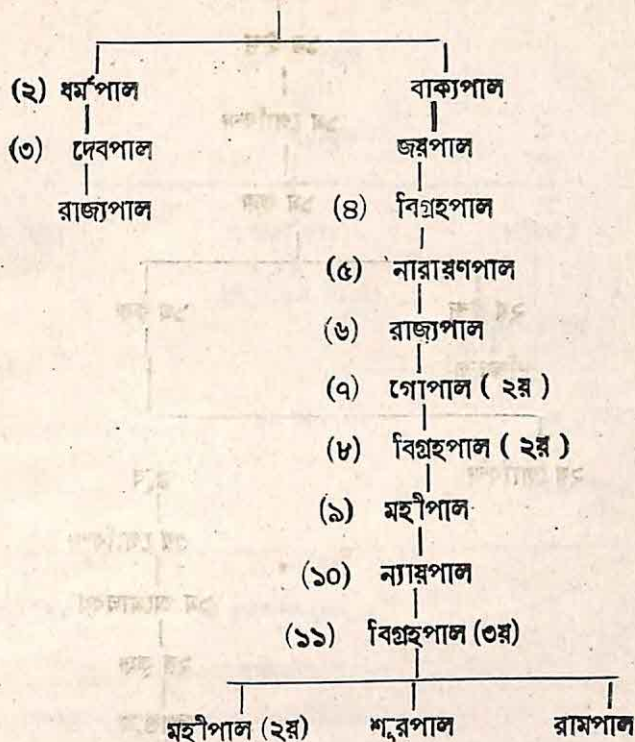
গুপ্ত বংশ
শ্রীগুপ্ত
ঘটোৎকচগুপ্ত
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
সমুদ্রগুপ্ত
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৩৮১—৪১৩ খ্রীঃ)
গোবিন্দগুপ্ত
কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (৪১৫—৪৫৫ খ্রীঃ)
স্কন্দগুপ্ত
(আঃ ৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ)
পুরুগুপ্ত
নরসিংহগুপ্ত
বুধ বা বুদ্ধগুপ্ত (৪৭৭—৪৯৫ খ্রীঃ)
দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
(৪৭৩—৪৭৪ খ্রীঃ)
তথাগতগুপ্ত
বিষ্ণুগুপ্ত
বালাদিত্যগুপ্ত
প্রকটাদিত্য
বজ্র

পাল বংশ

(১) গোপাল
- (২) ধর্মপাল
  - (৩) দেবপাল
    - রাজ্যপাল
- বাক্যপাল
  - জয়পাল
    - (৪) বিগ্রহপাল
      - (৫) নারায়ণপাল
        - (৬) রাজ্যপাল
          - (৭) গোপাল (২য়)
            - (৮) বিগ্রহপাল (২য়)
              - (৯) মহীপাল
                - (১০) ন্যায়পাল
                  - (১১) বিগ্রহপাল (৩য়)
                    - মহীপাল (২য়)
                    - শূরপাল
                    - রামপাল

রাষ্ট্রকূট বংশ

- ১ম দন্তিবর্মা
  - ১ম ইন্দ্র
    - ১ম গোবিন্দ
      - ১ম কর্ক
        - ২য় ইন্দ্র
          - দন্তিদুর্গ
        - ১ম কৃষ্ণ
          - ২য় গোবিন্দ
          - ধ্রুব
            - ৩য় গোবিন্দ
              - ১ম অমোঘবর্ষ
                - ২য় কৃষ্ণ
                  - জগত্তুঙ্গ
                    - ৩য় ইন্দ্র
                      - ২য় অমোঘবর্ষ
                      - ৪র্থ গোবিন্দ
                    - ৩য় অমোঘবর্ষ
                      - ৩য় কৃষ্ণ
                        - পুত্র
                          - ৪র্থ ইন্দ্র
                      - খোত্তিগ
                      - নিরুপম
                        - ৪র্থ অমোঘবর্ষ

চোল বংশ

বিজয়ালয়
১ম আদিত্য
১ম পরান্তক
১ম রাজাদিত্য
গণ্ডরাদিত্য
অরিঞ্জয়
মদুরান্তক উত্তম
২য় পরান্তক
১ম আদিত্য
১ম রাজরাজ
১ম রাজেন্দ্র
১ম রাজাধিরাজ
২য় রাজেন্দ্র দেব
বীররাজেন্দ্র
রাজমহেন্দ্র
অধিরাজেন্দ্র

মধ্য যুগ

(১)

দাস বংশ (১২০৬-১২৯০)

(২)

খল্‌জী বংশ (১২৯০-১৩২০)

কায়ুম খাঁ

মালবের খল্‌জী বংশ

জালাল-উদ্দিন ফিরুজ (১২৯০-৯৬)

রুক্‌নু-উদ্দিন ফিরুজ (১২৯৬)

মাসুদ

আলা-উদ্দিন (১২৯৬-১৩১৬)

খিজ্‌র খাঁ

শিহাব-উদ্দিন উমর (১৩১৬)

কুতব-উদ্দিন মুবারক (১৩১৬-২০)

নাসির-উদ্দিন খুস্‌রভ (১৩২০)

(৩)

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)
তুঘ্লক শাহ্ (১৩২০-২৫)
রজব
মহম্মদ জোনা (বিন্-তুঘ্লক) (১৩২৫-৫১)
ফিরুজ শাহ্ (১৩৫১-৮৬)
ফত খাঁ
জাফর খাঁ
নাসির-উদ্দিন মাহ্মুদ শাহ্ (১৩৯০-৯৪)
আবুবক্র (১৩৯০)
গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্লক
(১৩৮৮-৮৯)
নুসরৎ-শাহ্
(১৩৯৫-৯৯)
আলা-উদ্দিন সিকন্দর
(১৩৯৪)
মাহ্মুদ-শাহ্
(১৩৯৯-১৪১৩)
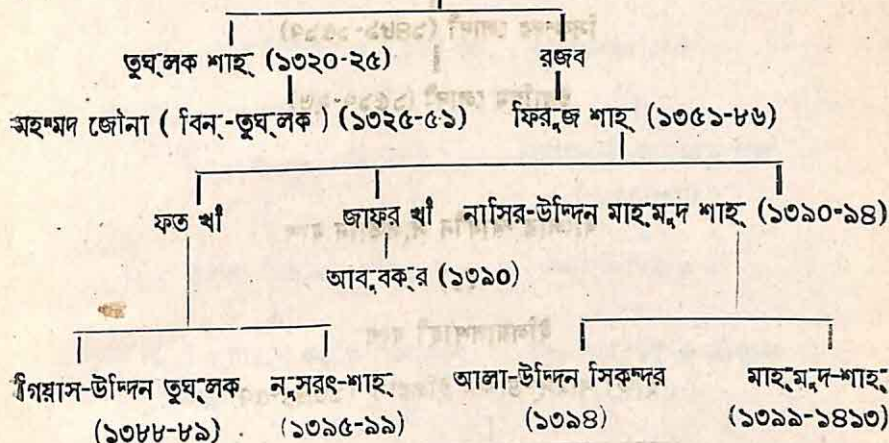
(৪)

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১)
খিজ্র খাঁ (১৪১৪-২১)
মুইজ্-উদ্দিন মোবারক
(১৪২১-৩৪)
ফরিদ খাঁ
মহম্মদ শাহ্ (১৪৩৪-৪৫)
আলা-উদ্দিন আলম শাহ্ (১৪৪৫-৫১)
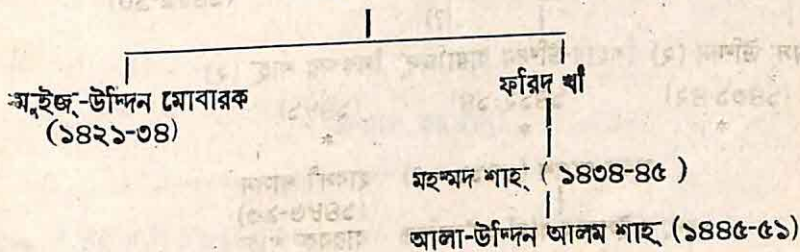
(৫)

লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬)

বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)
|
সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
|
ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬)

বাংলার স্বাধীন সুলতানি বংশ

(১)

ইলিয়াসশাহী বংশ

হাজী শামস্‌-উদ্দিন ইলিয়াস্‌ (১৩৪৫-৫৭)

- সিকন্দর শাহ্‌ (১৩৫৭-৮১)
  - গিয়াস-উদ্দিন আজম (১৩৮৯-১৪০৯)
    - সৈইফ-উদ্দিন হাম্‌জা শাহ (১৪০৯-১০)
      - শামস্‌ উদ্দিন (২) (১৪০১-৪২)
      - শিহাব-উদ্দিন বায়াজিদ্‌ (১৪১২-১৪)
- (?) নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্‌ (১) (১৪৪২-৬০)
  - রুক্‌ন-উদ্দিন বারবক্‌ ১৪৬০-৭৪)
    - শামস্‌-উদ্দিন ইয়ুসুফ (১৪৭৪-৮১)
      - (?) সিকন্দর শাহ্‌ (২) (১৪৮১)
  - জালাল-উদ্দিন ফত শাহ্‌ (১৪৮১-৮৯)
    - (?) নাসির-উদ্দিন মামুদ (২) (১৪৮৯-৯০)

*

রাজা গণেশ (১৪১১—?)
|
যদু ঃ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত
=জালাল-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌
(১৪১৪-৩১)

*

দনুজ-মর্দন (১৪১৭)

(?)

মহেন্দ্র (১৪১৮-৩৯)

*

হাবসী শাসন
(১৪৮৬-৯৩)

বারবক্‌ শাহ্‌
(১৪৮৬)

*

ইন্দিল শাহ্‌
(১৪৮৬-৮৯)

*

সিদি বদর্‌ (১৪৯০-৯৩)

(২)

হৈসেন বংশ

(৩)

কর্‌রানী বংশ

জামাল কর্‌রানী

- তাজ খাঁ কর্‌রানী (১৫৬৪-৭২)
- সুলেমান কর্‌রানী (১৫৭২)
  - বায়াজিদ্ কর্‌রানী (১৫৭২)
  - দাউদ কর্‌রানী (১৫৭২-৭৬)
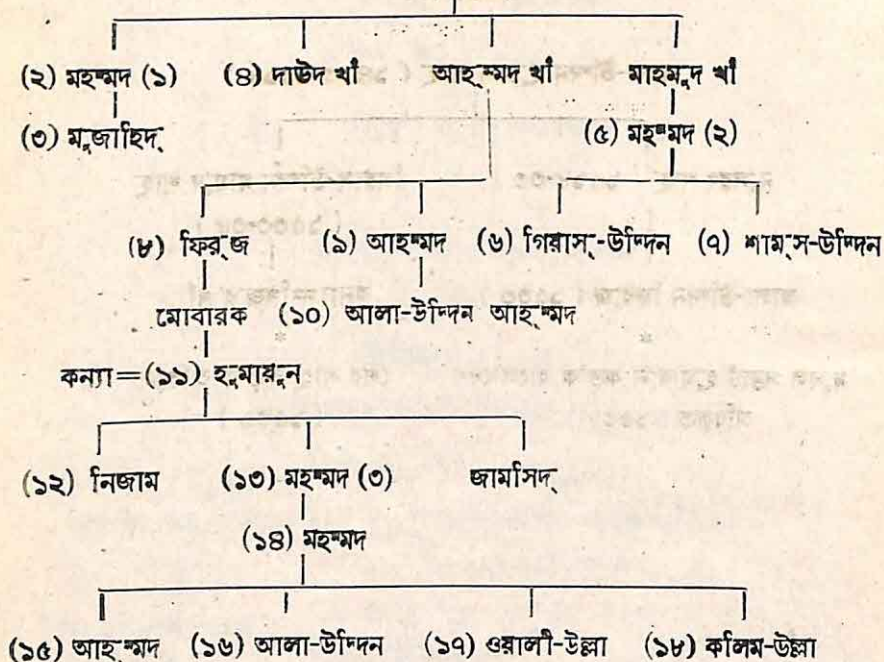
বহ্‌মনী বংশ
(১) আলা-উদ্দিন বহ্‌মন শাহ্‌
(২) মহম্মদ (১)
(৪) দাউদ খাঁ
আহ্‌ম্মদ খাঁ
মাহমুদ খাঁ
(৩) মুজাহিদ্‌
(৫) মহম্মদ (২)
(৮) ফিরুজ
(৯) আহম্মদ
(৬) গিয়াস্‌-উদ্দিন
(৭) শাম্‌স-উদ্দিন
মোবারক
(১০) আলা-উদ্দিন আহ্‌ম্মদ
কন্যা=(১১) হুমায়ুন
(১২) নিজাম
(১৩) মহম্মদ (৩)
জামসিদ্‌
(১৪) মহম্মদ
(১৫) আহ্‌ম্মদ
(১৬) আলা-উদ্দিন
(১৭) ওয়ালী-উল্লা
(১৮) কলিম-উল্লা
বিজয়নগর
(১)
যাদব বংশ
সঙ্গম
হরিহর
বুক্ক
হরিহর (২য়) (১৩৭৯-১৪০৪)
বিরূপাক্ষ
দেবরায় (১ম) (১৪০৬-২২)
বীর বিজয়
দেবরায় (২য়) (১৪২২-৪৬)
মল্লিকার্জুন (১৪৪৬-৬৫)
বিরূপাক্ষ (২য়) (১৪৬৫-৮৬)

(২)

সালুভ বংশ

নরসিংহ (১৪৮৬-৯৩)

ইম্মাদি নরসিংহ (১৪৩৯-১৫০৫)

(৩)

তুলুভ বংশ

(৪)
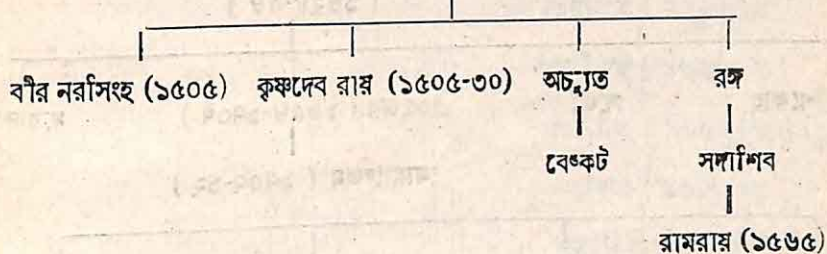
আরবিড়ু বংশ
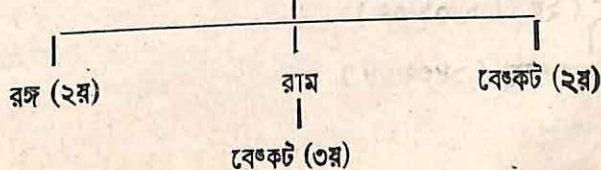
মুঘল বংশ

জহির-উদ্দিন বাবর (১৫২৬-৩০)
হুমায়ুন (১৫৩০-৫৬)
কামরাণ
হিন্দাল
আসকরী
আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
মির্জা হাকিম
সেলিম (জাহাঙ্গীর) (১৬০৫-২৭)
মুরাদ
দানিয়াল
খুস্‌রু
পর্‌ভেজ
খুর্‌রম (শাহ্‌জাহান) (১৬২৮-৫৮)
শাহ্‌রিয়ার
দারা শিকোহ্‌
সুজা
ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)
মুরাদ
মোয়াজ্জেম (১৭০৭-১২)
জাহান্দার শাহ্‌ (১৭১২-১৩)
আজিম্‌-উস্‌-শান্‌
রফি-উস্‌-শান্‌
জাহান শাহ্‌
আলমগীর (২য়) (১৭৫৪-৫৯)
ফারুক্‌শিয়ার (১৭১৩-১৯)
রফি-উদ্‌-দৌলা (১৭১৯)
মহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯-৪৮)
আলি গৌহর (দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম) (১৭৫৯-১৮০৬)
মহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
রফি-উদ-দরাজাত (১৭১৯)
আহম্মদ শাহ্‌ (১৭৪৮-৫৪)
আকবর শাহ্‌ (২য়) (১৮০৬-৩৭)
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ (১৮৩৭-৫৮)

মেবারের রাণা বংশ

রাণা কুম্ভ (১৪৩০-১৪৬৯)
উদয়করণ (১৪৬৯-৭৪)
রায়মল্ল (১৪৭৪-১৫০৮)
পৃথ্বীরাজ
সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহ (১)
(১৫০৯-১৫২৭)
বনবীর (১৫৩৫-৩৭)
রত্নসিংহ (১৫২৭-৩২)
বিক্রমাজিৎ (১৫৩২-৩৫)
উদয়সিংহ (১৫৩৭-৭২)
প্রতাপসিংহ (১৫৭২-৯৭) (১)
অমরসিংহ (১৫৯৭-১৬২০)
করণসিংহ (১৬২০-২৮)
জগৎসিংহ (১৬২৮-৫২)
রাজসিংহ (১৬৫২-৮০) (১)
জয়সিংহ (১৬৮০-৯৮)
অমরসিংহ (২য়)(১৬৯৯-১৭১০)
সংগ্রামসিংহ (২য়) (১৭১১-৩৪)
জগৎসিংহ (১৭৩৪-৪১)
প্রতাপসিংহ (২য়) (১৭৫২-৫৪)
অরিসিংহ (১৭৬১-৭৩)
রাজসিংহ (২য়) (১৭৫৪-৬১)
হামীর (২য়) (১৭৭৩-৭৮)
ভীমসিংহ (১৭৭৮-১৮২৮)

শূর বংশ (১৫৪০-১৫৫৫)

ছত্রপতি বা ভোঁসলে বংশ

- মালোজী
  - শাহ্‌জী
    - শম্ভুজী
    - শিবাজী
      - শম্ভুজী
        - শাহু
        - তারাবাঈ = রাজারাম = রাজস্‌বাঈ
          - তৃতীয় শিবাজী
            - রামরাজা
              - শাহু
                - প্রতাপসিংহ
                - শাহ্‌জী রাজা
          - শম্ভুজী (২য়)
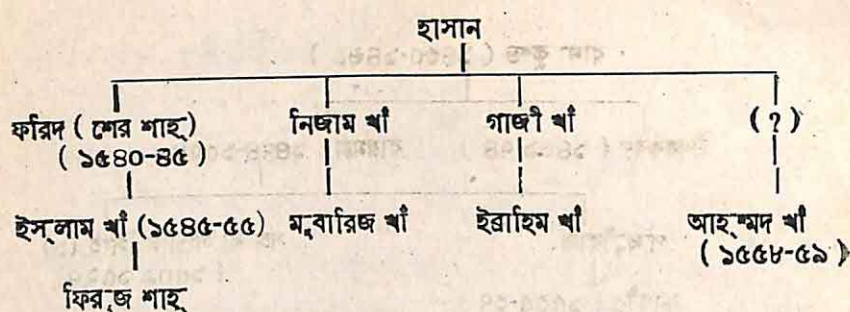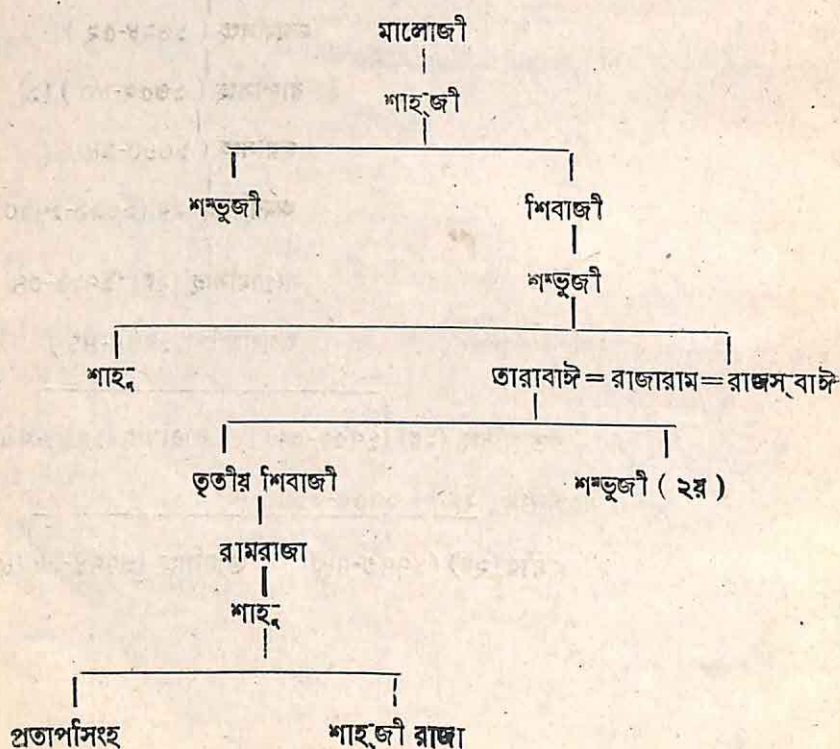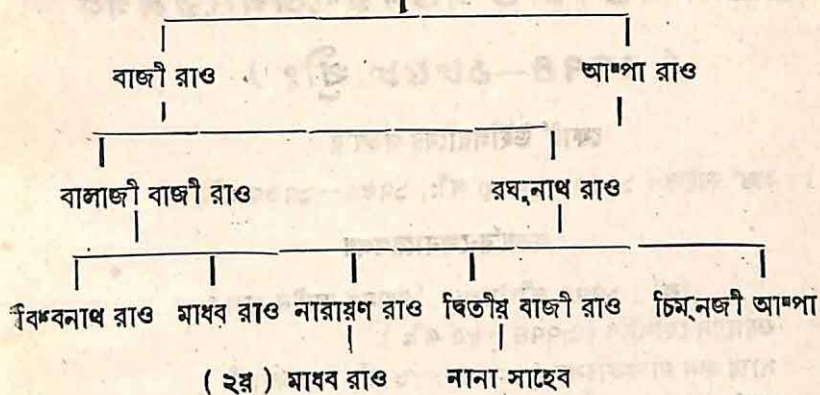
বাংলার নবাব বংশ

মুর্শিদকুলী খাঁ
(১৭০৩-২৭)

কন্যা = সুজাউদ্দীন খাঁ
(১৭২৭-১৭৩৯)

সরফরাজ খাঁ
(১৭৩৯-৪০)

আলিবর্দী খাঁ
(১৭৩৯-৫৬)

(কন্যা) আমিনাবেগম = জৈনউদ্দীন

সিরাজ-উদ্-দৌলা
(১৭৫৬-৫৭)

... ...

মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ ; ১৭৬৩-৬৫)

কন্যা ফতেমা বেগম = মীরকাশিম
(১৭৬০-৬৫)

নজম্ উদ্-দৌলা
(১৭৬৫-৬৬)

সৈফ-উদ্-দৌলা
(১৭৬৬-৭০)

ব্রিটিশ গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেলগণ
(১৭৭৪—১৮৫৮ খ্রীঃ)

ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর

১। লর্ড ক্লাইভ (১৭৫৭—১৭৬০ খ্রীঃ, ১৭৬৫—১৭৬৭ খ্রীঃ)

গভর্ণর-জেনারেলগণ

(ক) ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নিয়ামক আইন বলে ঃ

১। ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪—৮৫ খ্রীঃ)
২। স্যার জন ম্যাকফারসন (১৭৮৫—৮৬ খ্রীঃ)—অস্থায়ী
৩। লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬—৯৩ খ্রীঃ)
৪। স্যার জন শোর (১৭৯৩—৯৮ খ্রীঃ)
৫। স্যার এ· ক্লার্ক (১৭৯৮ খ্রীঃ)—অস্থায়ী
৬। লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮—১৮০৫ খ্রীঃ)
৭। লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৮০৫ খ্রীঃ)
৮। স্যার জন বার্লো (১৮০৫—১৮০৭ খ্রীঃ) – অস্থায়ী
৯। লর্ড মিণ্টো (১৮০৭—১৩ খ্রীঃ)
১০। লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩—২৩ খ্রীঃ)
১১। স্যার জন এ্যাডাম (১৮২৩ খ্রীঃ)—অস্থায়ী
১২। লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩—২৮ খ্রীঃ)
১৩। উইলিয়াম বেইল (১৮২৮ খ্রীঃ)—অস্থায়ী
১৪। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক (১৮২৮—৩৩ খ্রীঃ)

(খ) ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ আইন (চার্টার এ্যাক্ট) অনুসারে

১৪। (ক) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক (১৮৩৩—৩৫ খ্রীঃ)
১৫। লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬—৪২ খ্রীঃ)
১৬। লর্ড এলেনবরা (১৮৪২—৪৪ খ্রীঃ)
১৭। উইলিয়াম বার্ড (১৮৪৪ খ্রীঃ)—অস্থায়ী
১৮। লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪—৪৮ খ্রীঃ)
১৯। লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮—৫৬ খ্রীঃ)
২০। লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬—৫৮ খ্রীঃ)

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. T. Road

(গ) ভাইসরয় ও গভর্ণর-জেনারেল (মহারাণীর ঘোষণা অনুসারে)

২০। (ক) লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮—১৮৬২ খ্রীঃ)